4518

1013

হে ক্ষণিকের অতিথি

শ্রীঅজয়কুমার রায়

পরিবেষক—

সেন গুপ্ত এণ্ড কোং

৩১এ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিঃ।

প্রকাশক
শ্রীঅমলচন্দ্র সেনগুপ্ত
৩।১এ, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা

আড়াই টাকা।

প্রিণ্টার—শ্রীতারাপদ রায়
নূতন ছাপাঘর
১।১, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

হে ক্ষণিকের অতিথি

—এক—

প্রথম ফাল্গুনের ভোরের হাওয়ায় বালিগঞ্জ ঘুমাইয়া আছে। উপরে আকাশব্যাপী স্তিমিত অন্ধকার। নীচে গ্যাসলাইটের তন্দ্রালু চোখের ঘোলাটে আলো—অবসন্ন প্রহরীর মতো কোনরকমে দাঁড়াইয়া আছে যেন।

পাশ ফিরিতে যাইয়া তিমিরের ঘুম ভাঙিয়া গেল। ঘরে অস্পষ্ট আলো জ্বলিতেছে·· মৃদু-জ্যোতি স্নিগ্ধ আলো। মশারির ভিতর হইতে সেটা আরো আব্‌ছা, আরো স্বপ্নময় দেখাইতেছে। মনে হইতেছে ওটা আলো নয়, ফিকে অন্ধকার।

মশারির ভিতর হইতে তিমির একদৃষ্টে আলোটার দিকে তাকাইয়া রহিল। নিরবসন্ন নির্নিমেষ দৃষ্টিতে ও জাগিয়া আছে সারা রাত্রি····তার ঘুমন্ত মুখের পানে চাহিয়া। ও যেন তার মা····অতৃপ্ত চক্ষু, চিরজন্ম সন্তানকে দেখিয়াও তাহার ক্লান্তি নাই, তৃপ্তি নাই। তিমিরের বুকের ভিতরটা সহসা বেদনায় টনটন করিয়া উঠিল। কারণ খুঁজিতে যাইয়া দেখিল আজ কয়েকদিন হইতেই তার মনের ভিতরটা বিষাক্ত হইয়া আছে।

প্রথম ফাল্গুনের ভোর বেলাকার হাওয়া। একটু একটু শীত শীত করিতেছে। তিমির চাদরটাকে টানিয়া লইয়া পাশবালিশের ভিতর ভাল করিয়া মুখ গুঁজিয়া শুইল। আর একটা ঘুমের ভিতর চেতনাকে লুপ্ত করিয়া দিয়া সে সবকিছু মুছিয়া লইতে চাহিল।

কিন্তু ঘুম আর আসিল না। জোর করিয়া চোখ টিপিয়া পড়িয়া থাকিলেও সে স্পষ্ট দেখিতে পাইল সারে সারে কত ছবি তাহার সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেছে। তার আগল-হারা মনের দ্বারে আসা যাওয়া করিতেছে কত কথা। বলাকা-শ্রেণীর মত উড়িয়া উড়িয়া আসিয়া আবার কোথায় মিলাইয়া যাইতেছে কত ঘটনা। সে চোখ বুজাইয়া থাকিলেও নির্ভুল দেখিতে পাইল সাম্‌নের দেয়ালে একখণ্ড কাচের ফ্রেমের ভিতর তাহার মা তাহার পানে তাকাইয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছেন। মহাকালের পথে যাত্রার আগে তাঁহার চোখে যে স্বর্গীয় দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহারই কণা ঐ তাহার তারায় তারায় লাগিয়া আছে। নিরভিমান, অকৃত্রিম, অকৃপণ মা…তাহার স্নেহময়ী মা। মনে হয় কবে কোন গভীর রাত্রে তিনি ঐ কাচের ফ্রেমের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ধীরে ধীরে নিঃশব্দে তাহার ঘুমন্ত অঙ্গ স্পর্শ করিয়া যাইবেন।

মার অবর্ত্তমানে বাবার সংসার বানচাল হইয়া উঠিল। এমনও মনে হইল ঢেউয়ে নাচিতে নাচিতে বিরাট নৌকাখানা কখন একসময়ে তলাইয়া যাইবে। দিশেহারা হইয়া বাবা যাহাকে লইয়া আসিলেন, সে আর যাহাই হউক, তাহার মা হইতে পারিল না। মা হইবার মত স্বচ্ছ চক্ষু ইহার কই? অফুরন্ত হৃদয় ইহার কই? সে জানে যিনি তাহার মা, তাহার স্পর্শে ছিল যাদু, প্রাণে ছিল মমতা, অশ্রুতে ছিল অসংযত আশীর্ব্বাদ। সে জীবন আজ এক বৎসর হারাইয়া গিয়াছে।

ব্যথা ও তিক্ততায় তিমিরের মনটা একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। চোখে ঘুমের স্পর্শমাত্র নাই। বরং এ কয়েক মিনিটের মধ্যে চোখের ভিতরটা অতিমাত্রায় পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে। সে আস্তে আস্তে বিছানার উপর উঠিয়া বসিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত বসিয়া থাকিবার পর চাদরটা গায়ে জড়াইয়া সে খাট হইতে নামিল। সারা বাড়ীখানার কোথাও সাড়া-শব্দ নাই। শুধু দক্ষিণা হাওয়ায় ওদিকের জানালার পর্দাটা নিঃশব্দে দুলিতেছে। সে সোজা দেয়ালে টাঙানো

মার ছবিটার নীচে গিয়া দাঁড়াইল। মুখ তুলিয়া দেখিল, মা তাহারই দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া আছেন। এ দৃষ্টির সঙ্গে সে চিরপরিচিত। এ দৃষ্টির মাঝখানে থাকিয়াই সে এতবড় হইয়া উঠিয়াছে। এ অমূল্য দৃষ্টির সীমা নাই পরিধি নাই। প্রাণপ্রাচুর্য্যে উদ্বেলিত……অজস্র অপরিমিত। জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইবার সঙ্গেসঙ্গেই সে এ দৃষ্টি দেখিয়াছে, চিনিয়াছে। এ দৃষ্টিতে দীপ্তি আছে দাহ নাই, বিপুলতা আছে গর্জ্জন নাই, প্রখরতা আছে উষ্ণতা নাই। এ দৃষ্টি চিরদিন বর্ষার ধারা-সঞ্জীবিত মৃত্তিকার মত স্নেহ-উর্ব্বর।

মায়ের দৃষ্টির অক্লান্ত বর্ষণে তিমির প্লাবিত হইয়া উঠিল। সে হাত বাড়াইয়া সুইচ টানিয়া ঘরের আলোটা নিভাইয়া দিল। অন্ধকার! মৃত্যু আসিয়া এক ফুৎকারে যেনো সব মুছিয়া দিয়াছে।

ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিয়া তিমির ঘরের জানালাটা ভালো করিয়া খুলিয়া দিল। পথ পাইয়া হাওয়ার তরঙ্গ বেশী করিয়া ঘরে আসিয়া ঢুকিল। বসন্তের আগমনবার্ত্তা বহিয়া লইয়া ইহারা ঘরে ঘরে পৌছাইয়া দিতেছে। কোথা হইতে একফালি আলো ঘরের মেঝেয় আসিয়া পড়িয়াছে। বহুদূরে চাঁদ উঠিয়াছে বুঝি। তাহারই দাক্ষিণ্যের একবিন্দু….না, নগরীর ধূম-কলঙ্কিত গ্যাসের পাণ্ডুর আলোর একফোঁটা…নিঃসম্বল হৃদয় লইয়া তাহাকে সহানুভূতি জানাইতে আসিয়াছে। রাস্তার ওপারের বাড়ীগুলি সারি সারি দাঁড়াইয়া, যেন কোন অনাগত শোকের আশঙ্কায় মূহ্যমান। কোথা হইতে একটী মানুষের কম্পিত হা-হুতাশ কানে আসিয়া বিঁধিল। কোন ভাগ্য বিড়ম্বিত রাস্তায় লুটাইয়া কাতরাইতেছে বুঝি। শুধু দীর্ঘনিঃশ্বাসের গুরুভারটুকু পৃথিবীকে উপহার দিয়া সে বুঝি এখান হইতে চিরবিদায় লইতেছে।

জানালার বাঁদিকের কপাটটা একটু টানিয়া দিয়া তিমির আলোর গতি-পথটুকু রুদ্ধ করিয়া দিল। আজ আলোর চেয়ে বিশ্বব্যাপী আঁধারের কোমল স্পর্শের মূল্য তাহার কাছে অনেক বেশী বলিয়া মনে হইতেছে। যখন চোখের পাতায় পাতায় শ্রান্তি নামিয়া আসে তখন এই অন্ধকারের ছোঁওয়াটুকু

কী আরামের। যে ব্যথাতুর, যে মর্ম্মাহত, যে জীবনে সুখ কী তাহা চিনিল না, নিরন্ধ্র অন্ধকারের দরদ সে বোঝে। যে রাত্রিতে একটী প্রিয়প্রাণ বিদায় লইয়া চিরজনমের মত পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া যায় সে রাত্রির অন্ধকারের ঐশ্বর্য্যের তুলনা নাই। মৃত্যু অন্ধকারাচ্ছন্ন। তাই বুঝি মৃত্যু স্নিগ্ধ ও শান্তিময়। এপার আর ওপারে আলো, মাঝখানে একটা অন্ধকারের সেতু। এই সেতুর মুখে সমস্ত কলরব আর চঞ্চলতার অদ্ভুত পরিসমাপ্তি—পার হইয়া গেলে আবার ওপারে অপূর্ব্ব স্পন্দন। এপারে পথচলা, ওপারে পথচলা, মাঝখানে একটু ক্ষণিক বিশ্রাম, দেহ এলাইয়া একটু মুহূর্ত্তের ঘুম। তাহার মায়ের ঘুম এতদিনে নিশ্চয়ই ভাঙিয়া গিয়াছে। ওপারের আলোর মধ্য হইতে নির্নিমেষ নয়নে তিনি তাহার পানে তাকাইয়া আছেন। তিমির জানে এমনি এক একদিন স্মরণীয় রাত্রে এমনি অন্ধকারের স্বপ্ন দিয়া জাগাইয়া তাহার ব্যাকুল আত্মাকে তিনি নিবিড়ভাবে স্পর্শ করিয়া যান।

ঝড়্ ঝড়্ শব্দে তিনচারখানা লরী পর পর রাস্তা কাঁপাইয়া ছুটিয়া গেল। তিমিরের মনের মধ্য হইতে চিন্তার জাল খসিয়া পড়িল। সে হাত বাড়াইয়া আবার আলোটা জ্বালিল, জ্বালিয়া ধীরে ধীরে দরজা খুলিয়া সন্তর্পণে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

তিনতলার ছাদে আসিয়া তিমির দেখিল বাবা খোলা ছাদের উপর আসন পাতিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছেন।

স্ত্রীর মৃত্যু পবিত্রবাবুকে নূতন মানুষ করিয়াছে। তাহার দৈনন্দিন জীবনের কর্ম্মপন্থাকে ওলট-পালট করিয়া দিয়া একটা নবতর সূচী তাঁহার সম্মুখে মেলিয়া ধরিয়াছে। কাজকর্ম্ম তিনি কিছুই আর করিতে চাহেন না, তাহার বদলে ভাবিবার বাসনা তাহার অন্তরে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। দিবারাত্রি তিনি ভাবিয়া চলিয়াছেন এবং এই ভাবিবার বিপুল নেশাই তাঁহার মুখমণ্ডলে অসীম মন্থরতা আনিয়া দিয়াছে। সংসারের যাহা কিছু বড় এবং তুচ্ছ আর

একজনের উপর সমস্তই তুলিয়া দিয়া তিনি ছুটী লইয়াছেন। তিনতলা হইতে তিনি প্রায় নামেন না। মাটির কোলাহল তাহাকে উত্যক্ত করে ইহা তিনি আর চাহেন না। প্রতিদিন শেষরাত্রে তিনি এমনি করিয়া আকাশের নীচে আসিয়া বসেন এবং ভোরের পবিত্র গন্ধ ও মাথার উপরকার ঐ বিরাট রহস্যের কাছে তিনি তাহার হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া দিয়া ধ্যানমগ্ন চিত্তে অসীমের সহিত অন্তরঙ্গতা অনুভব করেন।

তিমির ধীরে ধীরে তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

পবিত্রবাবু মুখ ফিরাইয়া বলিলেন ঃ বোসো। বলিয়া তিনি মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

বাবার পাশে তিমির নিঃশব্দে বসিয়া পড়িল।

অনেকক্ষণ কাহারো মুখ হইতে কোন কথা উচ্চারিত হইল না। পবিত্রবাবু একটি মৌন মূর্ত্তির মতো আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার সন্ধানী চোখের ভাষা নীল অন্ধকারে এক হইয়া মিশিয়া আছে। মৃদু নিঃশ্বাসের শব্দে মনে হইতেছে, এতদিন পরে তিনি বুঝি অক্ষয় ঐশ্বর্যের সন্ধান পাইয়াছেন।

উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল তিমির, তারার অক্ষরে শূন্যে লেখা রহিয়াছে এ পৃথিবীর আদিম ইতিহাস। পরম আশীর্ব্বাদের মত আকাশ নুইয়া আছে মাথার উপর। যেন সন্তানের মত এ পৃথিবীকে কোলে লইয়া যুগ যুগ ধরিয়া ...নি নীরবে এমনি করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

... ঃ জানি তুমি ঘরের ভিতর জেগে রয়েছো এবং জানতাম তোমার আজ ...ুম ভাঙবে।

কথার শব্দে তিমির ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, বাবা তাহার দিকে চাহিয়া আছেন। হঠাৎ তাহার মুখে কথা জোগাইল না। সে শুধু ডাকিল ঃ বাবা! বলিয়া চুপ করিয়া গেল।

পবিত্রবাবু আবার সামনে দৃষ্টি প্রসারিত করিলেন, বলিলেন ঃ কিছু বলবে কী? জানি তুমি দুঃখ পেয়েছো···জানি তোমাকে আঘাত লেগেছে।

তিমির বিস্মিত হইয়া বাবার মুখের পানে চাহিল। তাঁহার অন্তদৃষ্টি কী গভীর হইয়া উঠিয়াছে! যদিও সে আজ কোন কথা তাঁহাকে বলিতে আসে নাই, সে যে আজ এই নিঃসীম আকাশের নীচে বসিয়া বাবার হৃদয়ের স্পর্শ লইয়া তাহার বেদনাবিক্ষত হৃদয়ে একটু আরাম পাইতে আসিয়াছিল তাহা তাঁহার অগোচর নাই। বলিবার অনেককিছুই ছিল, কিন্তু আজ তাহার মনের মধ্যে সমস্তই অগোছাল হইয়া আছে। সে শুধু বলিল: কী জানি, মাঝে মাঝে কেন মায়ের কথা মনে পড়ে।

কিছুক্ষণ পবিত্রবাবু নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন: জানি, তোমার নূতন মা তোমায় ভাল চোখে দেখছেন না। নূতনের মাঝে তাঁকে পাওনি বলেই বুঝি তিনি মাঝে মাঝে এসে তোমায় দেখা দিয়ে যান। কিন্তু তিমির, তুমি তাঁকে ভুলে যেও, ভুলে গেলেই তোমার পক্ষে মঙ্গল হবে।

তিমির স্তব্ধ হইয়া বাবার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

পবিত্রবাবু বলিলেন: পিছনের দিকে তাকিয়ো না। পিছনের দিকে তাকালেই সামনের আলো যাবে হারিয়ে। তোমার জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গেই তুমি যে পথকে সুগম বলে ভেবেছো সেই পথেই তুমি গিয়েছো; তেমনি করে চিরদিন তুমি চলে যাও। তোমার কোন ইচ্ছায় অসম্মতি আমার কোনদিনই ছিল না, আজও নেই। কেবল চেয়েছি তুমি যেদিকেই যাও ভরা হয়ে পরিপূর্ণ হ'য়ে অনন্ত হ'য়ে ওঠো। তোমার ভিতর অসীম স[illegible]ন তুমি তাকে মুকুলিত করো। কেবল বলে রাখি পথে যেতে যেতে য[illegible] পাও, আমার কাছে ফিরে এসে সান্ত্বনা নিয়ে যেও।

একটু থামিয়া নিজের কপালের উপর ধীরে ধীরে একবার হাত বু[illegible] পবিত্রবাবু আবার বলিলেন: এ জগতে আপন ক'রে ভাবতে যাওয়ায় [illegible] অনেক। বিজড়িত গ্রন্থি ছিন্ন করার মাঝে একটা পরম আনন্দ আছে [illegible] এই মহাব্যাপ্তির কোলে ব'সে আমি তা টের পাই। আকর্ষণের মাঝে যে আনন্দ আছে তা অল্পায়ু। তারই মাঝে আঘাত আছে, দুঃখ আছে, আছে

বেদনা আর গ্লানি। তার বিস্তার নেই, প্রসার নেই, আছে পঙ্গুতা আর সঙ্কীর্ণতা। তাই তার মাঝে আছে বাধা, তাই সে পঙ্কিল। তিমির, এ পৃথিবী নির্দয়, কৃপণ—এর মাঝে স্নেহ, মায়া, মমতা খুঁজে বেড়ানো একটা বাতুলতা। আত্মশক্তি ক্ষয় করা ছাড়া আর কিছু নয়। তাই বলি তুমি স্বাধীন হও, মুক্ত হও, তীক্ষ্ণ হও, তীব্র হও, শানিত অস্ত্রের মত সবকিছুকে খান্ খান্ করে কেটে তুমি সামনে এগিয়ে যাও।

পূর্ব্বদিকের আকাশটা অস্পষ্ট সাদা হইয়া উঠিয়াছে। তাহারই একটা স্বচ্ছ আভাস পশ্চিম দিগন্ত অবধি বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। আলোর আর খুব বেশী দেরী নাই।

পবিত্রবাবু আসনপীড়ি হইয়া সোজা হইয়া বসিলেন। তিমিরের দিকে তাকাইয়া কি বলিতে গিয়া হঠাৎ চুপ করিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিবার পর ধীরে ধীরে চক্ষু বুজাইয়া বলিলেন ঃ দুঃখ পেয়েছো, সে দুঃখকে সহ্য করার মতন সাহস ও শক্তি সঞ্চয় করার চেয়ে বড় প্রতিকার আর কিছু নেই। সমস্ত আঘাত মাথার উপর দিয়ে ডিঙিয়ে দিতে পার্‌লে মন আর মোচড় খেয়ে উঠবে না। মনটাকে ঠিক তালিম দিয়ে রাখতে পারলেই আঘাতকে ভয় পাওয়া তো দূরের কথা, তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে। আঘাত পেয়েছো, যাও আবার কিছুদিন ঘুরে এসো বাইরে থেকে.... মনটাকে ভুলিয়ে এসো। হাতের মুঠো আমার চিরদিনই তোমার কাছে মুক্ত।

ঃ এই তো সেদিন সারা বাংলা দেশটা ঘুরে এলাম বাবা।

ঃ এবার ভারতবর্ষটা ঘুরে এসো! তোমার বাস শুধু বাংলা দেশে নয়, ভারতবর্ষেও।

ঃ তাও আর বাকী নেই বাবা।

ঃ বাকী নেই, তবু যাও....তোমার মাথায় যে পরিকল্পনা আছে তাকে রূপ দিতে আর দেরী কোরো না।

ঃ আপনার মুক্ত হস্তের সুযোগ নিয়ে আমি ঐশ্বর্য্যের অপব্যয় করছি কিনা সে কথা ভেবে আমি মাঝে মাঝে সারা হ'য়ে যাই বাবা। ভয় হয়, এ অর্থ ব্যয়ের যদি কোন অর্থ না থাকে ?

ঃ যদি অর্থ না থাকে তবুও ব্যর্থ হবে না, পৃথিবীর মধ্যে অন্ততঃ একটা লোকেরও জীবনে যদি আলো আন্‌তে পারো, তা'হলেই তুমি সফল হ'বে।

অন্ধকার কাটিয়া গিয়াছে। সহরের প্রাণস্পন্দন জাগিয়া উঠিয়াছে, নীচের রাস্তা হইতে গাড়ীর শব্দ ও জনতার কোলাহল একটু একটু কানে আসিয়া বাজিতেছে। তিমির বাবার পায়ের কাছে প্রণাম করিয়া আস্তে আস্তে নীচে নামিয়া গেল।

দুই

দোতলায় নিজের ঘরে ঢুকিয়াই তিমির রাস্তার কোলাহল আরো বেশী করিয়া শুনিতে পাইল। মনে হইল কয়েক শত লোক বাড়ীর সামনেই যেন হট্টগোল বাধাইয়াছে।

ক্রমে সরকার মশাইএর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। তিনি যেন চীৎকার করিয়া কাহাদের ভাগাইবার চেষ্টা করিতেছেন। তিমির জানালার সামনে গিয়া দেখিল, কাঙাল ভাগ্যহীনের দল গেটের সামনে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ধাঁ করিয়া তাহার মনে পড়িয়া গেল, আজ রবিবার···দরিদ্র বিদায়ের দিন। আজ আসিবার দিন, তাই তাঁহারা আসিয়াছে। কাল হইতে মনের ভিতর যে পাষাণ-ভার চাপিয়াছিল তাহাতেই এ কথাটা চাপা পড়িয়াছিল। কিন্তু সরকার মশাইএর এ কাণ্ডটা সে মোটেই বুঝিতে পারিল না।

তাড়াতাড়ি ড্রয়ার হইতে মনিব্যাগটা টানিয়া লইয়া পকেটে পুরিয়া সে একেবারে নীচে নামিয়া আসিল। সরকার মশাইএর সামনে দাঁড়াইয়া বলিল : করছেন কী সরকার কাকা !

সরকার মশায় বলিলেন : তোমার নতুন মার হুকুম, তিনি বলেছেন এম্‌নি করেই এদের বিদায় ক'রে দিতে। রাম সিং নিয়ে গেছে তাড়িয়ে একদল ঐ পশ্চিম দিকে। বলিয়া সরকার মশাই আবার তাহার কাজে মন দিলেন।

তিমির কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। সবই সে বুঝিল। কিন্তু আশ্চর্য্য হইল না। মৃত সতীনের সন্তানের চেয়ে আপনার ইহারা নয়। এই স্বাভাবিক অভ্যর্থনায় তাই আশ্চর্য্য হইবার কী আছে। তিমির উপর দিকে মুখ তুলিয়া একবার তাহার নূতন মার ঘরের দিকে তাকাইল। দেখিল জানালার

পর্দ্দার ফাঁক দিয়া তিনি এই দিকেই তাকাইয়া আছেন। তিমির মুখ নামাইয়া লইল।

ইতিমধ্যে অনেকেই সরিয়া পড়িয়াছে। কেবলমাত্র যাহারা জাঁকিয়া বসিয়াছিল, উঠি উঠি করিয়াও উঠিতে চাহিতেছিল না তাহারাই জন কয়েক এখনো দাঁড়াইয়া আছে। হঠাৎ 'রাজাবাবু'র দর্শন পাইয়া ব্যর্থ-চক্ষু তাহাদের আশায় ভরিয়া উঠিয়াছে।

তিমির আবার সরকার মশাইএর কাছে গিয়া দাঁড়াইল, বলিল : থামুন, সরকার কাকা, আর কিছু বলবেন না এদের, এরাও তো মানুষ, এদেরো তো পেটে খিদে আছে। খেতে না পেলে এরা যে এইখানে মরে থাকবে, দুর্গন্ধে ঘরে কী আরামে থাকা যাবে?

: তা তো বুঝলাম, কিন্তু জানো তো তোমার নোতুন মা কী রকম কড়া।

: তা আর জানি নে...নোতুন হ'লেও তিনি আমার মায়ের পদ পেয়েছেন ...মাকে ছেলের আর চিনতে ক'দিন লাগে? : তারপর যে কয়জন এতক্ষণ নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়াছিল তাহাদের দিকে চাহিয়া তিমির বলিল : এসো।

সে তাহাদের বাড়ীর সম্মুখ হইতে সরাইয়া লইয়া গেল। নূতন মায়ের অপবিত্র দৃষ্টির সামনে দাঁড়াইয়া সে আর জর্জ্জরিত হইতে চাহিল না।

একটা পার্কের ভিতর দাঁড়াইয়া তিমির তাহাদের বিদায় করিল। অন্ধ খঞ্জ বিবস্ত্র নিরন্নের দল হাসিমুখে একে একে পার্কের ভিতর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে। জীবনের চেয়ে ভারী বোঝা বুঝি আর তাহাদের নাই। তবু বাঁচিয়া থাকিবার কী অদ্ভুত বাসনা ইহাদের মনের ভিতর। এই পৃথিবীর আলোটুকু চোখের সাম্‌নে হইতে মিলাইয়া যাক্‌, ইহা তাহারা কোনোদিনই চায় না। এই মরণাপন্ন দুর্ব্বহ জীবনটাকে আরও কিছুদিন জিয়াইয়া রাখিবার জন্য আনাচে-কানাচে অলিগলিতে খাদ্য-কণা সঞ্চয়ের আশায় ইহারা অহর্নিশি ছুটিয়া মরিতেছে। অথচ ভোগের পেয়ালা যাহাদের ফেনাইয়া উপছাইয়া

পড়িতেছে, তাহারা তাহাদের স্তূপীকৃত অর্থের কৃতার্থতা খুঁজিতেছে মদের দোকানে, রেসকোর্সে, বিলাসিনী নাগরিকার চরণ তলে। কিন্তু কে না জানে এই সর্ব্বহারার দলই হয়ত একদিন এই দেশকে অজস্র শক্তি দান করিয়াছিল। এবং আজও যদি দুটি খাইতে পায় তাহারা তাহাদের যাদুস্পর্শে দুদিনেই এই মাতৃভূমিকে অসীম ঐশ্বর্য্যবতী করিয়া তুলিতে পারে।

তিমির দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল ভিখারীর দল রাস্তায় বাহির হইয়া যাহার যে দিকে খুশী চলিয়া যাইতেছে। গত কয়েকদিনের উপবাসের প্রতিকার আজ তাহারা করিতে পারিবে ইহাতে খুশীর যেন অন্ত নাই! একটী অর্দ্ধ-উলঙ্গ স্ত্রীলোক ধীরে ধীরে রাস্তা পার হইয়া ওপাশের গাড়ীবারান্দার নীচে গিয়া দাঁড়াইল। আঁচলের কোনে বাঁধা তিমিরের দেওয়া আধুলিটী বাহির করিয়া হাতের তালুতে লইল এবং বারংবার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল। একবার সে হাতটা মুঠা করিয়া ধরে, আবার খুলিয়া ঝক্‌ঝকে আধুলিটী বাহির করিয়া চোখের সামনে তুলিয়া ধরে। এমনি করিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া নানাভাবে স্পর্শ করিয়া সে মুদ্রাটীর ভিতর প্রাণ-স্পন্দন অনুভব করিল। তারপর হঠাৎ তাহার বাম বাহুতে ধরা নগ্ন শিশুটীকে বিপুল আবেগে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার ক্ষুদ্র শীর্ণ মুখে অজস্র চুম্বন করিতে লাগিল।

তিমির দেখিল তাহার ম্লান ক্ষধাতুর দুই চোখে জলধারা নামিয়া আসিয়াছে। যে প্রাণরস, যে স্নেহ এতদিন অবিচ্ছিন্ন দারিদ্রের নিষ্পেষণে শুষ্ক হইয়াছিল তাহা ঐ নগণ্য মুদ্রাটীর স্পর্শে সহসা এমন করিয়া উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে যে তাহাকে সে আর ধরিয়া রাখিতে পারিল না। আজ তাহার এত সুখ, কিন্তু কাল যখন আবার তাহার হাতের মুঠা শূন্য হইয়া যাইবে আবার তাহার দুই চোখে ঘনাইয়া আসিবে সেই চিরকালের প্রাণধারণের ব্যথা।

তিমির রাস্তা পার হইয়া তাহার সাম্‌নে গিয়া দাঁড়াইল এবং পকেট হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া তাহার সাম্‌নে ফেলিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি উধাও হইয়া গেল।

রাস্তায় রাস্তায় বেড়াইয়া বন্ধুদের বাড়ী ঢু দিয়া তিমির যখন বাড়ী ফিরিল, তখন বেলা এগারোটা। ঘরে ঢুকিয়া তাড়াতাড়ি সে জামা কাপড় ছাড়িয়া ফেলিল এবং স্নান সারিয়া লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। একটু পরেই ঘরের সাম্নে মেনকা ঝি দেখা দিল। বাড়ীর ঝিদের মধ্যে মেনকাই সবচেয়ে পুরানো এবং তাহাকে মানুষ করিবার ভার সেও নাকি তাহার মায়ের সহিত ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছিল। বস্তুতঃ তাহার যত্ন ও স্নেহ মাঝে মাঝে তাহার মৃত মাকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

: না খেয়ে দেয়ে কোথায় গিয়েছিলে এত বেলা ?

: সে তুমি বুঝ্‌বে না ঝি, জল্‌দি খাবার নিয়ে এসো আমার, এখনি বেরুতে হবে আমাকে। বলিয়া ঘরের বাহির হইয়া বারান্দাটা ঘুরিয়া একটু ওদিকে যাইবার উদ্যোগ করিতেই ঝি বলিল : ওদিকে যেও না, তোমার নোতুন মা বারণ করে গেছেন। আর তোমাকে একথা জানাবার ভার তিনি আমায় উপর দিয়ে গেছেন।

: মানে।

: মানে, ওদিকে তোমার যাওয়া বারণ। বাড়ীর মধ্যে সবাইএর সব জায়গায় যাওয়াটা তিনি পছন্দ করেন না।

তিমির তবুও কথাটা বুঝিতে পারিল না। শুধু বুঝিতে পারিল নোতুন মা এ বাড়ীর মধ্যে তাহার প্রসারতাকে যেন একটু একটু করিয়া সঙ্কুচিত করিয়া আনিতেছেন। একবার মনে করিল সে তৎক্ষণাৎ তাহার কাছে গিয়া কথাটা পরিষ্কার করিয়া আনে। কিন্তু এ নোংরামিতে তাহার আর প্রবৃত্তি হইল না। সে তাড়াতাড়ি সিড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া একেবারে কলঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

স্নান করিয়া ভাত খাইয়া তিমির জামা কাপড় পরিতে লাগিল। এখনি সে বাহির হইয়া যাইবে। আবার সে কিছুদিন বিদেশে বিদেশে টহল দিয়া ফিরিবে। কোথায় যাইবে তাহার এখনো কিছু ঠিকানা নাই। তবে এবার

গিয়া সে তাহার পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য্য সুরু করিবার জন্য একেবারে ক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিয়া আসিবে। ভ্রমণে তাহার কদাচ ক্লান্তি নাই।

ছোট সুটকেশটা হাতে লইয়া তিমির তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিল। বাবার নিকট হইতে পূর্ব্বাহ্ণেই বিদায় লওয়া ছিল। সরকার কাকা কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছেন। আর কাহাকেও কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। রাস্তায় দাঁড়াইয়া তিমির ভাবিতে লাগিল কোনদিকে যাওয়া যাইবে। হাওড়ায় না শিয়ালদহে। শেষ পর্য্যন্ত সে হাওড়াতেই যাইবার মনস্থ করিল। এবং হাওড়ায় পৌঁছাইয়া একটা দিল্লীর টিকিট কিনিয়া বসিল।

ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই, গাড়ীর এখনো দেরী আছে। টিকিট হাতে লইয়া সে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করিতে লাগিল। মন ভাল করাটাই যদি তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে আন্‌মনা হইয়া হাওড়াতেই না হয় খানিকটা সে ঘোরাঘুরি করিল। মন ভাল করিবার ইহাও একটা উৎকৃষ্ট পন্থা বৈকি। গেট দিয়ে ঢুকিতেছে বাহির হইতেছে কত রকমের লোক—কত রকমের স্ত্রী-পুরুষ, ছেলে বুড়ো; পাঞ্জাবী মাড়োয়ারী, সাহেব বাঙালী—গায়ে তাহাদের এখনো লাগিয়া আছে বিদেশের টাটকা আমেজ। তাহাদের দিকে চাহিয়া মনটা খানিকটা অন্যদিকে চলিয়া যায় বৈকি। কিংবা লাইনে দাঁড়াইয়া কাহারো একটা থার্ড-ক্লাসের টিকিট কাটিয়া দিলেও খানিকটা সময় কাটিয়া যায়। কিন্তু তাহা না করিয়া সে একটু একটু করিয়া বুক ষ্টলের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। এবং একটা খবরের কাগজ কিনিয়া লইয়া প্লাটফর্মের গেটের দিকে আগাইয়া গেল। প্লাটফর্মে ঢুকিয়া দেখিল গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। একটা কামরায় উঠিয়া সে একপাশে খানিকটা জায়গা দখল করিয়া বসিল। খানিক পরেই বাঁশী বাজাইয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল। পিছনে ঠেস্ দিয়া বসিয়া তিমির সাম্‌নে খবরের কাগজটা মেলিয়া ধরিল।

গাড়ী দুই তিনটা ষ্টেশন পার হইয়া আসিয়াছে। কাগজের পৃষ্ঠার উপর দৃষ্টি রাখিয়া তিমির নোতুন মার অদ্ভুত কথাটা ভাবিতে লাগিল। এমন অসম্ভব

কথা তাহার মুখ দিয়া কী করিয়া বাহির হইতে পারে তাহা সে ভাবিতে পারিল না। দুদিন পরে সবকিছুই যাহার হইবে বাড়ীর মাঝখানে তাহার সম্মুখে আজ প্রাচীর তুলিয়া রাখাটা ক্ষণিক কর্তৃত্বের অদ্ভুত খামখেয়াল ছাড়া আর কী বলা যাইতে পারে। সেই যে এ বাড়ীর ভাবী মালিক, তাহার হিংসাবৃত্তি তাহাকে ভুলাইয়া রাখিয়াছে। তিনি তাহার গর্ভধারিণী না হইতে পারেন, তাহার জন্য বক্রদৃষ্টি তাহার চোখের কোণে ভাসিয়া উঠুক তাহাতে ক্ষতি নাই কিন্তু তাহার অধিকারে হস্তক্ষেপ, তাহার হাতের উপর সোজাসুজি আঘাত—ইহা তাহার নোতুন মার অদূরদর্শিতার লক্ষণ ছাড়া কিছু নয়। ক্ষমতাপ্রিয়তার আতিশয্যে তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন যে এ বাড়ীর মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত যে স্রোতের মত ছুটিয়া বেড়াইয়াছে তাহাকে দেওয়াল উঠাইয়া আটকাইয়া রাখা সম্ভব নয়। এ বাড়ীতে রক্তের সম্বন্ধ তাহার জন্মের দশ মাস আগে হইতে নাড়ীতে নাড়ীতে বাঁধা হইয়া আছে।

ঃ বাবু একটা পয়সা ঃ অনেকক্ষণ হইতে একটী পনেরো-ষোলো বছরের ছোক্‌রা সাম্‌নে দাঁড়াইয়া ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিতেছে।

খবরের কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া তিমির দেখিল, একটী অন্ধ বালক। চক্ষু অর্দ্ধমুদ্রিত। পাতা ঘন-ঘন পিটপিট করিতেছে। তারা দুইটা উপরে অদৃশ্য হইয়া আছে। মাঝে মাঝে ঠিক্‌রাইয়া আবার নীচে নামিয়া আসিতেছে।

তিমির খানিকক্ষণ তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিয়া বলিল ঃ যা, পয়সা নেই।

ঃ বাবু একটী পয়সা ঃ সে নড়িতে চাহে না।

তিমির বিরক্ত হইয়া উঠিল, বলিল ঃ কাজ কর্‌বি আমার বাড়ীতে?

ঃ চোখে কিছু দেখতে পাইনি বাবু, ভগবান আমাকে অন্ধ করেছে ঃ বলিয়া সে চোখের সাদা অংশটা একবার বাহির করিয়া ফেলিল।

ঃ আচ্ছা দাঁড়া ঃ বলিয়া তিমির পকেট হইতে একটী পয়সা ও একটা সিকি বাহির করিয়া সাম্‌নে ধরিয়া বলিল ঃ যেটা চাহিবি সেটাই পাবি…কোন্‌টা?

: বাবু ঐটা : বলিয়া সে আত্মবিস্মৃত হইয়া আনন্দের সহিত সিকিটা দেখাইয়া দিল।

সঙ্গে সঙ্গে তিমির পটাস্ করিয়া তাহার গালে এক চড় কষাইয়া দিল। অন্ধ! ইহারাই দেশের ভিক্ষুকের সংখ্যাকে ভারী করিয়া রাখিয়াছে। ইহারা জানে, উপার্জ্জনের এত বড় সহজ পন্থা সাম্‌নে থাকিতে নিজেদের সামর্থকে খাটানো বোকামি ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু এ মিথ্যা দারিদ্রের লজ্জা ইহাদের বুকে কোনদিনই বিঁধে না—যদি বিঁধিত তাহা হইলে এতদিনে দেশ নূতনতর হইয়া যাইত।

: টিকেট আপনার ?

তিমির পকেট হইতে টিকেটটা বাহির করিয়া চেকারের হাতে দিল। চেকার টিকেটটা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিল : এ গাড়ী তো দিল্লী যাবে না ?

: কোথায় যাবে ?

: আজীমগঞ্জ।

সহজভাবে তিমির বলিল : ঠিক আছে।

: মানে ?

: মানে, ঐ দিকেই না হয় যাওয়া যাবে আর কি।

: কিন্তু টিকেট তো আপনার দিল্লীর।

: তার মানে বলছেন, নেবে যেতে হবে তো ? যে দিক দিয়েই হোক পয়সাটা কিন্তু কোম্পানীকে দিয়েছি। বিনা পয়সায় যাচ্ছি না।

একটা ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ী থামিল। চেকার টিকেটটা তিমিরকে ফিরাইয়া দিয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া গেল। কিছু হাতাইবার চেষ্টায় চাপ দিতে সুরু করিয়া হঠাৎ কেন সে সরিয়া পড়িল তিমির তাহা বুঝিতে পারিল না।

গাড়ী আবার চলিয়াছে দুদিকের ধূসর শূন্য প্রান্তর বৈকালিক রোদে ক্রমেই সোনালি হইয়া উঠিতেছে। মাঝে মাঝে এক একটা গ্রাম, তার পরেই আবার অবারিত মাঠ। জনহীন শস্যহীন উলঙ্গ মাঠের পানে চাহিয়া চাহিয়া তিমিরের

চোখ ঝিমাইয়া আসিতে লাগিল। ডান হাতের উপর মাথাটা রাখিয়া সে আস্তে আস্তে চোখ বুজাইল।

তন্দ্রা ভাঙিতে তিমির দেখিল গাড়ী একটা ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া আছে। আড়মোড়া ভাঙিয়া সে হাই তুলিল। ঘাড় গুঁজিয়া ঘুমাইয়া তাহার ঘাড় ও পিঠ ব্যথা হইয়া গিয়াছে। খবরের কাগজটা তাহার কোলের উপর তখনো ঠিক খোলা রহিয়াছে। একটী লাইনও তাহার পড়া হয় নাই। সেটা ভাজ করিয়া রাখিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। জুতাটা পরিয়া একটু পায়চারি করিয়া সে আবার নিজের জায়গায় আসিয়া বসিল। বসিয়া ঘণ্টার অপেক্ষা করিতে লাগিল। ৬।৭ মিনিট কাটিয়া গেল। কিন্তু গাড়ী ছাড়িবার কোনো লক্ষণ দেখিতে পাওয়া গেল না। তখন বিরক্ত হইয়া সুটকেশটী হাতে লইয়া সে গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। নামিয়াই বুঝিতে পারিল সেটা কাটোয়া ষ্টেশন।

সূর্য্য ডুবিয়া গিয়াছে। তখনো অন্ধকার হয় নাই। তিমির প্লাটফরমের উপর এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। গাড়ী হইতে অনেক লোক নামিয়াছে পোঁট্‌লা পুঁটলি বাঁধিয়া যে যার গন্তব্য স্থানে চলিয়া যাইতেছে। যাহারা আবার গাড়ীতে উঠিবে তাহারা এখানে ওখানে দাঁড়াইয়া পানবিড়ি সিগ্‌রেট খাইতেছে। এদিক ওদিক তাকাইতে তাকাইতে তিমির সহরের মধ্যে আসিয়া ঢুকিল। এবং সাম্‌নেই একটা ভাল খাবারের দোকান দেখিতে পাইয়া তাহাতে ঢুকিতে যাইবে এমন সময় পিছন হইতে শুনিতে পাইল : 'রাজাবাবু'।

সর্ব্বহারাদের দেওয়া এ পরিচিত নাম শুনিতে পাইয়া তিমির মুখ ফিরাইয়া দেখিল, ২৪।২৫ বছরের একটী অপরিচ্ছন্ন রোগা মেয়ে তাহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছে। মেয়েটী মাথা তুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে তিমির অবাক হইয়া তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল।

মেয়েটী বলিল : রাজাবাবু, চিন্‌তে পার্‌ছো না? রোগে যখন রাস্তায় পড়ে' ম'রে যাচ্ছিলাম তখন তুমি আমাকে বাঁচিয়েছিলে?

তিমিরের মনে পড়িল কলিকাতার রাস্তায় মৃতপ্রায় এই ভিখারী মেয়েটাকে ডাক্তার দেখাইয়া সে বাঁচাইয়া ছিল বটে। মেয়েটা ফুটপাতের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া মৃত্যু যন্ত্রণায় কী বীভৎস চীৎকারই না করিতেছিল। তিমির তাহাকে উঠাইয়া আর কোনস্থান না পাইয়া গঙ্গার ধারে একটা সেডের নীচে রাখিয়া তাহার চিকিৎসা করাইয়াছিল। তিমির জিজ্ঞাসা করিল—কিন্তু তুমি এখানে কেন?

মেয়েটী বলিল: কী আর কর্‌বো, মাটী থেকে দাঁড়িয়ে উঠে তুমি তো জানো, কতদিন তোমার কাছে ভিক্ষা নিয়েছি। কিন্তু যাদের মর্‌বার এখনো দেরী আছে তাদের কী শুধু ভিক্ষা করে চলে? আমারই একটী চেনা মেয়ের সঙ্গে চলে এলাম এখানে ঐ বাবুদের বাড়ীতে। একটা ঝিগিরি কাজ পেয়েছি। দিনরাত্রি আমাকে দারুণ খাটতে হয় এখানে। এত খাটুনির বদলে পাই শুধু দুবেলা দুমুঠো পেটের ভাত। মাইনে ব'লে আর আমার কিছু নেই।

: দুবেলা দুটো খাওয়া ছাড়া বাবুরা তোমাকে আর কিছু দেয় না?

: কিছুনা, এই পরবার ছেঁড়া ন্যাক্‌ড়াটুকুও আমাকে অন্য জায়গা থেকে জোগাড় কর্‌তে হয়। বাবুরা কিন্তু অগাধ বড়লোক। তা নাই দিক, দুবেলা দুটো খেয়ে আমি এখন সুখে আছি। আজ বাড়ীতে বিয়ে, এঁটো পাত ফেল্‌তে এসে রাজাবাবুর দেখা পেয়ে গেলাম। রাজাবাবু, তুমি না দয়া কর্‌লে এতদিন যে সব চুকে যেতো……তুমি ভগবান। তোমার পায়ের ধূলো নেওয়া ছাড়া আর কী কর্‌বো আমি: বলিয়া আবার একবার প্রণাম করিবার জন্য সে মাথা নোয়াইতে গেল।

তিমির বাধা দিয়া বলিল: থাক্‌, নিজের শক্তি থাক্‌তে কোনদিন্ ভিক্ষে কোরো না, এই কথা মনে রেখো, তাহ'লেই আমার পায়ের ধূলো নেওয়া হবে। বলিয়া তিমির আর দাঁড়াইল না। ডান দিকে ঘুরিয়া সোজা একটা রাস্তা দিয়া চলিয়া গেল। খাবারের দোকানে তাহার উঠা হইল না।

উন্মনা হইয়া সে চলিতে লাগিল। মনের ভিতর সহস্র কলরব উঠিয়াছে। ঐ ভিখারিণী মেয়ে! কলিকাতার কর্পোরেশনের ময়লাবাহী গাড়ী তাহাকে তুলিয়া লইয়া যাইতে পারে নাই। কঙ্কালসার কাঙালিনী উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। এবং ভিক্ষার গ্লানি হইতে বাঁচিবার জন্য প্রাণপণে লাগিয়া গিয়াছে। সে তাহাকে চিনিতে পারিয়াছে এবং একমাত্র সম্বল ঐ প্রণাম দিয়া তাহার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছে। ইহারাই বুঝি একমাত্র মানুষ যাহারা দয়া ভুলিতে পারে না। চলিতে চলিতে তাহার সারা গা দিয়া আনন্দ ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। ঐ ভিখারিণীর মেয়ে তাহাকে আজ যত আনন্দ দিয়াছে তাহার এতদিনকার জীবনে অত আনন্দ আর কেহ তাহাকে দিতে পারে নাই। ঐ ভিখারিণীই আজ তাহার অর্থব্যয়কে সার্থক করিয়া তুলিয়াছে।

কিন্তু ধন্য ঐ অগাধ বড়লোক! বেশী কিছু নয়, পরিশ্রমের ন্যায্য পাওনাটুকুও ছাড়িয়া দিতে তিনি রাজী নন। অথচ কে না জানে ঐ স্তূপীভূত অর্থের অন্তরালে লুকাইয়া আছে কাহাদের সুদৃঢ় মাংসপেশী। যাহারা তাহার বিত্তকে প্রসারিত করিয়াছে তাহাদের প্রাপ্য অংশটুকু ছাড়িয়া দিতে যাহার হাত উঠে না, তিনি প্রাচুর্য্যের সম্ভারে যতই স্ফীত হইয়া উঠুন না কেন তাহার মতন দীন দরিদ্র বুঝি পৃথিবীতে আর কেহ নাই। সঞ্চয়ের অচল বিকারে মন তাহার যুগে যুগে পঙ্গু হইয়া আছে।

সাম্‌নে অনেকখানি ভিড় জমিয়াছে। গোল হইয়া দাঁড়াইয়া তাহারা রাস্তার উপর কী যেন একটা দেখিতেছে। আস্তে আস্তে তিমির ভিড়ের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল: কী মশাই? কী হচ্ছে? তামাসা? না বাজী?

: হ্যাঁ মশাই বাজী—একেবারে ডিগ্‌বাজী : বলিয়া লোকটী চলিয়া গেল।

তিমির উঁকি দিয়া দেখিল, রাস্তায় একটী লোক মরিয়া পড়িয়া আছে। অকাল বৃদ্ধ···মানুষ বলিলে ভুল হয়, চাম্‌ড়া-ঢাকা একখানা আস্ত কঙ্কাল। জীবনের বোঝা আর বহিতে না পারিয়া দেহটা পিঁপ্‌ড়ে আর মাছিকে উপহার

দিয়া এ কৃপণ পৃথিবী হইতে সে সরিয়া পড়িয়াছে। জীবনে যাহাকে কেহ দেখিয়াও দেখিল না মরণে তাহার এত দর্শক জুটিয়াছে। ইহার চেয়ে আর কোন্ তামাসা উৎকট হইতে পারে।

ভিড় সরাইয়া তিমির তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল। এবার একটু একটু করিয়া অন্ধকার নামিতেছে, একটী দুটী করিয়া আলো জ্বলিতেছে। কোনোদিকে দৃকপাত না করিয়া তিমির একটানা অনেক দূর চলিয়া আসিল।

চীৎকার আর হট্টগোলের শব্দে মুখ তুলিয়া দেখিল, অদূরেই বিয়ে বাড়ী। সেখান হইতে একদল মানুষ—কেন কে জানে—যেন প্রাণভয়ে এদিকে ছুটিয়া পলাইয়া আসিতেছে। পিছনে তাড়া করিয়া আসিতেছে মোটা বাঁশের লাঠি হাতে একটী হিন্দুস্থানী দারোয়ান। তিমির লক্ষ্য করিয়া দেখিল, তাহারা ভিখারী। ব্যাপার আর কিছুই নয়। বিদায় করা হইবে না। দারোয়ান দিয়া তাই তাহাদের ভাগানো হইতেছে।

বাড়ীর সামনে আসিয়া তিমির দেখিল অনুরূপ ব্যাপারই চলিতেছে। আরো দুইজন দারোয়ান তাহাদের মধ্যে আসিয়া লাঠি সঞ্চালন করিয়া বলিতেছে ঃ হঠ্ যা, হঠ্ যা।

তাহারা মিনতি করিয়া বলিতেছে ঃ কিছু না হোক্, দুটী মুড়ি মুড়কী বাবা।

বারান্দায় দাঁড়াইয়া বাবু হুকুম দিতেছেন ঃ মারো শালাদের।

দারোয়ানের লাঠি বোঁ বোঁ শব্দ করিতে লাগিল। যাহারা পশু তাহারা একটু দূরে সরিয়া গিয়া দাঁড়াইল। যাহারা তাহা হইতেও অধম তাহারা লাঠি দেখিয়া ভয় পাইল না। দারোয়ান তাহাদের বেপরোয়া গলা-ধাক্কা দিতে লাগিল। তবু তাহারা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল ঃ আপনারা রাজা লোক, শুধু দুটী মুড়ি-মুড়কী বাবা।

শাঁ করিয়া একটা লাঠি একটী বৃদ্ধের হাতে আসিয়া পড়িল। বৃদ্ধ কব্জি চাপিয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল ঃ হা, ভগবান।

ধ্বক্ করিয়া তিমিরের চোখে আগুন জলিয়া উঠিল। সে আর দাঁড়াইতে পারিল না। ছুটিয়া গিয়া দারোয়ানের উদ্যত লাঠিটাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল: থাক্, উপকার এদের না করতে পারো, অপকার ক'রো না। যে রক্ত সৃষ্টির কাজে তোমাদের বাবুর ক্ষমতা নেই সে রক্ত ক্ষয় করবারও তার অধিকার নেই।

তারপর বৃদ্ধের কাছে আসিয়া কব্জিটা টানিয়া লইয়া বলিতে লাগিল: পেটের জ্বালাটা সহ্য করতে না পারো লাঠির ঘায়ের জ্বালাটা অন্ততঃ সহ্য করতে শেখো। মরতে না পারো মারটাও অন্ততঃ খাও।....পোকামাকড়রা যেমন ছুটে আসে আলো দেখে, তেমনি তোমরা ছুটে এসেছো এ বাড়ীর আনন্দ দেখে, কিন্তু কেউ জানো না, এ আনন্দে পুড়ে মরে যেতে হবে। মানুষ তোমরা নও তাই মানুষ চিনতে পারো না।

মুখ তুলিয়া তিমির দেখিল, অদূরে বিবর্ণ ম্লান মুখে দলে দলে দাঁড়াইয়া আছে ঘৃণিত অপমানিতের দল, লজ্জা নাই, গ্লানি নাই, দ্বিধা নাই, আছে শুধু সর্ব্বনাশা ক্ষুধা। ক্ষীণ পাণ্ডুর চোখে মিলাইয়া-যাওয়া আলোর মাঝে শুধু অনন্ত আশার প্রশ্ন। সমস্ত দিন ধরিয়া আজ ইহারা স্বপ্ন দেখিয়াছে, ঐ যে বাড়ীতে শানাই বাজিতেছে, প্রাচুর্য্যের জোয়ার ফেনাইয়া উঠিতেছে, দিনের শেষে তাহার তলায় গিয়া একবার হাত পাতিয়া দাঁড়াইবে। ভিক্ষাপাত্রে উড়িয়া আসিয়া পড়িবে একটা দুটী পয়সা, কিংবা দুটী মুড়ি....তাই দিয়া তাহারা সন্তানের অশ্রু আজ মুছাইবে। যাহাদের সন্তান নাই গাছের তলায় বসিয়া তাই দিয়া তাহারা ভুরিভোজন করিবে। কিন্তু....

তাহাদের মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া তিমির উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তকাল আর অপেক্ষা না করিয়া ছুটিয়া গিয়া সে একটা উঁচু ঢিপির উপর দাঁড়াইল। পকেট হইতে মানিব্যাগটা বাহির করিয়া শূন্যে উঁচাইয়া ধরিয়া চীৎকার করিতে লাগিল: কই এদিকে আয়, কার পেটে তোদের ক্ষিধে আছে ছুটে আয়, ছুটে আয়।

যাহারা এতক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া ছিল এই উদাত্ত আহ্বান শুনিয়া তাহারা নিমেষে তাহার চতুর্দ্দিকে সমবেত হইল। তিমির কোনদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া ব্যাগ খুলিয়া আনি, তুয়ানি, সিকি, আধুলি, নোট যাহা পাইল তাহাই বাহির করিয়া তাহাদের হাতের মধ্যে গুঁজিয়া দিতে লাগিল। আর বলিতে লাগিল : পালা, পালা, যদি বাঁচতে চাস্ তোরা এখান থেকে পালা...ভুল করে তোরা যেখানে ছুটে এসেছিলি সেটা বাঁচবার জায়গা নয়, সেটা তোদের শ্মশান। তোরা পালিয়ে যা···এখুনি পালিয়ে যা।

মিনিট কুড়ি এমনি অজস্র বিতরণের পর তিমির সহসা দেখিল তাহার মণিব্যাগ শূন্য হইয়া গিয়াছে। একটা কানা পয়সা বলিতেও তাহার ভিতর আর নাই। কিন্তু এখনো যে পাঁচ সাতজন তাহার সম্মুখে হাত পাতিয়া দাঁড়াইয়া। তিমির তখন দানের নেশায় পাগল হইয়া উঠিয়াছে। মণিব্যাগটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সে তাড়াতাড়ি স্যুটকেশের ঢাকনাটা খুলিয়া ফেলিল। হাতের কাছে যে বস্ত্র পাইল তাহাই ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া তাহাদের গায়ের উপর ফেলিতে লাগিল। কিন্তু এক মিনিটে তাহাও নিঃশেষ হইয়া গেল। এবার? তখনো একজন তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া···মাত্র একজন। আর যদি একটা কাপড় তাহার কাছে থাকিত কিংবা নেহাৎ পক্ষে একটা পয়সাও····পাগলের মত তিমির তাহার জামাকাপড় হাতড়াইতে লাগিল। কিন্তু একটা কানা কড়িও আর নাই। তিমির তখন নিতান্ত নিরুপায়ের মত চারিদিকে তাকাইতে লাগিল। দেখিল, পথের জনতা, দোকানের দোকানী, গৃহের অধিবাসী শত শত লোক দূর হইতে একদৃষ্টে হাঁ করিয়া তাহার পানে তাকাইয়া আছে।

: আমিই শুধু খালি হাতে ফিরে যাবো বাবা?

তিমির বিপদগ্রস্থের মত নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর হঠাৎ অস্বাভাবিক কণ্ঠে বলিয়া উঠিল : না না ফিরে যেতে হবে না, আছে আছে নিয়ে যাও : বলিয়া হড়্ হড়্ করিয়া মাথা গলাইয়া নিজের গায়ের জামাটা

খুলিয়া নিয়া তাহার গায়ের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া কহিল: পালা পালা-এবাড়ীর ছায়া আর জীবনে মাড়াস্নে।

আর দাঁড়াইয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই। উঁচু ঢিবি হইতে নামিয়া পড়িয়া তিমির একেবারে রাস্তায় আসিয়া পড়িল। এবং শত শত কৌতূহলী দৃষ্টির সম্মুখ হইতে নিজেকে আড়াল করিবার জন্য সে দ্রুতপদে পূর্বদিকে হাঁটিয়া চলিল। এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সে জনতার বাহিরে আসিয়া পড়িল ততক্ষণ তাহার গতি কমাইল না।

অপেক্ষাকৃত জনবিরল পথে আসিয়া তিমির তাহার গতি মন্থর করিয়া আনিল এবং এতক্ষণ পরে রাস্তার দুইপাশে মুখ তুলিয়া চাহিবার অবসর পাইল। দোকানের সংখ্যা এদিকে কমিয়া আসিয়াছে। এবং সেইজন্যই পথটা অতি প্রশস্ত বলিয়া মনে হইতেছে। আর কিছু দূর যাইলেই হয়ত সহর শেষ হইয়া যাইবে এবং দুই পাশে সীমাহীন মাঠের সন্ধান পাওয়া যাইবে। যাইতে যাইতে তিমির ডান হাত দিয়া তাহার কপালের ঘামটা মুছিয়া ফেলিল। এতবড় অভাবনীয় কাণ্ডের জন্য সে প্রস্তুতই ছিল না। আকস্মিক উত্তেজনায় তাহার শরীরে গ্রীষ্ম প্রখর হইয়া উঠিয়াছিল। এখন প্রকৃতিস্থ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহা একটু একটু করিয়া জুড়াইয়া আসিতে লাগিল। দখিণা বাতাসের ভিতর সমস্ত দেহটা ভাল করিয়া ছড়াইয়া দিয়া সে এক পা এক পা করিয়া আগাইয়া যাইতে লাগিল।

: জানি উত্তেজনা ক'মে এলেই গতি যাবে ক'মে, তাই তখন আর চেঁচামিচি করিনি: খট্ খট্ করিয়া একটা উঁচু হিলের জুতার সাড়া ঠিক তিমিরের পিছনে আসিয়া থামিয়া গেল।

মুখ ফিরাইয়া তিমির দেখিল, তাহার পিছনেই তরুণীটী দাঁড়াইয়া আছে। রাস্তার আলোর সমস্তটাই পরিপূর্ণ ভাবে তাহার মুখে আসিয়া পড়িয়াছে।

: জানি আপনার নাগাল আমি পাবোই, কেননা সেই কচ্ছপ আর খরগোসের রেস্টার কথা বরাবরই আমার মনে ছিল। আর জামাটা খরচের

দফায় যাওয়ার পর থেকেই ঐ গেঞ্জী-পরা দেহটা আমার চোখে একটা মার্কার মতন হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল।

তিমির বোকার মতন তাকাইয়া রহিল। একটা কথা বলিল না। দৃষ্টিটা তাহার আর একটু তীব্র হইলেই সেটাকে অনায়াসেই নির্লজ্জ নামে অভিহিত করিতে পারা যাইত।

তরুণী হাসিল। বলিল : একটা অস্বাভাবিক কিছু করবার পর দেখা গেছে, হয় মানুষ আত্মহত্যা করেছে, নয় পাগল হ'য়ে গেছে। শেষেরটার লক্ষণ আপনার ভিতর স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এখান থেকে রাঁচি যাওয়া গেলে না হয় টিকিট কাটিয়ে আপনাকে তুলে দিতে পারতাম্ : বলিয়া তরুণীটী একটু শব্দ করিয়া হাসিল, তারপর চলিবার উদ্যোগ করিয়া বলিল : চলুন, ওদিকে যাবেন তো ?

: না, আমি এদিকে যাবো : বলিয়া তিমির যেদিক হইতে আসিয়াছিল সেইদিক দেখাইয়া দিল।

: ও, এবার বাসায় ফির্বেন বুঝি ? উঠেছেন কোথায় ?

: কাল দেখা হ'লে বল্বো, আজ ঠিক বলা যাবে না।

: তাইতো, এতবড় কথা.......না ভাব্লে কী বলা চলে।...আচ্ছা নমস্কার...আসি তাহ'লে : বলিয়া তরুণী তাড়াতাড়ি সাম্নে অগ্রসর হইয়া চলিল।

তিমির কিছুক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল কোনদিকে যাইবে। এটা স্থির যে আজ আর সে সহরের ভিতর যাইবে না। কিন্তু ঐ সহরের পথেই যাইবে বলিয়া সে একটু আগেই তরুণীকে বলিয়াছিল...তা শুধু তাহাকে এড়াইবার জন্য। অচেনা জায়গায় অপরিচিত তরুণীর সহিত পথ চলিবার মত মনের অবস্থা আজ তাহার নাই। আর কয়েক মূহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া সে যেদিকে চলিতেছিল সেই দিকেই ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল।

ঃ ওদিকে যাবেন বল্‌লেন, আবার এদিকে আস্‌ছেন যে ?

তিমির মুখ তুলিয়া দেখিল একটা বাড়ীর দরজার সাম্‌নে তরুণী দাঁড়াইয়া আছে। বাড়ী ঢুকিবার আগেই বুঝি সে একবার পরিত্যক্ত পথের পানে ফিরিয়া তাকাইয়াছিল এবং তিমিরকে এই দিকেই আসিতে দেখিয়া তাহার পানে তাকাইয়া খানিক দাঁড়াইয়াছিল। তিমির সংক্ষেপে জবাব দিল ঃ একটু ওদিকে যাবো।

ঃ এই যে বল্‌লেন ওদিকে যাবেন, মানে পশ্চিম দিকে ?

ঃ হ্যাঁ. এদিক দিয়েই ওদিকে যাবো।

ঃ এ দিক দিয়ে ওদিকে যাবেন ! মানে পূর্বদিক দিয়ে পশ্চিম দিকে !

ঃ ঠিকই যাওয়া যাবে, কেননা পৃথিবী বৃত্তাকার।

তরুণী দাঁড়াইল না। বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া পিছনে সে দরজাটা সশব্দে বন্ধ করিয়া দিল।

তিমির কিছুক্ষণ দরজার দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর মুখ ফিরাইয়া আস্তে আস্তে সাম্‌নে আগাইয়া চলিল। এই মেয়েটীকে যতই এড়াইয়া চলুক মন হইতে সে তাহাকে কিছুতেই সরাইতে পারিল না। কবে কোথায় যেন সে ইহাকে দেখিয়াছে। আজ সহসা সে তাহা স্মরণ করিতে নাই পারুক, কিন্তু মেয়েটী যে তাহাকে চিনিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

সোজা রাস্তা ধরিয়া সে হাঁটিয়া চলিল। সন্ধ্যা পার হইয়া রাত্রি যে ক্রমেই বাড়িয়াই চলিয়াছে তাহাতে বুঝি তাহার খেয়ালই নাই। সে যে এদেশে আগন্তুক, তাহার যে ঘর বাড়ী এখানে নাই এবং রাত্রিবাসের উপযোগী একটী সুসভ্য ঠাই যে তাহাকে শীঘ্রই অন্বেষণ করিয়া লইতে হইবে তাহা বুঝি তাহার মনেও নাই। কেবল চিন্তার উল্কা একটার পর একটা উড়িয়া আসিয়া তাহার মনে বিপর্যয় ঘটাইয়া দিতেছিল।

যাইতে যাইতে হঠাৎ সে এক সময়ে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল এবং এক মূহূর্ত্ত কী যেন ভাবিয়া পিছন ফিরিয়া যে পথ সে ছাড়িয়া আসিয়াছিল সেই

পথেই পুনরায় হাঁটিতে সুরু করিল। দ্রুতপদে কয়েক মিনিট হাঁটিয়া সে তরুণীর বাড়ীর সামনে পৌঁছিল এবং কোনরূপ দ্বিধা সঙ্কোচ না করিয়া দরজার কপাটের উপর সশব্দে বারংবার আঘাত করিতে লাগিল : একবার খুলবেন তো, শুনচেন ?

অনেক ধাক্কাধাক্কির পর একটী হিন্দুস্তানী দারোয়ান বাহির হইয়া আসিল : কাকে চাই ? তিমির একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল : মানে সেই মহিলাটী··· যিনি একটু আগেই বাড়ীর ভিতর গেলেন।

দারোয়ান তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরাইয়া হাঁক দিল : হোই হরের মা, দেখে যা কে তোকে ডাক্‌ছে।

হরের মা ব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া অচেনা লোক দেখিয়া সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল, মুখে কাপড় ঢাকা দিয়া বলিল : ওমা! কোথাকার কে লোক গো!

তিমির বিপদে পড়িল, দারোয়ানকে বলিল : আরে এ নয়, ভদ্রলোকের মেয়ে····সবুজ সাড়ী পরা...

: নাম কী ?

: আরে নাম জিজ্ঞাসা করবো বলেই তো ডাক্‌ছি।

: কে পাঁড়েজী, কে ওখানে ? অন্দরের কোনস্থান হইতে মিহি কণ্ঠে প্রশ্ন আসিল। দারোয়ান বলিল : এক বাবু মায়ীজী।

: বাবু! কে বাবু?...ও! গায়ে জামা আছে ? না, শুধু গেঞ্জী পরা ?

দারোয়ান কিছু বলিবার আগেই দরজায় মাথা গলাইয়া যেদিক হইতে প্রশ্ন আসিতেছিল সেইদিকে তাকাইয়া তিমির চেঁচাইয়া বলিল : আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি সেই গেঞ্জী-মার্কা।

আড়াল হইতে হুকুম আসিল : পাঁড়েজী, ওকে অসভ্যের মতন চেঁচাতে বারণ করে দাও, আর বলে দাও, মায়ীজী দেখা করবেন কিনা কাল সকালে উনি খবর পাবেন।

তিমির আরো জোরে চেঁচাইল : মাত্র একমিনিট···মানে বুঝছেন না একটা কথা মনে পড়েছে, সেইটা শুধু····

হুকুম আরো কড়া হইল : বারণ করা সত্বেও উনি চেঁচাচ্ছেন, সুতরাং পাঁড়েজী, ওঁকে বলে দাও, মায়ীজী দেখা করবেন কিনা সে খবর উনি কাল সকালে না পেয়ে পাবেন সন্ধ্যেবেলা।

তিমির তবু নড়িল না, বলিল : জরুরী খবর, মানে কাল এখান থেকে চলে যাবো কিনা, সুতরাং....

এবার শুধু হুকুম আসিল : পাঁড়েজী, দরজা বন্ধ কর।

দরজা বন্ধ হইয়া গেল। তিমির বাহিরে দাঁড়াইয়া শুধু একবার হাসিল। কিছুক্ষণ আগে এই মেয়েটীর সহিত রাস্তায় সে কথা বলিয়াছে। তখন তাহাকে সহজ সরল দেখিয়াছে। আবার কয়েক মূহুর্ত্ত পরেই বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া হঠাৎ সে এমন করিয়া বাঁকিয়া গেল কী করিয়া তাহা সে বুঝিতে পারিল না। যাক্ তাতে তাহার দুঃখ নাই। যে কথা তাহার মনে পড়িয়াছিল তাহা ইহাকে জানাইতে না পারিলে এমন কিছু আসিয়া যাইবে না। কিছুক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া তিমির এদিক ওদিক চাহিল। তারপর রোয়াকের উপর দিয়া খানিকটা গিয়া রাস্তায় নামিবে এমন সময় হঠাৎ হড়াৎ করিয়া বাঁদিকের একটা দরজা খুলিয়া গেল। তরুণী হাসিমুখে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল : আসুন।

তিমির বিস্মিত হইয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল : এই যে!

তরুণী ঘরের ভিতর ঢুকিয়া বলিল : তারপর, বৃত্তাকার পৃথিবী এত শীঘ্রি পাড়ি দেওয়া হ'য়ে গেলো?

তরুণীর পিছনে পিছনে তিমির ঘরে আসিয়া বলিল : মনে পড়েছে এবার, আপনাকে সেই পুরীতে গাড়ীর টিকিট কেটে দিয়েছিলাম না?

: এইটাই জরুরী খবর নাকী? এর জন্যে রাত্রিবেলা এত চেঁচামিচি না করলেও তো চল্‌তো।

: খুব জোরে চেঁচিয়েছিলাম, না? অন্যায় হ'য়ে গেছে। অনেকক্ষণ থেকেই তেষ্টায় শুকিয়ে আছি কিনা, গলাটা ঠিক আয়ত্বে নেই। তার জন্যে মাপ চাচ্ছি।

: এ সময়ে মাপ না চেয়ে একগ্লাস জল চাওয়া উচিত ছিলো : বলিয়া তরুণী তাড়াতাড়ি পর্দ্দা সরাইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল এবং পরক্ষণেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল : ঝি খাবার নিয়ে এলে ফিরিয়ে দিয়ে বাহাদুরি দেখাবেন না যেনো : বলিয়া ব্যস্ত হইয়া তরুণী চলিয়া গেল।

তিমির মুখ বাড়াইয়া চেঁচাইয়া কহিল : পেয়িং গেষ্ট হ'তে পারবো না কিন্তু।

ধাঁ করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তরুণী রুষ্টকণ্ঠে কহিল : আবার চেঁচাচ্ছেন!

: না, মানে পয়সা কড়ি কিছু নেই কিনা।

: না থাকে গায়ের গেঞ্জীখানা খুলে দেবেন, আর একটা ন্যাকড়া দোবো, সেটা প'রে পরণের কাপড় খানা রেখে যাবেন : খট্ খট্ করিয়া জুতা ঠুকিতে ঠুকিতে তরুণী চলিয়া গেল।

একটু পরেই একটী ঝি একটা প্লেটে ফল ও মিষ্টি এবং অন্য প্লেটে লুচি তরকারী লইয়া হাজির করিল। অতিথি সেবার এত আয়োজন দেখিয়া তিমির বিস্মিত হইল। ঝিকে জিজ্ঞাসা করিল : এ সবের দাম লাগবে না তো?

ভুরু কুঁচ্‌কাইয়া ঝি বলিল : সে আবার কী? এটা হোটেল নয়।

দ্বিরুক্তি না করিয়া তিমির খাইতে লাগিল। ঝি বলিল : আপনি যেই হোন্…খুব ভাগ্য আপনার…লোক জনের ভার সব আমাদের উপর থাকে। আজ দিদিমণি নিজে তদারক করছেন…ফলগুলো তিনি নিজে কেটেছেন।

খাইতে খাইতে তিমির বলিল : তাই নাকি?

: হ্যাঁ, তাই বলছি ওজর করবেন না, খেয়ে নিন, বলিয়া ঝি চলিয়া গেল।

তিমিরের ক্ষুধা ছিল যথেষ্ট। কিন্তু তার চেয়ে বেশী ছিল তৃষ্ণা জল খাইয়া খাইয়া তার পেট ফুলিয়া উঠিল। খাবার বেশী কিছু খাইতে

পারিল না। হাত সাফ করিয়া সে একটা ইজিচেয়ার দখল করিয়া বসিয়াছে এমন সময় তরুণী আবার ঘরে আসিয়া ঢুকিল: একী খেলেন না যে? ভদ্রতা? না গেষ্ট্ চার্জ দেবার ভয়ে?

সোজা হইয়া বসিয়া তিমির বলিল: কোনটাই না। উদর রাজী হোলো না।

: বড়লোকের ছেলে জেনেই দিয়েছিলাম এগুলো, ভেবেছিলাম, অভ্যেস আছে, বদহজম হবে না। কিন্তু এ দেখ্‌ছি উলুবনে মুক্তো ছড়ানো: বলিয়া তরুণী খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। তারপর সহসা থামিয়া গিয়া বলিল: কিছু মনে কর্‌লেন না কী?

: পুরাকালের অতিথিরা আস্‌তো গৃহীকে কৃতার্থ কর্‌তে, এখনকার অতিথিরা আসে নিজেরা কৃতার্থ হ'তে, সুতরাং এদের কিছুটা চোখকান বুজে থাক্‌তেই হয়। তা ছাড়া সুবিধে এই যে আমি পুরাকালের দুর্ব্বাসা কিংবা বশিষ্ঠ নই।

তরুণী কহিল: ঠিক দুর্ব্বাসা কিংবা বশিষ্ঠ না হ'লেও, তাঁদের চেয়ে কম যান্ না এখনকার অতিথিরা। তাঁরা ভোজনের আগে অভিশাপের অগ্নি উদ্গার করতেন, এঁরা হজমের পরে বাইরে গিয়ে নিন্দে রটান। দুইটাই সমান ভয়ঙ্কর।

: দু'দলের কোনটাতেই আমাকে জড়াবেন না আশা করি।

: কী জানি, গাড়ীতে তিনঘণ্টার আলাপে মানুষ চেনা কঠিন। তাছাড়া ভিড়ের মাঝে টিকিট কেটে দিয়ে সাহায্য করেছিলেন আপনি, না জেনে শুনে মিথ্যে অপবাদ দিতে আপনাকে চাইনে। একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া তাহার হাতলের উপর বসিয়া কহিল: যাক্, তারপর হঠাৎ এদেশে এসে প'ড়লেন যে?

: ঠিক সোজা উত্তর না পেলে চ'টে গিয়ে তাড়িয়ে দেবেন না যেন। এ দেশে আসার আমার মৎলব ছিলো না মোটেই কিন্তু গাড়ীটা নিয়ে এলো তাই আস্‌তে হোলো।

মৃদু হাসিয়া তরুণী কহিল ঃ এ ক্ষেত্রে গাড়ীটারই অন্যায় বলতে হবে বৈকি, কিন্তু কথার উত্তর শুনে আপনাকে ভবঘুরে ছাড়া কিছু বলা যায় না।

ঃ খেয়ে দেয়ে ঘুমের আগে সমালোচনা শুনতে বেশ লাগে। কিন্তু আপনাকেও তো এখানে দেখার কথা নয়। বাড়ী যেন আর কোথাও ব'লেছিলেন মনে হচ্ছে।

তরুণী কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া রহিল, তারপর কহিল ঃ হ্যাঁ বাবা মারা যাওয়ার পর আমাকে যাযাবর হ'তে হ'য়েছে। তাঁর আর কোন সন্তান ছিলো না ব'লে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তিনি আমার নামে উইল করে গেছেন। ম্যানেজার মশাই ছুটি নিয়ে দেশে গিয়েছেন, ছুটি তাঁর ফুরিয়ে গেছে কিন্তু আজও তিনি ফিরে আস্‌ছেন না। সুতরাং দেশ বিদেশে ছুটে আমাকেই সব দেখে নিতে হ'চ্ছে।

তিমির আশ্চর্য্য হইয়া কহিল ঃ আপনার বাবা মারা গেছেন ?

ঃ হ্যাঁ, পুরী থেকে ফিরে আস্‌বার পর আবার তাঁর শরীর ভেঙে প'ড়্‌লো। তারপর এক মাসের বেশী তাঁকে আর ধ'রে রাখ্‌তে পারিনি। তিনি আমাকে একা রেখে চ'লে গেলেন আর আমার সমস্ত সময় কেড়ে নিয়ে গেলেন তাঁর বিপুল বিত্তের ভার আমার উপর চাপিয়ে। খানিকটা শান্ত হ'য়ে ব'সে কেঁদে আরাম পাবো সে অবসরও তিনি আমার জন্যে রেখে যান্‌নি।

ঃ আপনার মা ! ঃ তিমির জিজ্ঞাসু চোখে তরুণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ঃ আমি তাঁকে দেখেছি কিন্তু মনে পড়ে না। তিনি আমাকে জন্ম দিয়েছিলেন কিন্তু মানুষ করবার ভার দিয়েছিলেন বাবার উপর। বাবার লালন করবার শক্তি হয়ত ছিলো তাঁর চেয়ে কম, কিন্তু মার অভাব ভুলিয়ে দেবার ক্ষমতা ছিলো তার অফুরন্ত। আর··· ঃ কী বলিতে গিয়া তরুণী সহসা চুপ করিয়া আলোর দিকে তাকাইয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

তিমির আর প্রশ্ন করিল না। দেখিল, তরুণীর মুখে হারানো স্নেহের ব্যথা রেখায় রেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সাম্নের খোলা জালানা দিয়া হু হু করিয়া হাওয়া আসিতেছে। প্রথম ফাল্গুনের অবাধ দখিণা হাওয়া। তাহাতে শীতের আমেজ লাগিয়া আছে এখনো। তিমিরের গায়ে গেঞ্জী ছাড়া আর কোন আবরণ নাই। কাছে যাহা ছিল পথে সে সমস্তই দান করিয়া আসিয়াছে। কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া নিরুপায় হইয়া শেষে সে কোঁচার প্রান্তটা খুলিয়া গায়ে জড়াইয়া লইল।

ঃ চোখ থাকৃতে চোখ্ বুজে যারা পথ চলে, জীবনে তাদের ফাঁড়া আছে অনেক ঃ তিমিরের পানে তাকাইয়া এই কথাগুলা বলিয়া তরুণী চেয়ারের হাতল হইতে নামিয়া দাঁড়াইল, তারপর সহসা একটা সশব্দ হাসির লহর তুলিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

তিমির কিছু বুঝিল না। শুধু চমকিত হইয়া তাহার পথের পানে তাকাইয়া রহিল।

কয়েক মিনিটের মধ্যে একটা ইস্তিরি করা জামা হাতে লইয়া তরুণী পুনরায় ঘরে ঢুকিল এবং তিমিরের গায়ের উপর সেটা ছুড়িয়া দিয়া বলিল ঃ নিন্. এইটা পরে বসুন।

কুণ্ঠিত হইয়া তিমির কহিল ঃ কী দরকার ছিল এটার...

তরুণী মৃদু হাসিয়া বলিল ঃ পরুন, ভিকিরীর দান গ্রহণে লজ্জা পাওয়া উচিত নয়।

তিমির হাসিল। জামাটা গায়ে গলাইয়া বলিল ঃ ধন্যবাদ, একথা মনে করিয়ে দিয়েছেন ব'লে আপনাকে আর একবার নমস্কার জানাছি।

তরুণী আস্তে আস্তে জানালার সাম্নে গিয়া দাঁড়াইল, বলিল ঃ কী দরকার ছলো এত বাড়াবাড়ির। দানের অর্থ বুঝি, কিন্তু এ দানের অর্থ বুঝি না। এ দানে ভিকিরির সংখ্যা বাড়্লো বৈ কম্লো না। দানে মানুষের দারিদ্র্য ঘাচেনা। যাদের দেওয়া হোলো তাদের দৈন্য তো ঘুচ্লোই না উপরন্তু

যে দিয়েছিলো সেও ভিকিরিতে পরিণত হোলো। ব্যাপারটা উপভোগ করেছিলুম সত্যি।

তিমির কথা বলিল না।

তরুণী আবার বলিল: নিঃস্ব হ'য়ে দান করার মাঝে কবিত্ব এবং আধ্যাত্মিক কোন অর্থ থাকৃতে পারে, কিন্তু সেটা যে বাস্তব জীবনের একান্ত বিরোধী, এ কথা যে বোঝে না তার মাথার স্ক্রু ঢিলে হ'য়েছে বুঝতে হবে। এ যেনো আগডালে ওঠ বার জন্যে পথ পরিষ্কার করা যে ডালে দাঁড়িয়ে আছেন সেই ডালকে কেটে।

তিমির নীরব।

: সীমা পেরিয়ে যাওয়ার মাঝে খানিকটা শক্তির ঔদ্ধত্য ও বাহাদুরির প্রকাশ আছে। সেই প্রকাশের প্রখরতাই জনসমাজের বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ দানের মধ্যে হৃদয় এবং উদারতা হয়ত আছে, কিন্তু তাকে ছাপিয়ে উঠেছে ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর। তার প্রকাশে একদিন আপনি নিখিল বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ কর্‌বেন সন্দেহ নেই।

তরুণী থামিল। তিমির আরো খানিক নীরবে বসিয়া থাকিয়া বলিল: আপনার নাম কী জ্ঞানদা?

হঠাৎ রাগিয়া উঠিয়া তরুণী বলিল: এত স্বল্প স্মৃতি যাদের, তাদের একজন প্রাইভেট সেক্রেটারী রাখা উচিত, সব কথা মনে করিয়ে দেবার জন্যে।

: মানে হয় দেহগত নয় চরিত্রগত লক্ষণের সঙ্গে মিলিয়ে নাম রাখা এখনকার ফ্যাসান কিনা, তাই ভাব্‌লাম পূর্বনাম ত্যাগ করে এই নাম গ্রহণ করতেও পারেন। আপনার সমালোচনা ও উপদেশাবলী কিন্তু সত্যই অমূল্য।

তরুণী প্রখর চোখে তিমিরের দিকে তাকাইল: ঠাট্টা কর্‌ছেন?

তিমির মৃদু হাসিল: দরিদ্র ভিকিরীর সে শক্তি কোথায়?

তরুণীর উদ্ধত ফণা নত হইল, কহিল: জানি আপনি বড় লোক।

: এ কথা শুনে সুখী হলাম না তৃষ্ণা দেবী, কেননা এ বিশেষণে আমার শ্রদ্ধা নেই। এ নাম যখনই কানে শুনি তখনই আমার সমস্ত ঐশ্বর্য্য অপমানে কেঁদে ওঠে, ভাবি এ একটা অনপনেয় কলঙ্ক। এ নামের সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে আছে হীন চিত্ত, ক্ষুদ্র মন, হিংসার গ্লানি, শোষণের কলুষ, নির্দয় বক্ষ, কুটিল চক্ষু, উদ্যত দণ্ড। এ বিশেষণে আমার লালসা নেই। একে এড়াতে না পারলে আমার ঐশ্বর্য্যের মর্য্যাদা আমি খুঁজে পাইনা।

একটু থামিয়া তিমির আবার বলিল: এদেশে লক্ষপতির অভাব নেই। অভাব আছে প্রসারিত বক্ষের। ধনবান আছে রাশি রাশি, কিন্তু হৃদয়বান কই? ঐশ্বর্য্যের কারাগারে ব'সে দৃষ্টিহীন হ'য়েছে তাদের চক্ষু, শীর্ণ হ'য়েছে তাদের মন। ঐশ্বর্য্যের বিস্তৃতি বাড়িয়েছে তাদের লোভ, বাড়িয়েছে তাদের শোষণের অদ্ভুত ক্ষমতা। মানুষ জাত আর সভ্যতার মেরুদণ্ড যে যাচ্ছে ধ্বসে, সেদিকে তাদের দৃষ্টি কোথায়? যাদের কাঁধে ভর দিয়ে এরা উঠেছে দাঁড়িয়ে, তারা পৃথিবী থেকে ধুয়ে মুছে আজ নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেলেও এদের কোন ক্ষতি নেই। ভাগ্যহীনের কাতর ক্রন্দন আর বুভুক্ষুর আর্ত্তনাদ এদের স্ফুর্ত্তির কোলাহলে ডুবে যায়। মুঠো মুঠো টাকা যাদের কাছে কিছু না, কাঙালের হাতে একটা পয়সা তুলে দেবার বেলা কী তাদের অদ্ভুত কৃপণতা! প্রাচুর্য্যের ফেনা ওদিকে ড্রেন দিয়ে বেরিয়ে যায়, এদিকে একটা পয়সার উপর তাদের কী অপার মমতা! এরাই দেশের বড় লোক! যাদের আছে তাদের দ্বার হ'তেও যদি ভাগ্যহীনের দল ম্লানমুখে ফিরে যায়, তাহলে যাদের নেই, তাদের সঙ্গে এদের তফাৎ কোথায়? একটী পয়সার জন্যে রিক্তের আর ঐশ্বর্য্যবানের যদি একই মর্ম্মবেদনা, তাহলে বড়লোকত্ব কোথায় এদের? আমি জানি বড়লোক তারাই, যাদের ঐশ্বর্য্য আছে শুধু ধনাগারে নয়, অন্তরেও, যাদের বিত্তের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে বিস্তৃত হ'য়েছে চিত্ত। নীচতা হীনতার গ্লানিতে নর্দমা হ'য়ে ওঠেনি যাদের মন। আমি বড়লোক বলি তাদেরই, যারা মানুষের মর্য্যাদা রাখতে জানে, যারা মনুষ্যত্বকে অপমানিত করতে দেখে

নিজেরা অপমান বোধ করে, যাদের ঐশ্বর্য্যের ক্ষয় শুধু ভোগে নয়, ত্যাগেও। তারাই বড়লোক…তাদের এ নাম সম্মানের ও গৌরবের। আজ দেশে বড়লোক বল্‌তে মনে হয় দরিদ্রের শত্রু, ভাগ্যহীনের ভয়, শক্তিহীনের যাঁতা। এ নামে পরিচিত হ'তে আমার ইচ্ছা নেই। আপনার সমালোচনা শুন্‌তে আমার ক্লান্তি নেই, কিন্তু বলে রাখি, আমি বড়লোকও নই, আমি দরিদ্রও নই। আমি আপনার কাছে ক্ষণিকের অতিথি মাত্র।

তিমির চুপ করিল। তৃষ্ণা নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। রাত্রি বাড়িতেছিল। আর কেহ কোন কথা বলিল না। দুই হাতের ভিতর মাথা রাখিয়া তিমির আস্তে আস্তে চক্ষু বুজাইল। তৃষ্ণা আরো কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ভোরবেলা তৃষ্ণা ঘরে আসিয়া দেখিল অতিথি নাই।

তিন

সত্যই সে একটা লম্বা নিরুদ্দেশের জন্য বাড়ী হইতে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল। এতশীঘ্র তাহার বাড়ী ফিরিবার কথা নয়, সে ইচ্ছাও তাহার ছিল না। কিন্তু এখন তা ছাড়া আর উপায় কী? বাড়ী গিয়া বাবার সহিত দেখা করিয়া পকেট ভরিয়া লইয়া আবার সে না হয় বাহির হইবে, কিন্তু এখন ফিরিবার পথ ধরা ছাড়া আর উপায় নাই।

টিকিট কাটাইবার হাঙ্গামা নাই! কেননা সে পাথেয়হীন। তৃষ্ণার কাছ হইতে হয়ত এটাও মিলিতে পারিত। অন্ন বস্ত্র সে দিয়াছিল, দক্ষিণাটাও দিতে সে কুণ্ঠিত হইত না নিশ্চয়ই। কিন্তু থাক্, আর প্রয়োজন নাই। নিজেকে সে গুছাইয়া লইতে পারিবে।

গাড়ীতে উঠিবার জন্য আস্তে আস্তে সে একটা কাম্‌রার সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইল।

ঃ বিনা টিকিটে গাড়ী চ'ড়তে হ'লে ভালো জামা কাপড় প'রে হয় না।

তিমির ফিরিয়া দেখিল, পিছনে তৃষ্ণা ঃ একী! আপনিও যাবেন নাকী?

ঃ না, আপনাকে বেশ দুকথা শুনিয়ে দিতে এলাম। সামান্য ভদ্রতাটুকুও জানেন না। আসবার সময় যার বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাকে একটা কথা জানিয়ে আসবারও দরকার মনে করলেন না।

ঃ এ অন্যায়টা বাড়ীতে গিয়ে শোধ্‌রাবো ভাব্‌ছিলাম, একটা জরুরী টেলিগ্রাম করে।

ঃ ভোরে উঠে যখন দেখ্‌লাম, আপনি ঘরে নেই, তখন আমার ব্রহ্মতালু জ্বল্‌ছে। ভাব্‌লাম যেমন করেই হোক্ গাড়ী ছাড়বার আগে ষ্টেশনে ত -হ হবে এবং ধ'রে গায়ের জামাখানা অন্ততঃ কেড়ে নিতে হবে দিয়েছিলাম তা তো হজম হ'য়ে গেছে। অকৃতজ্ঞের শাস্তি।

: তা হ'লে আমার বড় উপকার হোতো কিন্তু। আর গেঞ্জীখানা খুলে নিয়ে এবং একটা ছেঁড়া ন্যাক্‌ড়া দিয়ে কাপড় খানা নিয়ে গেষ্ট চার্জ্জটা আদায় করে নিলে তো কথাই ছিলো না। এ সমস্তই আমার বিনা টিকিটে যাওয়ার পথ একেবারে মসৃণ ক'রে দিত।

তাহা হইলে তিমিরের বেশটা কী রকম হইত তাহার ছবি মনে মনে কল্পনা করিয়া তৃষ্ণা হাসিয়া ফেলিল। পরক্ষণেই রুক্ষস্বরে বলিল: যারা না জানিয়ে ঘরে ঢুকে তারা চোর, যারা না জানিয়ে বেরিয়ে আসে তারা অকৃতজ্ঞ, দুই দলের প্রতি আমার সমান ঘৃণা।

: আমি দুই রকমই। প্রথমটার প্রমাণ, বিনা টিকিটে গাড়ী চড়্‌বো, আর দ্বিতীয়টার প্রমাণ তো আপনার কাছেই।

: সেটা বুক ফুলিয়ে জাহির করায় কৃতিত্ব আছে কী?

: মানে, আপনাকে জানিয়ে দিলাম আমি স্কোয়ার, কোনদিকে আমি খাটো নই: বলিয়া তিমির হাসিয়া উঠিল, তারপর বলিল: কিন্তু আপনাকে দেখে আমি ভেবেছিলাম, আমাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছেন।

তৃষ্ণা দৃঢ়স্বরে বলিল: ফিরিয়ে নিতে আস্‌ব কোন্ দুঃখে? এমন জান্‌লে আপনাকে আশ্রয়ই দিতুম না।

: তা হ'লে হয়তো সত্যিই কষ্টে প'ড়তাম্: তারপর এদিক ওদিক তাকাইয়া বলিল: কিন্তু আর তো দেরী করা চলে না, ঘণ্টা হোলো ব'লে—ঠিকানাটা দিয়ে যাবো কী? যদি কোনো গালাগাল বাকী থাকে লিখে জানাবেন।

ঠং ঠং করিয়া ঘণ্টা পড়িল। মূহুর্ত্তে তৃষ্ণার মুখ হইতে সমস্ত কঠিন রেখা মিলাইয়া গেল। ডান হাত তুলিয়া সহজ কণ্ঠে সে বলিল: এই নিন্, রাখুন টিকিটটা।

বিনা দ্বিধায় তিমির হাত বাড়াইয়া টিকিটটা গ্রহণ করিল। করিয়া বলিল: নিতে লজ্জা পেলাম না, তাই ভাব্‌ছেন, না? আমি কিন্তু ভাব্‌ছি,

গাড়ীতে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে যাহোক্ আরামে যাওয়া যাবে! আপনার ঋ আমার মনে থাকবে।

তৃষ্ণা সে কথা কাণে নিল না, বলিল: যে সব অন্যায় কথা বলেছি, তার জন্যে আজ আর ক্ষমা চাইবো না।

গাড়ীতে টান পড়িয়াছে। তিমির তাড়াতাড়ি লাফাইয়া উঠিয়া বলিল: নমস্কার, জামাখানা পার্শেলে এবং গেষ্ট চার্জ্জ আর টিকিটের দামটা শীঘ্রই মণিঅর্ডারে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

তৃষ্ণা প্রতিনমস্কার করিল না, মুখ বাড়াইয়া বলিল: ঠিক মনে থাকে যেনো, সে জন্যে আমার ঘুম হবে না।

গাড়ী প্লাটফর্ম ছাড়িয়া আসিল। তিমির টিকিটটা পকেটে পুরিয়া একটা সিটে চাপিয়া বসিল। এই মেয়েটী যখন পুরীতে টিকিটঘরের সম্মুখে যাত্রীর জনতা দেখিয়া নিরুপায় হইয়া অসুস্থ পিতার সহিত এককোণে চুপটি করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল তখন তিমির তাহাকে টিকিট কাটিয়া দিয়া সাহায্য করিয়াছিল। শুধু তাই নয়, একটী গাড়ীতে পুরা তিনঘণ্টা ধরিয়া সে তাহাদের সহিত আলাপ আলোচনা ও গল্প করিয়া কাটাইয়াছিল। তখন সে ইহাকে এমনই দেখিয়াছিল। এমনি সহজ ও দ্বিধাহীন ... তাহা ছাড়াও আজ সে ইহাকে দেখিল স্পষ্ট ও প্রখর, স্বচ্ছ ও বেগবতী। কাল সন্ধ্যা হইতে বহুক্ষণ সে ইহার সাহচর্য্যে কাটাইয়াছে এবং চোখ বুজাইয়া তাহার শানিত সমালোচনা শুনিয়াছে। কিন্তু তাহার কঠিন সুরের ভিতর অলক্ষ্যে ঝরিয়াছে যে কোমলতা, সিক্ত নম্রতা তিমিরের তাহা চক্ষু এড়ায় নাই। তিমির দেখিয়াছে উহার উপেক্ষার ভিতর মমতা, অবহেলায় বিনম্র শ্রদ্ধা।

আজ এমন করিয়া বাড়ী ফিরিয়া যাওয়াটা নিজেরই তাহার পছন্দ হইতেছিল না। কিন্তু বিনা সম্বলে দীর্ঘ দিনের জন্য উধাও হইয়া যাওয়া কম্বল না লইলে চলে না। আজ সে দরিদ্র। গায়ের জামাখানা পর্য্যন্ত তাহার নিজের নয়। তৃষ্ণা এদানের অর্থ বুঝিতে পারে নাই।

শুভদিনের লগ্ন তাহার কেবলই পিছাইয়া যাইতেছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ সে এখনো সুরু করিতে পারিল না। কিন্তু আর সে কোনক্রমেই দেরী করিবে না। বাড়ী হইতে এইবার যে পকেট ভরিয়া লইয়া সে বাহির হইবে, তাহার বিপুল রচনা সুরু করিয়া তবে সে নিঃশ্বাস ফেলিবে। সমাপ্তির কথা মনেই আসে না। সুরু করিলে তবে শেষ। এখন শুধু আগাইয়া যাওয়া। শেষের দিকে তাকাইবার সময় নাই। বেশী আর সে খুঁজিয়া বেড়াইবে না। মন্দ কী, দুপাশের ঐ বিস্তৃত ভূখণ্ডগুলিই না হয় সে কিনিয়া লইবে। দাম চড়া হইলেও ক্ষতি নাই। না হয় সে অর্থ ঢালিয়াই দিবে। এ দিকটা হইবে সারিবাঁধা বাসস্থান, ওদিকটা প্রয়োজনীয় আর আর ঘরগুলি, ওদিকে বিরাট একটা পুষ্করিণী, কূয়া আর টিউবওয়েল এবং আর আর প্রয়োজনীয় যা কিছু। গাছ লাগাইয়া লাগাইয়া জায়গাটাকে সে ছায়াচ্ছন্ন করিয়া রাখিবে। এবং আর আর সে কী করিবে এই চঞ্চল মুহূর্ত্তে তাহা ভাবিবার নয়। তবে আর কিছু দিন পরেই এই নির্জ্জন বন্য মাটির বক্ষ মানুষের সার্থক পদশব্দে পুলকিত হইয়া উঠিবে। জানালায় ভিড় করিয়া বিস্মিত নেত্রে তাকাইয়া থাকিবে ট্রেনের যাত্রীরা, ঘর ঝাটাইয়া আসিবে চুংকিং বার্ম্মা, জাপান, সাগরপারে স্তম্ভিত হইয়া থাকিবে রাশিয়া, নিউইয়র্ক, লণ্ডন। তাহারা দেখিবে, এখানে দলে দলে ঢুকিতেছে ম্লান মুক হীনজ্যোতি ক্ষয়িষ্ণু প্রাণ, বাহির হইয়া যাইতেছে জ্যোতিষ্মান অটুট আত্মনির্ভর মানুষ।

তিমিরের রক্ত ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল—তাহার বিপুল অর্থ কী এক মহাকর্ম্মে আত্মসমর্পন করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে। আর তাহারই অর্থের ভিতর সার্থকতা খুঁজিতেছে অগণিত অবহেলিত পাণ্ডুর জীবন।

ট্রেন যেন মন্থর—অতি মন্থর গমনে চলিয়াছে—শামুকের গতি। অসহ্য। খানিকটা আগে আজই বাড়ী ফিরিয়া যাওয়াটা সে পছন্দ করিতেছিল না, কিন্তু এখন ভাবিল শুধু আজই নয়, এখনি ফিরিতে না পারিলে কোথায় যেন তাহার একটা বিরাট অধঃপতন ঘটিয়া যাইবে।

তারপর বাড়ীতে।

দোতলায় পা দিয়াই তিমির ডাক দিল : ঝি ঝি···জগা, জগা....

জগা আসিয়া দাঁড়াইল। তিমির বলিল : সরকার কাকা কোথায় ?

: ওদিকে আছেন তিনি। মিস্ত্রীদের কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

: মিস্ত্রী ?

: হ্যাঁ, তিনজন মিস্ত্রী কাজ করছে, বারান্দার ওদিকে দেওয়াল দেওয়া হ'চ্ছে।

তিমির একটু ভাবিল। তারপর বলিল : তাকে একবার জল্‌দি এখানে পাঠিয়ে দে।

জগা চলিয়া গেল। মেনকা ঝি কর্ত্তব্যপরায়ণা। এককাপ চা লইয়া সে তিমিরের সম্মুখে হাজির হইল।

: আজই ফিরে এলে যে ? শুনেছিলাম নাকি কিছুদিন ফির্‌বে না ?

: হ্যাঁ এবার গেলে আর বেশ কিছুদিন ফির্‌বো না : বলিয়া তিমির চায়ের কাপটা হাতে লইল। তারপর সরকার মশায়কে দেখিতে পাইয়া বলিল : এই যে সরকার কাকা, শুনুন, আপনার জরুরী কাজ আছে : চায়ে চুমুক দিয়া বলিল : লম্বা কিছু দিনের জন্য বেরিয়ে যাবো বাড়ী থেকে। এই ছমাস কী বছর খানেক। জিনিষপত্র কিছু কিছু অভাব পড়বে। ফর্দ করে দিচ্ছি। শীঘ্রি একবার বাজারে চলে যান। বড় দেখে একটা স্যুট্‌কেশও আন্‌বেন ঐ সঙ্গে, তিনহাত কী একান্ন ইঞ্চি। ছোট স্যুটকেশে জিনিষপত্র সব ধর্‌বে না। বাবাকে বলে ক্যাস থেকে টাকা নিয়ে জল্‌দি চলে যান। আমার গাড়ীখানাই নিয়ে যান্ না হয়। যাবেন আর আসবেন। দুটোর আগে নিশ্চয়ই এসে পৌছবেন।

: কিন্তু এখনি কী যাওয়া যাবে ?

: কেন যাওয়া যাবে না, যেতেই হবে····না গেলে চল্‌বে কী করে ? কী এমন কাজ ?

: সরকার মশাই, এদিকে আসুন : আড়াল হইতে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে নোতুন-মা ডাক্ দিলেন।

: এই যে যাই : বলিয়া সরকার মশায় ত্রস্তপদে তিমিরের দিকে দুইপা আগাইয়া গেলেন : আচ্ছা দেখ্‌ছি, ব্যবস্থা কর্‌ছি আমি : বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

তিমির চেঁচাইয়া বলিল : এক্ষুনি চলে যান, মনে থাকে যেনো দুটোর আগে ফির্‌তে হবে—ঝি, আমার খাওয়ার জোগাড় দেখো, সকাল থেকে কিছুই খাওয়া হয়নি—একেবারে ভাতই নিয়ে এসো, বেশী সময় নেই হাতে—জগা, বাথ্‌রুমে জল আছে ?

জগার উত্তর পাওয়া গেল না। সে তখন ওদিকে যাইয়া নোতুন মার কথার জবাবদিহি করিতেছিল।

নোতুন-মা বলিতেছিলেন : জিনিষপত্র সব বার করা হ'য়েছে জগা ?

জগা বলিল : না মা, যাচ্ছিলাম বার কর্‌তে, দাদাবাবু এসে পড়্‌লেন।

: তাতেই একেবারে আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে প'ড়্‌ল, ভাব্‌লে আর কাজ কর্‌তে হবে না।

: না, মা যাচ্ছি,

নোতুন-মা ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন : যাচ্ছি, হারামজাদা ম'রে গেলে যাবে, এমন কর্‌লে চাক্‌রী থাকে না মনে থাকে যেন।

ওদিকে তিমির ঘরে ঢুকিয়া অবিশ্রাম চীৎকার করিতেছিল : এ কী রে উল্‌ফ, আমার ঘরের জিনিষপত্র এ কী হ'য়েছে। সব পোট্‌লাবাঁধা কেনো ? আমার জিনিষে কার দরকার প'ড়্‌লো। রেডিওর কানেক্‌সন্ কোথায় ? ড্রেসিং টেবিলের কাচটা খোলা হ'য়েছে দেখ্‌ছি···দেয়ালের ছবিগুলিও সব নামানো হ'য়েছে···মার ছবিখানাও নেমেছে দেখ্‌ছি। বাল্‌বটা গেলো কোথায় ? ....ঐ জগা ?....কার ঘাড়ে মামদো চাপ্‌লো ?

ঃ সব নীচে যাবে, দাদাবাবু ঃ ঘরে ঢুকিয়া জগা ছবিগুলা একসা বাঁধিতে লাগিল।

ঃ নীচে যাবে মানে! এখানে পোকায় কাট্‌ছিলো না কী?

ঃ ঘর চুনকাম হবে, কিছুদিন নিচের ঘরে থাকতে হবে আপনাকে।

ঃ চুনকাম! এই সেদিন হ'য়ে গেলো, আবার চুনকাম!

ঃ হ্যাঁ চুনকাম। বাড়ীর ভিতর এত নোংরামি আমি সইতে পারিনে ঃ বাহিরে নোতুন-মা আসিয়া দাঁড়াইলেন।

ঃ নোংরামি! তার মানে?

ঃ তার মানে নোংরামি, এর আর কোন দ্বিতীয় মানে হয় না।

ঃ কিন্তু বাড়ির মধ্যে এই ঘরটাই তো ছিলো সবচেয়ে পরিষ্কার।

ঃ আরো পরিষ্কার করার দরকার, তা না হলে আমি হাঁফিয়ে উঠি, জগা হাত চালিয়ে নে, দেরী না হয় ঃ বলিয়া নোতুন-মা যাইবার জন্য পা বাড়াইলেন।

তিমির ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল ঃ তা, আমাকে নিচে গিয়ে থাকৃতে হবে তার মানে? চুনকাম তো অনেকবারই হ'য়েছে, কোনদিন তো আমাকে অন্ধকূপে ঢুক্‌তে হয়নি?

ঃ কোনদিন হয়নি, আজ হবে, আর সব কথার মানে বুঝিয়ে দেবার জন্যে মাইনে-করা গুরু তোমার কেউ এখানে নেই ঃ বলিয়া নোতুন-মা নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিলেন।

তিমির খানিক দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর চীৎকার করিয়া বলিল ঃ কেন, এলাইনের ঘরগুলোও তো খালি প'ড়ে রয়েছে, আমায় নিচে না নামালে কী চুনকাম করা হোতো না?

ঃ ওগুলো খালিই থাকৃবে, সমস্ত ঘর মালখানা হবে, এ আমি সইতে পারিনে।

তিমির কথাগুলো হয়ত কানেই নিল না, বলিল : বাড়ীতে কেনই বা এখন মিস্ত্রী লেগেছে, কোথায় কী এতো ভেঙে প'ড়ে যাচ্ছিলো, ওদিকেই বা কী হ'চ্ছে ওগুলো, কীসেরই বা এত দেওয়াল, কীসেরই বা এত পার্টিশন? বলিয়া তিমির বারান্দা পার হইয়া ওদিকে আগাইয়া গেল।

ঘর হইতে বাহির হইয়া নোতুন-মা তাড়াতাড়ি তিমিরের সাম্‌নে দাঁড়াইয়া পথ আটকাইলেন : খবরদার ওদিকে যেওনা, ওদিকে আমি নোতুন ঠাকুর ঘর বসিয়েছি, তোমার জন্যে আমি বাড়ীর সব জায়গার শুচিতা নষ্ট হ'তে দিতে পারি না।

তিমির অবাক্ হইয়া নোতুন-মার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। এই সংমার কাছ হইতে সে বহুদিন বহু আঘাত পাইয়াছে। কিন্তু আজ যেন চূড়ান্ত বলিয়া মনে হইল। মনে হইল, আজ শুধু আঘাত নয়, তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিবার জন্য যেন নোতুন-মা প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন। সে দুই পা পিছাইয়া আসিয়া রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইল, বলিল : জানি তুমি সংমা, সেজন্যে গোড়া থেকে অসদ্ব্যবহারের জন্যেই প্রস্তুত হ'য়ে ছিলাম, কিন্তু আজ মাত্রাটা ছাড়িয়ে যাচ্ছে নাকী?

: তোমার কাছ থেকে জ্ঞান শিক্ষা নেবার জন্যে আমি এবাড়ীতে ঢুকিনি মনে থাকে যেনো। মাত্রা যদি ছাড়িয়ে যায় তো গেছে, কিন্তু নিচের ঘরে থাক্‌তে তোমার কেন এত ওজর? মানে বাধে, না নবাবীতে বাধে?

: মানে এবং নবাবীতে যদি বাধে তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই, না বাধলেই বরং আশ্চর্য্য হবার কিছু থাক্‌তো।

নোতুন-মার চোখ দিয়া হঠাৎ আগুনের ফুল্‌কি বাহির হইয়া আসিল : কেন, কীসের এত নবাবী? কীসের এত মান? এত খয়রাংইবা কেন? কার ধনে এত পোদ্দারী?

উপর্য্যুপরি কথার খরশরে তিমির হিম্‌সিম্ খাইয়া উঠিতেছিল। এবার সে কঠিন হইয়া উঠিল; বলিল : মা, প্রত্যেক অভদ্র কথা উচ্চারণ করবার

আগে মনে থাকে যেনো আমি তোমার সন্তান না হ'লেও, আমি এ বাড়ীর প্রথম সন্তান এবং একমাত্র সন্তান। বাবা চোখ বুজোবার পরই সমস্ত ঐশ্বর্য্য উড়ে এসে পড়বে তোমার হাতে নয়, আমার হাতে। তখন তুমি হবে আমার আশ্রিতা মাত্র। তোমার যদি কোন সন্তানও হয়, সে আমায় অর্দ্ধাংশ থেকে বঞ্চিত করবে, কিন্তু হিংসার গর্জ্জনে বাড়ী কলুষিত করবে না। তোমার এ ইতর প্রবৃত্তিতে নিরুপায় হ'য়ে আজ যদি আমি আমার ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করি, বলে রাখি, মনে যেনো দুঃখ কোরো না।

নোতুন-মা হঠাৎ খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, তারপর তীক্ষ্নকণ্ঠে বলিলেন : ক্ষমতা ? কীসের ? কার ? কতটুকু ?

নারী এমন করিয়া হাসিতে পারে তাহা তিমিরের ধারণা ছিল না। সে একবার চম্‌কাইয়া উঠিল, তারপর দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল : হ্যাঁ, ক্ষমতা আমার, ক্ষমতা পবিত্র বাবুর সন্তানের, ক্ষমতা আমার মাংসপেশীর নয়—উত্তরাধিকারের : বলিয়া ব্যস্ত হইয়া নিজের ঘরের দিকে যাইবার জন্য সে পা বাড়াইল।

নোতুন-মা এবার আর তাহার সাম্‌নে আসিয়া পথ আটকাইলেন না। শুধু চোখ মুখ কুঁচ্‌কাইয়া তাহার পৃষ্ঠদেশে একটা চূড়ন্ত বান নিক্ষেপ করিলেন : কে তুমি ? কোথায় ছিলে ? কীসের এত বড়াই ? যার জন্মের ঠিক নেই তার আবার ক্ষমতা, তার আবার অধিকার।

বিদ্যুদ্বেগে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া তিমির বজ্রকণ্ঠে সমস্ত বাড়ী কাঁপাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল : মা—।

তৎক্ষণাৎ শূন্য হইতে আওয়াজ আসিল : তিমির !

মাথা তুলিয়া তিমির দেখিল, তিনতলার বারান্দায় দাঁড়াইয়া পবিত্রবাবু স্থির নেত্রে তাহারই পানে চাহিয়া আছেন। দৃষ্টিতে কী ও ? ক্রোধ, শাসন, স্নেহ না অনুরোধ ? দৃষ্টি নামাইয়া লইয়া তিমির আস্তে আস্তে নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল।

জগা ঘরে নাই। পোঁট্‌লা নিচে নামাইয়া লইয়া গিয়া সে হয়ত তিমিরের ঘর গুছাইতেছে। নোতুন-মার দৃষ্টির সম্মুখ হইতে সরিয়া আসিয়াও তিমির স্বস্তি পাইল না। অস্থির হইয়া সে এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এতক্ষণ সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নোতুন-মার বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। এখন সে নিজের প্রশ্নের সহস্র খরশরে নিজেই মনে মনে রক্তাক্ত হইতে লাগিল।

নোতুন-মার হিংসার উদ্গারের মাঝে এ কীসের ইঙ্গিত? তাহার ধমনীর ভিতর যে প্রবাহ, সুরু তাহার কোথায়? এই বক্ষস্পন্দনের ঋণ কাহার কাছে? সে কী এখানে অহেতুক? তাহার জীবন-সমুদ্রে এটা কী একটা করুণার ভেলা মাত্র? না তাহার গর্ভধারিণী—ঃ সর্ব্বাঙ্গ তাহার কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল ক্রোধে আর অপমানে। আজ চাই, সর্ব্বাগ্রে চাই তার নিজের পরিচয় নূতন করিয়া চাই তার ঠিকুজী আর ঠিকানা, আজই এই মূহর্ত্তে। নিজের কাছে নিজেকে সে অপরিচিত রাখিবে না। নিজেকে সে আজ নূতন করিয়া বুঝিবে এবং চিনিবে। না পারিলে ঐ বজ্রমুষ্টিতে নিজের ললাট-ফলক সে চৌচির করিয়া ফেলিবে।

ক্ষিপ্রপদে সে দেয়ালের প্রকাণ্ড আয়নাটার সাম্‌নে গিয়া দাঁড়াইল। ভিতরে পড়িল সেই চিরদিনকার ছায়া, এ বাড়ীর একমাত্র সন্তান—পবিত্রবাবু যাহার পিতা, সাবিত্রী দেবী যাহার মা। কাচের খণ্ড ইহার বেশী কিছু তাহাকে দেখাইল না।

তারপর আসিয়া সে মার ছবিখানা টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিল। চোখের সাম্‌নে তুলিয়া ধরিয়া মর্ম্মভেদী দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল মার মুখের দিকে। কিন্তু ঐ ত মমতাময়ী, স্নেহক্ষুধাতুরা মা, ঐ ত সেই চিরপরিচিত স্নেহ-সিঞ্চিত দৃষ্টি—ছেদহীন, ছলনাহীন, অজস্র। ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ কোথায়?

ছবিখানা ফেলিয়া রাখিয়া দ্রুতপদে তিমির সিঁড়ি বাহিয়া উঠিয়া গেল তিনতলায়।

ঘরের ভিতর কী একটা কাগজে পবিত্রবাবু চক্ষু নিবিষ্ট করিয়া বসিয়া আছেন, মুখ না তুলিয়াই বলিলেন : দাঁড়িয়ে থেকোনা, বোসে।

তিমির স্তব্ধ হইয়া তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

: ফিরেছো কখন ? এত শীঘ্রি তোমার ফেরার তো কথা ছিলো না ?

তিমির নির্ব্বাক হইয়া তাঁহার মুখমণ্ডলে নিজের প্রশ্নের জবাব খুঁজিতেছিল।

পবিত্রবাবু মুখ তুলিয়া তাকাইলেন : টাকা ফুরিয়ে গেছে বুঝি ?

তিমির শুষ্ককণ্ঠে কহিল : আমার পরিচয় ফুরিয়ে গেছে।

পবিত্রবাবু সে কথা কানে লইলেন না, কহিলেন : এত কম টাকা নিয়ে বেরোনো তোমার উচিত হয় নি, ভবিষ্যতের দিকে তোমার নজর একটুও নেই।

: ভবিষ্যতের দিকে নজর দেবার আগে আমার অতীতকে আমি চাই, আমি কে ?

: এবার আর ছোটখাট দূরে যেওনা, তিমির, বেশ কিছু মুঠোর ভিতর নিয়ে একটা দীর্ঘ পথের পাড়ি ধরো, ধরো নিউইয়র্ক কিংবা রাশিয়া, সেখানের গরীবরা কেমন দিন কাটাচ্ছে দেখে এসো, দরকার হ'লে আমাকেও সঙ্গে নিতে পারো।

: এমন ক'রে দূরে দূরে সরিয়ে আমার সত্যকে আর আড়াল করতে চাইবেন না, আমি দূরে যাবার আগে নিজের কাছে নিজেকে স্পষ্ট করে নিতে চাই। তাতে দূর যদি সীমা-সঙ্কেতহীন হ'য়ে ওঠে উঠুক, আমি বিচলিত নই। আমি জানতে চাই আমার মার পরিচয়, আমার বাবার পরিচয়।

পবিত্রবাবু সযত্নে কাগজটা ভাঁজ করিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন, তারপর বলিলেন : তোমার স্নান খাওয়া এখনো কিছুই হয়নি নিশ্চয়, আমারো তাই, চলো আজ একসঙ্গে আরামে খাওয়া যাবে, অনেকদিন একপাতে খাওয়া হয়নি : পবিত্রবাবু চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

তিমির উত্যক্ত হইয়া উঠিল : আমার পেটের ক্ষুধার চেয়ে প্রশ্নের ক্ষুধা অনেক বেশী, তাড়াতাড়ি আমার প্রশ্নের জবাব দিন।

: সে হবে বৈকি এক সময়ে, তার জন্যে মাথা ঘামিয়ো না, একটা ভাল অবসর দেখে বসা যাবে পরে, চলো চলো : তিমিরের বাহু ধরিয়া পবিত্রবাবু টান দিলেন।

তিমির শক্ত হইয়া চেয়ারে বসিয়া রহিল, দৃঢ়স্বরে বলিল : না আমি যাবো না। আমার রক্তের খেই আমি আগে পেতে চাই, তার জন্যে শুভ লগ্নের প্রয়োজন নেই। চারপাশে আমার সমুদ্র—একটা তীর আমি ছুঁতে চাই। ধৈর্য্য হারিয়ে ফেল্‌ছি আমি, বলুন, মাথা আমার সত্যিই ঘামিয়ে উঠ্‌ছে।

তিমিরের চোখের দিকে চাহিয়া পবিত্রবাবু স্তব্ধ হইয়া গেলেন। একটা সোফায় গা ডুবাইয়া বসিয়া তিনি আস্তে আস্তে চোখ বুজাইলেন। তারপর একসময়ে চোখ খুলিয়া শান্ত-স্বরে বলিলেন : জানি, এ একদিন না হ'য়ে যায় না, সে জন্যে আমিও আজ প্রস্তুত হ'য়ে উঠেছি, আমার সমস্ত অন্তর, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, স্নায়ু শিরা আজ প্রস্তুত হ'য়ে উঠেছে। আমি অনেক কষ্টে অনেক দুঃখে অনেক যত্নে নিজেকে প্রস্তুত করেছি।

একটু থামিয়া পবিত্রবাবু আবার বলিলেন : হ্যাঁ জান্‌বার অনেক কিছুই আছে, আর শোন্‌বারও আছে অনেক কিছুই। আজ সবই তোমাকে জানাবো আর শোনাবো। সাগরে ভেসে আছো তুমি, একটা তীর তোমায় আমি ছুঁইয়ে দোবো। তোমার নোতুন-মা তোমায় নোতুনের সন্ধান দিয়েছেন, আমার সাধ্য কী আর তোমায় পুরাতনের ভিতর লুকিয়ে রাখি! তবে ইচ্ছা ছিলো, এমন উত্তেজনার মুহূর্ত্তে তোমায় কিছু জানাবো না, জানাবো গভীর রাত্রে নিভৃতে, আরো কাছে তোমায় বসিয়ে, যাতে আঘাতে তুমি ভীষণ হ'য়ে উঠ্‌তে না পারো। তবে জানি গুরুতর কিছু ক'রে বস্‌বার মত দুর্ব্বল তুমি নও, কেননা তুমি আমার হাতে মানুষ।

খানিক নিষ্পলক দৃষ্টিতে তিমিরের মুখের পানে তাকাইয়া থাকিয়া তি- বলিলেন : তিমির মানে অন্ধকার—যেখানে রশ্মি নেই, আলো নেই। তুমি অন্ধকার, তোমার দশদিক নিরালোক। তোমার বাবা তোমার সার্থক নাম রেখেছিলেন।

তিমির বলিয়া উঠিল : আপনি আমার বাবা নন্?

: এখুনি বাধা দিও না, শুধু নিঃশব্দে শুনে যাও। যখন অসহ্য হবে তখন চীৎকার ক'রে উঠো। তখন জীবন আমার কর্ম্মময়। থাকি উত্তর কোল্‌কাতার বাড়ীতে। নাচে ছিলো আমার বসবার ঘর। কাগজ পত্র আর রাশি রাশি বইএর গাদায় ঠাসা। খাওয়া-দাওয়া সেরে গভীর রাত্রি অবধি নীচের ঘরে বসে আমি এদের মধ্যে ডুবে থাকতাম। বাড়ী নিশ্চুপ হ'য়ে যেতো, রাস্তার কোলাহল থেমে যেতো, তবু আমার নেশা ভাঙতো না। যত রাত্রি গভীর হোতো তত আমি যেন এদের নিয়ে পাগল হয়ে উঠতাম। সমস্ত দিনের বিপুল কর্ম্মস্রোতের ঘূর্ণীপাকের পর রাত্রির এ অবসরটুকু সত্যই মনে হোতো বিশ্রামের। চোখে আমার ঘুম ছিলো কম, আমি নির্জ্জনে এদের সাহচর্য্যে ব'সে ব'সে আনন্দ উপভোগ করতাম। তিমির, এমনি এক রাত্রিতে—না, অমন করে নিঃশ্বাস রুদ্ধ ক'রে থেকো না তিমির, সহজ পরিপূর্ণ ভাবে বায়ু চলা ফেরা করুক। আজ সবই অনর্গল, কিছু রুদ্ধ কোরো না, বরং চাও তো আমার আরো কাছে সরে এসো : তিনি বলিয়া চলিলেন : রাত্রি তখন দুটো। বাড়ীর ভিতর ঘুমে কাতর সবাই। পথ নির্জ্জন, আকাশ স্তব্ধ, ড্রাইডেনের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে হঠাৎ কানে এসে বিঁধলো তীক্ষ্ণ স্বর—যেন আর্ত্ত শকুন শিশু, মা হারিয়ে চ্যাচাচ্ছে অজস্র। কান পেতে রইলাম—: ট্যাঁ ট্যাঁ : থেকে থেকে ঝলকে ঝলকে শানাইএর কাটা কাটা সুরের মতন—দুর্ব্বল অসহায় চীৎকার। কোথায়! পাশের বাড়ীতে? কেটে গেলো পাঁচমিনিট দশমিনিট, তারপর পনেরো, কুড়ি, পঁচিশ। একী! থাম্‌ছেনা যে ও! কেউ কী থামাবে না ওকে? একটু স্তন্য, কী ঘুম-পাড়ানি গান একটু? জাগেনি নাকী কেউ! বই

ফেলে উঠে দাঁড়ালাম, টর্চ হাতে বেরিয়ে গেলাম বাইরে। গিয়েই বুঝলাম, কান্না পাশের বাড়ীতে নয়, রাস্তার ওপারে। কিন্তু মুখ ফেরাতেই মনে হোলো না ওপারে নয়, এ পারেই। ডানদিকে গলির সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়ালাম, কান্না আড়াল হয়ে গেলো, মনে হলো আস্‌ছে যেনো মাটীর তলা থেকে। ফিরে আস্তে আস্তে বাঁদিকের গলির মুখে গিয়ে দাঁড়ালাম, চীৎকার স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌লো, বুঝলাম এই সঙ্কীর্ণ গলিরই নিরন্ধ্র অন্ধকারের ভিতর থেকে কচি কণ্ঠস্বর কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠ্‌ছে। আলো জেলে ঢুকে গেলাম আস্তে আস্তে গলির ভিতর। চলে গেলাম অনেক দূর, বাড়ীর সীমা প্রায় শেষ হ'য়ে এলো, মনে হোলো কান্না যেন এবার হাতের কাছেই। আলোর মুখটা ফেরাতেই দেখলাম আমারই বাড়ীর রোয়াকের এক কোনে একটা ভাঙা বেতের ঝুড়ি র'য়েছে উপুড় হ'য়ে, অবিশ্রান্ত নরম কান্না বেরিয়ে আসছে তারই ভিতর থেকে। প্রথমটা ভয়ে শিউরে উঠলাম, তারপর সব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে এগিয়ে গিয়ে বেতের ঝুড়িটা তুলে ধ'রে দেখলাম, একটী মলিন কাঁথার ভিতর চিৎ হ'য়ে শুয়ে মা মা ক'রে কাঁদ্‌ছে একটী অনিন্দ্য সুন্দর শিশু।

বিবাহিত জীবনের বারো বছর পার হ'য়ে গেছে তখন। কিন্তু কী জানি কার অপদৃষ্টিতে স্নেহের বুভুক্ষা আমাদের মেটেনি তখনো। মেটারো আশা ছিলো না আর। ললাটের উপর দোষ চাপিয়ে আমরা নিঃশ্বাস ফেল্‌ছিলাম। ঠিক সেই মূহুর্ত্তে নির্জ্জন গভীর রাত্রিতে কার এমন চিরস্নেহের বস্তু!—সত্যই আমি সেই হতভাগ্য অসহায় শিশুকে দেখে বিচলিত হ'য়ে উঠ্‌লাম। আস্তে আস্তে ফিরে গিয়ে আমার সহধর্ম্মিণী সাবিত্রী দেবীকে জাগিয়ে তুল্‌লাম, বল্‌লাম : দেখে যাও।

: কী?

: কী তা জানি, কিন্তু কে জানি না।

কেঁদে কেঁদে শিশু তখন ক্লান্ত হ'য়ে উঠেছে। তিনি নেবে এসে খানিক নির্নিমেষে তার মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর কোন কথা

না ব'লে সেই অপরিচিত নামগোত্রহীন শিশুকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে দোতলায় উঠে গেলেন।

দুদিন পরে—

ভোরবেলা বাড়ীর দরজা খুলে হঠাৎ দেখি, একটী অবগুণ্ঠিতা রমণী, শুধোলুম ঃ কে তুমি ?

ঃ বাবুর বাড়ীতে চাকরী চাই।

প্রয়োজন ছিলো পরিচারিকার। সামান্য দুএকটী কথাবার্তার পর তাকে ভর্ত্তি করে নিলাম আমার বাড়ীতে। দাবী তার নিজের কিছু নেই। আপত্তিও নেই তার কোন কাজে। তাকে দিলাম বাড়ীর যা কিছু সাফ করবার ভার।

কিন্তু দিন কয়েকের মধ্যে দেখ্লাম শিশুর সাথে সে আলাপ জমিয়েছে বেশ। শিশু তারই হাতে নায়, তারই হাতে খায়, তারই ঘুমপাড়ানি গানে চোখ বুজিয়ে থাকে। প্রথম প্রথম সে শিশুকে উঁকি দিয়ে দেখে চলে যেতো, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত শিশুই তার অর্দ্ধেক সময় কেড়ে নিলো। এমনও মনে হোলো, আমার সহধর্ম্মিণী বুঝি স্নেহে পরাস্ত হ'য়ে যাবে তার কাছে।

খট্কা বাধ্লো মনে। নিভৃতে ডেকে নিয়ে তাকে প্রশ্ন করলাম। সে যা বল্লে তাতে তোমার পরিচয়ের যবনিকা উঠে গেলো—সে ছিলো এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের মেয়ে, বিধবা, রূপবতী। ফরিদপুরের কোনো এক গাঁয়ে ছিলো তার বাস। বৃদ্ধ পিতার কাছে দিন কাট্ছিলো তার সুখে দুঃখে। সহসা কী এক কুখ্যাত দিবসে সে ক'রে বস্লো হৃদয় বিনিময় এক অজ্ঞাতকুলশীল যুবকের সাথে। সে যুবক নানা প্রলোভনে ভুলিয়ে তাকে নিয়ে এলো কোলকাতায়, আরামে আস্তানা গেড়ে বস্লো সহরে। কিন্তু অন্নের সংস্থান চাই সর্ব্বাগ্রে। যুবকের যে সামান্য শিক্ষা ছিল তাতে মহুরীগিরি করা ছাড়া আর কিছু চল্লো না। টানা হেঁচ্ড়া ক'রে দিন কাট্তে লাগ্লো। ওদিকে রমণী সন্তানসম্ভবা। যুবক অবিশ্রাম চেষ্টা করতে লাগ্লো ভ্রূণহত্যার,

রমণী আড়াল ক'রে রইলো প্রাণপণে। তারপর সত্যই একদিন শিশু গর্ভ ছেড়ে পৃথিবীর মাটী স্পর্শ করলো। পুরুষ বল্‌লো, ওছেলে ফেলে দাও, তা না হ'লে তোমায় আমি ফেলে পালাবো। রমণী নিঃশব্দে শুধু শিশুকে বুকে জড়িয়ে রইলো। কিন্তু তিন মাস পরে একদিন ভোরে ঘুম ভেঙ্গে রমণী দেখলো, পাশে সন্তান নেই। কেঁদে সে বল্‌লো, কোথায় তাকে ফেলেছো? পুরুষ বল্‌লো, তোমার কাছে যা আছে সব দাও, না দিলে বল্‌বো না। রমণী তার যাকিছু সব বিলিয়ে দিয়ে এখানে তার শিশুপুত্রের সন্ধান পেয়েছিলো। এবং পরে জেনেছিলো ঐ পুরুষটা একজন চরিত্রহীন মুচির সন্তান।—না, না তিমির, তুমি এমন করে চোখ বুজিয়ো না, চোখ বুজিয়ে বজ্রঘাত এড়ানো যাবে না। কঠিন হ'য়ে চেয়ার আঁকড়ে ব'সো। তিমির, তুমি সেই শিশু, সেই মুচির সন্তান তোমার পিতা, আর মা তোমার ঐ মেনকা ঝি।

পবিত্রবাবু স্তব্ধ হইলেন। অসহ্য নিঃশব্দতা চারিদিক হইতে ঘিরিয়া আসিল। সব যেন থামিয়া আসিয়াছে, পৃথিবীর অবাধ হাওয়াটুকুও মরিয়া গিয়াছে যেন। পবিত্রবাবু বলিলেন: মসীলিপ্ত তোমার পরিচয়, কিন্তু এই অন্ধকারকে পেয়েই আলো হ'য়ে উঠেছিলো আমাদের দশদিক। তোমার এ অনুজ্জ্বল পরিচয়ে আমি বিচলিত হইনি একটুও, সব কিছুর আগে তুমি যে মানবশিশু তোমার এই বিশেষণই আমার কাছে সব চেয়ে বড় হ'য়ে উঠেছিলো। তাই ত্যাগ করার বদলে তোমায় বুকে জড়িয়ে ধ'রে রাত্রিদিন তোমার অনন্ত প্রাণ-স্পন্দন শুনেছি।

একটু থামিয়া বলিলেন: আমি চেয়েছিলাম না যে তোমার এ অপ্রকাশ্য পরিচয় কোন দিন প্রকাশিত হোক্। তোমার রক্তের ধারা যে আমার থেকেও ভিন্ন একথা ভাব্‌তে আমার বুকে শেলাঘাত হোতো। জান্‌তো না কেউই। কেবল জান্‌তাম আমি, আর জান্‌তো আমার সহধর্ম্মিণী। আজ একথা ভেবে দুঃখ পাই যে আমার নোতুন সহধর্ম্মিণীকে আমি আগে চিন্‌তে পারিনি, নির্ব্বোধের মতন সব কথাই তার কাছে খুলে বলেছিলাম।

ধীরে ধীরে স্খলিত চরণে তিমির উঠিয়া দাঁড়াইল।

: ও কি! উঠ্‌ছো কোথায়! বোসো বোসো, আমি স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি তোমার পা টল্‌ছে!

তিমিরের গলার স্বর একটুও কাঁপিল না ; বলিল : যদি টলে তো টল্‌তে টল্‌তেই যেতে হবে, দাঁড়াবার ঠাঁই কোথায়।

: কী বল্‌ছো তুমি পাগলের মত! না না বোসো বোসো, ব'সে একটু জিরিয়ে নাও, তারপর....

: জিরোবার জন্যেই তো দাঁড়িয়েছি, ব'সে ব'সে জিরোবার দিন কী আরো আছে?

: না, না, ও কী! কী বল্‌ছো তুমি স্পষ্ট ক'রে বলো, কী করবে বল্‌ছো তুমি এখন?

: বেশী কিছু নয়, আপনাকে নমস্কার করবো, তারপর দোতলায় নাব্‌বো, দোতলা থেকে একতলায় একতলা থেকে রাস্তায়, তারপর এখনো ভাবিনি।

পবিত্রবাবুর চোখের তারা দুইটা হয়তো স্থির হইয়া উঠিল : তুমি কী ঠিক করেছো চলে যাবে এখান থেকে!

: ঠিক করিনি, ঠিক হ'য়ে গেছে, নীচের ঘর থেকে রাস্তা আর কতটুকু? তা ছাড়া কার ওপোর ভর দিয়ে দাঁড়াবো এখানে? নীচে যে চোরাবালি।

: না না, পাগলামি কোরোনা তুমি, এ পাগলামির কোন অর্থ নেই : পবিত্রবাবু উঠিয়া তাহার হাতটাই ধরিয়া ফেলিলেন :

: পাগলামি হ'লে সত্যিই কোন অর্থ থাকতো না, কিন্তু এর পর চলে যাওয়াটা পাগলামি নয়, থেকে যাওয়াটাই পাগলামি।

পবিত্রবাবু একটু চুপ করিয়া রহিলেন, তারপর সন্তর্পণে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন : থেকে যাওয়াটাই পাগলামি, না তিমির? ঠিকই বলেছ তুমি, ঠিকই বলেছো....হ্যাঁ তাই করো, পাগল হবার জন্যে তুমি থেকে যেও না, তুমি চলে যাও, কিন্তু আমি বলি কী তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না।

তিমির শুষ্ক নিষ্কম্প দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

পবিত্রবাবু বলিলেন ঃ হ্যাঁ, তুমি স'রে যাও কিন্তু আমাকে সরিয়ে দিও না, তুমি এখান থেকে নেবে গিয়ে নিজের আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকো। কথাটা জড়িয়ে যাচ্ছে, এসো পরিষ্কার করে দিচ্ছি ঃ বলিয়া তিনি তিমিরকে টানিয়া লইয়া একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন, স্থির কণ্ঠে বলিলেন ঃ তুমি এবাড়ী ছেড়ে চলে যাও, একেবারে সটান চলে যাও উত্তর কোলকাতার বাড়ীতে সেখানে গিয়ে নোতুন ক'রে জীবন সুরু করো। সে বাড়ীখানার গোটাটাই তোমার রইলো। চাকর দারোয়ান সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি, গা ছড়িয়ে সেখানে আরামে থাকোগে, আর আমার সমস্ত সম্পত্তি আর সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অর্দ্ধেক অংশই তোমাকে দিলাম, তার উপার্জ্জন থেকে তোমার বিরাট পরিকল্পনাও সিদ্ধ হ'তে পারবে, আমি মাসের মধ্যে পনেরো দিন অনায়াসে তোমার কাছে গিয়ে থাক্‌তে পারবো। টেবিলের উপর হইতে ভাজ করা কাগজটা তুলিয়া লইয়া বলিলেন ঃ এটা যত্ন ক'রে কাছে রেখে দাও, এতে সমস্তই স্পষ্ট করে লিখে দিয়েছি। শত্রুঘ্নকে দেখ্‌ছো এখানে, তোমার নোতুন মার ইচ্ছা ভাইকে তিনি প্রতিষ্ঠিত কর্‌বেন এবাড়ীতে, কর্‌বেন ভাবী উত্তরাধিকারী। এমনি অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া অনেকদিন থেকেই পাচ্ছিলাম বাড়ীর মধ্যে, তাই এটা তৈরী করতে বিশেষ দেরী করিনি. নাও, রাখো ঃ বলিয়া উইলটা তিনি সাম্‌নে তুলিয়া ধরিলেন।

ঃ অজস্র ধন্যবাদ, ওটা আপনিই রেখেদিন যত্ন করে, সব চেয়ে বড় ঐশ্বর্য্য নিয়ে যাচ্ছি আপনার কাছ থেকে, সে আমার পরিচয়, এর উপর বোঝা আর বাড়াতে চাই না।

ঃ সে কী ! তবে তুমি যাবে কোথায় ?

ঃ সে কথা ভাব্‌বো বলেই তো যাচ্ছি, তাইতো এখানে আর দেরী কর্‌তে চাইনা ঃ তিমির পা বাড়াইল।

পবিত্রবাবু তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিলেন ঃ না না,

অবুঝ হ'য়ো না তিমির, এ তুমি নাও, এ তোমাকে নিতেই হবে। তোমার জন্মদাতা না হ'লেও তোমাকে লালন করেছি আমি, আমার অনুরোধ, এ তোমাকে নিতেই হবে : বলিয়া তিনি তাহার হাতের ভিতর কাগজখানা গুঁজিয়াই দিলেন : আর হ্যাঁ, এ খানাও রাখো : বলিয়া পকেট হইতে আর একটা কাগজ বাহির করিয়া বলিলেন : এও একটা মস্ত জমিদারী ; বৃদ্ধ বয়সে তোমার বাবা তোমার প্রতি প্রসন্ন হ'য়ে উঠেছিলেন। তাঁর স্ত্রী পুত্র সব মহামারীতে মুছে গেছে। পূঞ্জীভূত করুণা তাই তোমার উপর এসে পড়েছে। তিনি স্থির করেছিলেন, মৃত্যুর আগে তার পরিত্যক্ত সন্তানের জন্য কিছু ক'রে যাবেন। কবে গোপনে এসে তোমার মার কাছে তিনি এ সব ব'লে গেছেন এবং এ কাগজখানাও দিয়ে গেছেন। জমিদারী তার ছিলো না, যেখান থেকে যেমন করেই হোক্ তিনি তা তোমার জন্যে জোগাড় করতে সমর্থ হয়েছিলেন সন্দেহ নেই : বলিয়া তিনি কাগজখানা তার পকেটের ভিতর ফেলিয়া দিলেন। তারপর তিমিরের পিছনে পিছনে বাহিরে আসিয়া বলিলেন : চলো, আমিও যাই, উত্তর কোলকাতার বাড়ীতে তোমার সব বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে আসি। তোমার গাড়ীখানাও তুমি নিয়ে যাবে, আজ অবশ্য একই গাড়ীতে যাবো…কিন্তু খিদে পেয়েছে যে ভীষণ…তা হোক্, চলো বাইরে গিয়েই খাওয়া যাবে, এ বাড়ীতে আর জল গ্রহণ ক'রো না।

পবিত্রবাবুর কথা শেষ হইতে না হইতেই তিমির হুড়মুড় করিয়া সিড়ি দিয়া নামিয়া চলিল। নোতুন-মা দাঁড়াইয়া আছেন সিড়ির প্রান্তেই : হাতে ও কী ? যাবার সময় বেশ কিছু গুছিয়ে নিয়ে চ'লেছো বুঝি ?

: হ্যাঁ নিয়ে চ'লেছি, কিন্তু গুছোতে পারলাম না, তোমার দান টুকুই আমি নিয়ে যাবো, আর উপর থেকে যা এনেছি তা রেখে যাবো এইখানে : বলিয়া পকেট হইতে দেশলাই বাহির করিয়া খস্ করিয়া জ্বালিয়া তিমির কাগজটার কোনে ধরাইতে যাইতেছিল। নোতুন-মা ক্ষুধার্ত্ত ঈগলের মত ছোঁ মারিয়া সেটা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন : আমি দেখতে চাই তুমি কী নিয়ে যাচ্ছিলে।

: হ্যাঁ দেখো, দেখে যত্ন ক'রে রেখে দিও, ভাবী সন্তানের দুধ গরম হ'তে পারবে।

পবিত্রবাবু পিছনে আসিয়া পড়িলেন : ছি ছি, ওটা হাত ছাড়া ক'র্লে তিমির? তোমার একটুও বুদ্ধি নেই, তুমি একবারে বেহিসেবী....

তিমির তখন আর একটা সিড়ির মুখে পৌছিয়াছে।

সেখানে নতমুখে দাঁড়াইয়া অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা মেনকা ঝি। পায়ের কাছে টপ্ টপ্ করিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতেছে, বুঝি চোখ হইতে।

তিমির তাহার সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইল, কহিল : মা, তোমার অপরিমিত স্নেহের জন্যে তোমায় নমস্কার করি, কিন্তু তুমি আমায় গর্ভে ধারণ ক'রেছিলে সে জন্যেই তোমায় প্রণাম কর্‌লাম না।

তারপর তিমির একতলায় : সরকার মশাই, আর বাজারে যেতে হবে না। আমার প্রয়োজন শেষ : বলিতে বলিতে সে একেবারে রাস্তায় আসিয়া পড়িল।

পবিত্রবাবু পিছনে পিছনে ছুটিয়া আসিলেন : ও কী! ওদিকে যাচ্ছ কোথায়? গাড়ীতে যাওয়ার কথা ছিল যে—সর্দ্দার, সর্দ্দার, গাড়ী বার কর জল্‌দি, বাবুর গাড়ীখানাই।

: ধন্যবাদ. ঐ গাড়ীতে ক'রে আপনিই হাওয়া খেয়ে আসুন গে।

: দাঁড়াও তিমির যেওনা, কথা আছে।

: কথা শুনতে শুনতে মুখ আমার কালো হয়ে উ'ঠ্‌ছে।

: একটীবার, আর একটু : বলিতে বলিতে পবিত্রবাবু ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাতখানা ধরিয়া ফেলিলেন : নিতান্তই যাবে তাহ'লে?

: পথের উপর দাঁড়িয়ে তার আর সন্দেহ আছে কি?

: তোমায় প্রাণ দান ক'রেছিলাম, মানুষ করেছিলাম, তার প্রতিদানটকুও দেবে না।

তার জন্য আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আর বেশী কী দেবার অধিকার আছে?

ঃ তোমার এ অভিমান নিরর্থক হোতো না, যদি আমার নাসিকা ঘৃণায় কুঞ্চিত হোতো।

ঃ আপনি সত্যই পবিত্র।

পবিত্রবাবু ক্ষণকাল নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলেন, তারপর তিমিরের হাতখানা আস্তে আস্তে ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন ঃ জানি তুমি চলে যাবে, কেননা, এর পর কেউই আর থাকে না, তবুও কী জানি কেন পাগলের মতন ব্যর্থ চেষ্টা করলাম জড়িয়ে থাকবার। গভীর অন্ধকারে তোমায় পেয়েছিলাম, পরিপূর্ণ আলোকে তোমায় হারালাম। যাও, তবে বলে রাখি, যদি কোনদিন প্রয়োজন হয় আমার কাছে আসতে যেন দ্বিধা কোরো না।

তিমির দাঁড়াইয়া বহুদূরে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, তারপর টলিতে টলিতে জন সমুদ্রে মিলাইয়া গেল।

চার

ধীরে ধীরে ঘুম ভাঙ্গিতেছে। চোখের পাতা খোলে নাই, তবুও দেখা যাইতেছে শ্লেট রঙের আকাশ। ব্যর্থ প্রেমিকার ম্লান দুটী চক্ষুর মত বিবশ কম্পমান দুটী তারা।

নীচেকার কল হইতে ছড়্ ছড়্ করিয়া জল পড়ার শব্দ কানে আসিতেছে। এক গাদা এঁটো বাসন ফেলার আওয়াজ। ঝি চাকরের চীৎকার। তারপর নাকে আসিয়া ঢুকিল প্রথম আঁচের টাট্‌কা ধোঁয়ার এক ঝলক— এইবার বেড টী—

বোঁ করিয়া একটা পাক্ মারিয়া তিমির পাশ বালিশটাকে জড়াইয়া ধরিতে গেল।

ঢং!

একী! পায়ে কীসের ধাক্কা লাগিয়াছে!

ধড়্ ফড়্ করিয়া তিমির উঠিয়া বসিয়া চোখ খুলিবামাত্রই কলের জলের ছড়ছড়ানি, এঁটো বাসনের আওয়াজ, আঁচের ধোঁয়ার গন্ধ, আর বেড-টী ডানা মেলিয়া কোথায় উড়িয়া গিয়াছে।

ক্ষীণতম একটু হাসি। কী সৌভাগ্য আজ সে খাটে শোয় নাই! যে আরামে পাক্‌টা সে মারিয়াছিল, হাত কিংবা পা একটা না জখম হইয়া থাকিত কী?

মাটী স্পর্শ করিয়া থাকার সুবিধা অনেক। তাণ্ডব নৃত্যে গা ছড়াইলেও ক্ষতি নাই।

দুই হাত দিয়া চোখ কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে তাহার মনে হইল,পাহাড় হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া তাহার মাথা ফাটে নাই। বরং অসাধ্য সাধন করিয়াছে সে।

রাস্তায় বাহির হইবার পর হইতে প্রায় দশ ঘণ্টা সে অবিশ্রাম একটানা হাঁটিয়াছে, হাঁটার চোটে মনে হইতেছিল, বালিগঞ্জ তো বালিগঞ্জ, এই মহানগরী ছাড়াইয়া সে বুঝি কোন অচেনা দেশে আসিয়া পড়িল। কিন্তু আশ্চর্য্য! এত করিয়া এ অঞ্চলটুকুও ছাড়াইতে পারে নাই। এত সময় ধরিয়া কেবল ভূতের মত এক জায়গাতেই পাক্ খাইয়াছে। পথ চলিতে সে অভ্যস্ত নয়। তবুও কেমন করিয়া না জানি সে চলিয়াছিল। থামি থামি করিয়াও থামিতে পারিতেছিল না। কেন চলিয়াছিল তাহা সে জানে না; কেবল চলিতে চলিতে অনুভব করিতেছিল পা দুইটা তার অব্যক্ত বেদনায় মাঝে মাঝে টন্ টন্ করিয়া উঠিতেছে।

তারপর বুঝি বিশ্রামের জন্য এই টিনের গুদাম ঘরটার পাশে সে একটুখানি বসিয়াছিল, আর উঠিতে পারে নাই। অবসাদে ঝিমাইয়া ঝিমাইয়া কখন এক সময়ে লম্বা হইয়া শুইয়া একটা নাতিদীর্ঘ ঘুমও বুঝি সে দিয়া দিয়াছে। খাট আর নরম বিছানার জন্য দুঃখ করিবার অবসরও পায় নাই।

ভালই হইয়াছে। এবং এই ঘুমটা তার আর একটু দীর্ঘ হইলে আরো ভাল হইত। বেশী কিছু না হইলেও চোখ বুজাইয়া বুজাইয়া বেড-টীটা সে অনায়াসে সমাপ্ত করিতে পারিত।

আবার একটু ম্লান হাসি।

তারপর গায়ে একটা ঝাঁকুনি দিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

পথশ্রমের ক্লান্তি মুছিয়া গেলেও তবু সে যেন ঠিক আরাম পাইতেছিল না। দেহের কোথায় যেন কী একটু খট্‌কা বাধিয়া আছে। সেটাকে সে নিরুদ্যম মনের শিথিলতা ভাবিয়া ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিল, কিন্তু চলিবার জন্য সামনে পা বাড়াইতেই মাথাটা যখন ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল, তখন মনে পড়িল, সে উপবাসী।

সেই যে পরশু রাত্রে কাটোয়ায় সেই মেয়েটীর বাড়িতে সে আহার করিয়া আসিয়াছিল তাহার পর আজ পর্য্যন্ত তাহার আর কিছু খাওয়া হয় নাই।

কাল সমস্ত দিন তাহার বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া কাটিয়াছে। খাইবার কথা মনেও হয় নাই। মনে হইলেও মনের কথা মনেই রাখিতে হইত, কেননা সে কপর্দ্দক-হীন। আজ সে ক্ষুধার্ত্ত, এবং খাইবার বাসনা মনে জাগিলেও জানিয়া শুনিয়া পকেটে হাত দিয়া সে প্রতারিত হইতে চাহিল না।

গায়ের চামড়া মোটা হইলে কাল দুপুরটা অন্ততঃ সে পবিত্রবাবুর বাড়ীতে পাতা বিছাইয়া আসিতে পারিত। তাহাতে আর কিছু না হইলেও মাথার ঝিম্‌ঝিমানিটা সুরু হইতে আরো খানিকটা দেরী হইত সন্দেহ নাই।

কোঁচাটা ঝাড়িয়া লইয়া রাস্তা পার হইয়া সে ওদিকের ফুটপাথ দিয়া আস্তে আস্তে চলিতে লাগিল এবং সাম্‌নেই একটা জলের কল দেখিতে পাইয়া তার তলায় উবু হইয়া বসিয়া উটের মত দম্‌ভোর এক পেট জল টানিয়া লইল।

বেড-টী এবং প্রাতরাশটা তাহার মন্দ হইল কী!

চমৎকার!

একদিন আগেও সে রাশি রাশি মুদ্রা লইয়া ছিনিমিনি খেলিয়াছে। আজ তাহাকেই লইয়া কে ছিনিমিনি খেলিতে সুরু করিল? বিরাট অট্টালিকা.... অতুল ঐশ্বর্য্য,...পরিপূর্ণ উপভোগ···মুঠা ভরিয়া দান···! ভোজবাজী! কে যেনো আলাদিনের মায়ার প্রদীপ ছোঁয়াইয়াছে! সব একাকার!

কাটোয়াতেও সে এই সেদিন এম্‌নি নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছিল। তবু সে নিঃস্বতা ও এ নিঃস্বতার মাঝে কোথায় যেন একটা আকাশ পাতাল ব্যবধান আছে। না থাকিলে মুহুঃমুহু তাহার এমন করিয়া হাসি পাইত না।

হ্যাঁ, হাসি, এ হাসি অক্ষয় হইয়া থাক্।

তিমির পায়ের ছন্দ আরো বাড়াইয়া দিল। যথাসম্ভব শীঘ্র এপল্লীটা তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে। কী জানি কোথা হইতে কে হয়ত তাহাকে এখুনি 'রাজাবাবু' বলিয়া ডাকিয়া বসিবে। কয়েক পা আগাইয়া গিয়া বাঁ দিকের মোড় ফিরিয়া সে একটা বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িল।

কল্লোল, কলরোল, মানুষের মিছিল...এ উহার গায়ে পড়িতে পড়িতে টাল্ সাম্লাইতেছে। যেন বড় বড় ঢেউ....নিরুদ্দেশ হইতে আসিয়া ঘাট ছুঁইয়া আবার উধাও হইয়া যাইতেছে নিরুদ্দেশে!

এরা যাবে এদিক। আর ওরা? ওদিক। পথের উপর বরফের কুচির মত পড়িয়া সব ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছে চতুর্দ্দিকে। অধীর ও উন্মুখ। চলো চলো রব। পড়িয়া আছে অন্ধ খঞ্জ শক্তিহীনের দল।

মুখ ফিরাইয়া তিমির দ্রুতপায়ে চলিতে লাগিল।

ঃ বা, তিমির দা যে!

বাঁ হাতে একটা টান খাইয়া তিমির দাঁড়াইয়া পড়িল, কহিল ঃ এই যে পালোয়ান, কোত্থেকে?

ঃ মর্নিং ওয়াক্ সেরে ফির্‌ছি। আপনি?

ঃ আমিও।

ঃ এরপর বাড়ী ফির্‌বেন বুঝি?

ঃ হ্যাঁ,·· মানে নুন ওয়াক্, আফ্‌টারনুন্ ওয়াক্, ইভিনিং ওয়াক্ এবং সেই সঙ্গে নাইট ওয়াক্‌টাও সেরে একবারে ফির্‌বো। ওয়াকিং ইজ্ দি বেষ্ট্ এক্সার-সাইজ্, তোমার কাছ থেকে এ উপদেশ শুনবার পর স্বাস্থের লোভে আমি সমস্ত দিনই বেড়াই।

পালোয়ান কৌতুক অনুভব করিল, বলিল ঃ বা—রে, আচ্ছা বোকা তো... এতে বুঝি শরীর ভাল হয়? তারপর একটু থামিয়া বলিল ঃ ও, অল্ ডে কেটেছেন বুঝি?

তিমির হাসিল ঃ হ্যাঁ, অল্-ডে'ই বটে, তবে ট্রামের নয়, রাস্তার।

বুঝিতে না পারিয়া পালোয়ান তিমিরের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

তিমির হাসিয়া বলিল ঃ দেখ্‌ছো কী পালোয়ান, এ কীই বা তোমার চেহারা, এই রাস্তার অল-ডে কেটে দেখ্‌বে আমি একেবারে গোবর হ'য়ে উঠ্‌বো।

: আচ্ছা, দেখ্‌বেন, এই মর্নিং ওয়াক্ ক'রে আমি হবো ভীম ভবানী। বা-রে ওদিকে ফিরছেন কোথায়? আমার সঙ্গে যেতে হবে না বুঝি?

: কোথায়? তোমাদের বাড়ীতে? নিশ্চয়ই যাবো, তবে আজ নয়, আর একদিন।

ঠোঁট উল্‌টাইয়া পালোয়ান বলিল: আজ নয়, আবার আর একদিন, ইস্কুল ইন্‌স্‌পেক্টারের মত আবার তারিখ ফেলা হ'চ্ছে: তারপর হাতখানা ভাল করিয়া কায়দা করিয়া ধরিয়া বলিল: কদ্দিন যান্‌নি মনে আছে? এই পুরো একমাস, আগে কিন্তু যেতেন মাসে দুবার....আমার সাম্‌নে থেকে উনি আবার পালাবেন, চলুন: বলিয়া পালোয়ান তাহার হাতে একটা হ্যাঁচ্‌কা টান দিল!

তিমির বিপদে পড়িল: কিন্তু আমার অল্ ডে'টা যে নষ্ট হবে, তার চেয়ে কাল যাবো, গিয়ে তোমার সঙ্গে বন্ধুত্বটা আরো পাকা করে আস্‌বো।

: সে কথা শুন্‌ছে কে...কেমন না যান দেখছি: বলিয়া পালোয়ান তিমিরের হাতখানা লইয়া দস্তুরমত টাগ অফ্ ওয়ার সুরু করিয়া দিল।

অগত্যা তিমির তাহার সঙ্গেই চলিল।

এত বন্ধুত্বের মাঝখানে আছে শুধুমাত্র এক বাক্স চকলেট। এবাড়ীতে পদার্পণ করিলেই পালোয়ানের এ পাওনা বাঁধা। তিমির তাই তার কাছে অতি মূল্যবান। তার জিহ্বায় সে একটা অপূর্ব্ব সুখানুভূতির মত।

এগার বছরের এই ব্যায়ামবীর স্বাস্থ্যরক্ষার অক্লান্ত উপদেশ বর্ষণ করে তাহার কানে, প্যাকেটটা আয়ত্বের মধ্যে না-আসা পর্য্যন্ত। আয়ত্বের মধ্যে আসিলেই পালোয়ান হাওয়া। এত সম্বর্দ্ধনা এত সুস্বাগতম্—কিন্তু পাওনাটা চুকাইয়া দিলেই তিমির অনায়াসে ছুটি পাইতে পারিত রাস্তা হইতেই।

বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া তিমির বলিল: পিসেমশাই আছেন তো?

: বা-রে, এখানে ঠেকে গেলে কী হবে, চলুন ওপরে, কতকগুলো যুযুৎসুর প্যাঁচ শিখিয়ে দোবো।

: তাই নাকি? কিন্তু পা যে আমার আজ খোঁড়া?

ঃ তা হোক্, যুযুৎসু না হয় পিকক্ ডনটা নিশ্চয়ই হ'তে পারবে....বাবা, বাবা, ত্থাখো তিমিরদা এসেছে ঃ বলিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে সে তিমিরকে লইয়া দোতলায় আসিয়া পৌছিল।

পিসিমা বারান্দায় আসিলেন ঃ ও, তিমির বুঝি ? এসো এসো. অনেক-দিন পরে……বলিয়া তিনি ঘরের ভিতর চলিয়া গেলেন এবং একটু পরেই বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন ঃ তোমার পিসেমশাই জল খাচ্ছেন, একটু দেরী হবে, তুমি ততক্ষণ নীচের ঘরে বোসো গিয়ে....পালোয়ান, ওঁকে নিয়ে যা তাড়াতাড়ি, নীচের ঘরে নিয়ে বসা গে।

ঃ বা, তিমিরদা এলে তো আমার ঘরেই বসে, নীচের চেয়ে আমার ঘরটা তো বেশী আরামের।

ঃ যা পাজি, যা বলি শোন্, ওঁকে বসিয়ে রেখে শীঘ্রি আয়, পড়্তে বস্‌বি।

ঃ হ্যাঁ, বস্‌লেই হোলো, পিকক্ ডন্‌টা তবে তুমিই ওঁকে শিখিয়ে দাও না গে, বলিয়া পালোয়ান গট্‌মট্ করিয়া নীচে নামিয়া আসিল। সেই সঙ্গে তিমিরও।

ঘরে আসিয়া বসিতে না বসিতে সিঁড়িতে জুতার আওয়াজ পাওয়া গেল। পালোয়ান ত্রস্ত হইয়া বলিল ঃ ঐ বাবা আস্‌চেন, পালাই।

ঃ বাবা আস্‌চেন তো পালাবে কেনো ?

ঃ প'ড়তে বসা হয়নি এখনো। তবে. আমি ঠিক টাইমে আস্‌ছি, রেডি হ'য়ে থাক্‌বেন, এসেই ডন্‌টা শিখিয়ে দোবো।

ঃ কে, তিমির ? দাঁড়িয়ে কেন, বোসো বোসো, অনেকদিন পরে, তোমার কথাই ভাব্‌ছিলাম....তা, ভালো তো ? ঃ বলিতে বলিতে পিসেমশায় ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন।

ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ।

ঃ এমন উস্কোখুস্কো দেখাচ্ছে কেন ? শরীরটা ভাল নেই বুঝি ?

ঃ সর্দ্দি লেগেছে নাকে একটু, চানটা তাই বন্ধ রেখেছি।

: বোসো, বোসো, তোমার সঙ্গে কথা আছে, ঐ চেয়ারটাতেই বোসো : তারপর দরজা দিয়া দোতলা লক্ষ্য করিয়া হাঁক দিলেন : কই গো, তিমিরের চা নিয়ে এসো।

: থাক্, চা আমি খেয়েছি।

: খেয়েছো তো নিশ্চয়ই, তাহ'লেও এখানে খেতে হয় সেতো বরাবরই দেখ্ছো। হ্যাঁ, কী বল্ছিলাম, তোমার সৎমা বুঝি আজও তোমায় দেখ্তে পার্লেন না?

: কেন, দেখ্ছেন তো?

: কৈ আর দেখ্ছেন, যা দেখ্ছেন তা তো আগের মতই, কিছুদিন আগে তিনি তোমার পিসিমাকে একখানা চিঠি দিয়েছেন।

: দিয়েছেন নাকী?

: হ্যাঁ, তিনি যা লিখেছেন তা তোমার কাছে বল্লে তুমি মনে যেনো দুঃখ কোরো না। তিনি লিখেছেন, তুমি পবিত্রবাবুর ও সাবিত্রী দেবীর সন্তান নও, তুমি তাদের পালিত সন্তান।

: লিখেছেন নাকী?

: হ্যাঁ, শুধু তাই নয়, তিনি আরো লিখেছেন, তুমি নাকী···তুমি নাকী জারজ সন্তান এবং জাতিতে মুচি।

তিমিরের সর্ব্বাঙ্গের মাংসপেশীগুলো গোপনে একবার আকুঞ্চিত হইয়া পরক্ষণেই থামিয়া গেল। সে মুখে হাসি আনিয়া বলিল : ঐ জন্যেই আমায় তাড়াতাড়ি নিচে নামিয়ে আন্লেন নাকী?

: কী আর করা যায় বলো, যদ্দিন না এটা ঠিক মিথ্যে বলে জান্ছি তদ্দিন —মানে সমাজ ব'লে তো একটা আছে?

: নিশ্চয়ই আছে, তাছাড়া এটা সত্যিও তো হ'তে পারে।

: তার আশঙ্কা কমই, তোমার সৎমার একচোখো দৃষ্টির ফল ব'লেই এটা মনে হয়, তবুও কথাটা যখন উঠেছে—

ঃ নিশ্চয়ই, সাম্‌লে থাকা দরকার বৈকি।

ঃ আচ্ছা, একথা শুনে তোমার মনে কী একটুও খট্‌কা বাধ্‌ছে না?

ঃ বাধ্‌ছে বৈ কি।

ঃ আচ্ছা, যদি সত্যিই হয় কী ক'র্‌বে তুমি?

ঃ আপনিই সেটা ব'লে দিন না।

ঃ তোমার সৎমা তো খাপ্পা হ'য়েই আছেন। তিনি লিখেছেন, তিনি এ অনাচার আর স'ইতে পারছেন না। তা যদি হয় ওবাড়ীতে তোমার আয়ু আর বেশী দিন নয়। কিন্তু পবিত্রবাবু যে তোমায় একেবারে ত্যাগ ক'র্‌বেন তা মনে হয় না। তার স্নেহ আছে, তার জাতের বিচার নেই। এই সুযোগ নিয়ে বুড়োকে জপিয়ে যদি বেশ কিছু বাগিয়ে নিতে পারো। এ সব কথা উঠ্‌লে মেজাজ গরম না ক'রে বেশ সুবোধ ছেলেটীর মতন কাজ গুছিয়ে নিতে হবে আগে, তারপর অন্য কথা। কীসের অপমান? জুতো সেলাই করার চেয়ে তো ভালো?

ঃ তা ভালো বৈকি, তাই করা যাবে না হয়।

ঃ এদিকে দেশ সেবা গরীব উদ্ধার ইত্যাদি ক'রে তো বহু টাকাই উড়িয়েছো, যত সব বুজ্‌রুকি।

ঃ ঠিক কথা।

ঃ কিন্তু তোমার সৎমার একথা যদি সত্যি হয়, আমি কেবল ভাবি ঐ পবিত্রবাবুর কথা, ও কী মানুষ! জেনে শুনেও ও সব খোয়ালে! পরকালে ও জবাব দেবে কী?

ঃ জবাব দেবে না হয় তো।

একটা সাদাসিদে থালায় পিসিমা খাবার লইয়া আসিলেন। একটু ইতস্ততঃ করিয়া সেটা টেবিলের উপর রাখিয়া বলিলেনঃ এইখানেই বোসো না হয়, জল ঢেলে দিলেই চল্‌বে। একেবারে দূরে সরিয়ে দিতে আমাদেরো মনটা কেমন করে।

: সেই কথাই বল্‌ছিলাম ওকে। বল্‌ছিলাম, এ কথা সত্যি ব'লে মান্‌তে মনে বড় দুঃখ হয়।

: উপায় আর কী। হিন্দু—সমাজ আছে, ঠাকুর-দেবতা আছে, একেবারে তো সব চুলোয় ফেলে দেওয়া যায় না? আর যতই সংমা হোক্, কিছুটা সত্যি না হ'লে কারো নামে কেউ কী এমন ক'রে লিখ্‌তে পারে? কপাল ছাড়া এ আর কী?

: তাই বল্‌ছিলাম, এবার তো ছিট্‌কে প'ড়্‌বে, কিন্তু হা-ঘরে হ'য়ে বাঁচবে কী করে? কোত্থেকে কোথায় প'ড়্‌ছো সে কথা ভেবে গালে হাত দিয়ে ব'সে থাক্‌লে সময় চ'লে যাবে। য়্যাক্সিডেন্ট যখন হবেই ভাব্‌ছো তখন এমন জায়গায় ব'সো যাতে ধাক্কাটা কম লাগে: পিসেমশাই উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

পিসিমা যোগ দিলেন: এতদিন যেমন কাটিয়েছিলে তেমন তো আর হবে না। যেখানে দাঁড়িয়েছিলে সেখান থেকে নাম্‌তেই হবে। আর এ কথা শুন্‌লে মুখ ফিরিয়ে নেবে সবাই, গঙ্গাজল হ'য়ে সবার কাছে কী আর থাকা চল্‌বে? এ সবের জন্যে তোমাকে প্রস্তুত হ'তে হবে বৈ কি।

: হ্যাঁ, যা বল্‌লাম্ মন খারাপ না ক'রে বুদ্ধিমানের মত তাই কোরো তিমির, বিপদে প'ড়্‌তে হবে না। তার আগে গোপনে গোপনে খবরটা ভাল ক'রে জান্‌বার চেষ্টা কোরো, মার সঙ্গে ঝগড়া ঝাটি কোরো না, তাহ'লে সুবিধে হবে না। আর সাদা মুখে স্পষ্ট ক'রে সব বললাম ব'লে আমাদের উপর রাগ কোরে যেন এখানে আসা বন্ধ কোরো না, যদ্দিন না নীট্ খবরটা পাই তদ্দিন মাঝে মাঝে এসো: বলিয়া পিসেমশাই অন্তর্হিত হইলেন।

পিসিমা বলিলেন: হ্যাঁ, এবার অন্নের সংস্থান ক'র্‌তে হবে বৈ কি। আর তো মুঠো ভ'রে থাক্‌বে না? এবার পেটের তাগিদ বুঝ্‌বে, বুঝ্‌বে দুবেলা দুমুঠো জোগাড় করবার ঘানি। লেখাপড়া তো শিখেছো, একটা চাক্‌রী ব বাক্‌রীর জোগাড় দেখো, নয়তো সন্ধান ক'রে দেখো বাবার জাতব্যবসা কিছু ছিলো কিনা, তাতেও পয়সা অনেক। তা, ঘুরে বোসো এবার, চা

ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে, আমি আস্‌ছি এখুনি। ভগবান করুন্‌, একথা যেনো মিথ্যেই হয়ঃ বলিতে বলিতে তিনি দরজার বাহিরে গিয়াই আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিলেনঃ হ্যাঁ, আর একটা কথা, খেয়ে কাপ ডিস্‌গুলো ঐ কলতলায় জলের নীচে নামিয়ে দিয়ো বাবা, ধুতে আর হবে না তোমায়। আর কল থেকে জল নিয়ে টেবিলটার উপর ছড়িয়ে দিয়ো একটু। কথাটা যখন উঠেছে, বুঝ্‌লে না? ঃ বলিতে বলিতে তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

তিমির ঘুরিল, কিন্তু ঘুরিয়া আর বসিল না। চৌকাঠ পার হইয়া সটান্‌ একেবারে রাস্তায় নামিয়া আসিল।

পাঁচ

অভয়দের মেস্‌টা যে এই রাস্তাতেই তাহা তাহার খেয়ালই ছিল না। সে চলিয়াছিল জনসমুদ্রে স্খলিত একটী ঢেউএর মত—গড়াইতে গড়াইতে কখন একসময়ে এ-প্রান্তে আসিয়া ঠেকিয়াছে।

উপরের রেলিং ধরিয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়াছিল অভয়। হুড়মুড় করিয়া নামিয়া আসিয়া সে একেবারে চুলের ডগায় ধরিয়া টান্ দিল : রাস্কেল, লুকিয়ে লুকিয়ে পালানো হচ্ছে, সেদিন এখানে খাওয়া হবে ব'লে যে সটান্ লম্বা ?

ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া তিমির শুধু একটা হাসির ঝলকেই অভয়কে চম্‌কাইয়া দিল।

: এ কী ! চিতা থেকে পালিয়ে এসেছো নাকী ?

: তাই কী মনে হচ্ছে ?

: মনে হ'চ্ছে আধ পোড়া হবার পর নীচে নেমে পড়েছো।

: ঠিকই, নীচে নামবার আগেই আধপোড়া হ'য়েছি।

অভয় হাসিয়া কহিল : চলো, এখন পদ ধূলি দিয়ে দরিদ্রকে কৃতার্থ করো।

: ধূলি ঝ'রে গেছে ভাই, যা আছে নিজের মাথার জন্যে রেখেছি।

অভয় শুনিতে পাইল না, সে বলিতে লাগিল : রুক্ষচুল, ক্লান্ত চোখ্, আর অপরিপাট্য দেশপ্রেমিকের লক্ষণ হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। শেষ পর্য্যন্ত তোমাকেও এ ন্যাকামিতে পেয়ে ব'স্‌লো নাকি ?

তিমির উদাসীন চোখে পথের দিকে তাকাইল।

অভয় বলিল : এ ছলগুলো না ধ'রলেও দেশপ্রেমিক হওয়া যায় ভাই, আগেও তুমি দেশপ্রেমিক ছিলে, আজ তোমাকে ফাঁকিবাজ ব'লে মনে হ'চ্ছে।

: চল্‌লাম্ ভাই।

: ঘাড় ধ'রে নিয়ে যাবো ওপরে। সেদিনের মিল্ নষ্ট ক'রেছো, আজ পচা ভাত খেয়ে আস্‌বে চলো : অভয় তাহার ঘাড় ধরিয়াই উপরে লইয়া আসিল এবং নিজের ঘরে ঢুকিয়া তাহাকে তক্তার উপর বসাইয়া দিয়া বলিল : অনেক বড়লোক আছে, তারা মাঝে মাঝে সখ ক'রে গরীব সাজে, একটা মিঠে মিঠে রোমাঞ্চ নাকী তারা এর মধ্যে খুঁজে পায়। তোমারো সেরকম একটা কিছু নাকী ?

: বোধ হয় তাই, কেন না বেশ নূতন নূতন লাগ্‌ছে।

: তোমরা সখ ক'রে এক আধবার পায়ে ধূলো লাগিয়ে আনন্দ পাও, আর আমাদের জীবনটা কেটে গেলো, তবু পায়ের ধূলো টেনে ছাড়াতে পারলাম না।

: আঃ, এবারে বেড়ে ঘরটা পেয়েছো তো, দক্ষিণ একেবারে খোলা।

: অভয় হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইল : লজ্জা দিও না ভাই। দেখ্‌তে পাচ্ছো, ঘরটা চারকোণেও নয়, তিনকোণে।

: তবু চারপাশে দেয়াল আছে, মাথার উপর শক্ত একটা ছাদ আছে। ঝড় বৃষ্টি রোদ আর রাত্রি এখানে শুয়ে শুয়ে কাটাতে পাবে। তিমির অভয়ের স্তূপীকৃত বিছানাটায় কাত হইয়া পড়িল।

: হ্যাঁ, আমাদের পক্ষে এই-ই বৈকুণ্ঠ বটে : তারপর জোর একটা হাঁক্ ছাড়িল অভয় : কেষ্টা, এককাপ চা আর দুটো টোষ্ট : তিমিরের দিকে ফিরিয়া বলিল : এই-ই খাও, বেশী কিছু দিয়ে বড়লোকী দেখাবার চেষ্টা ক'রে তোমার কাছে ছোট আর নাই বা হ'লাম্।

তিমির তাড়াতাড়ি বলিল : বারণ করে দাও ভাই, অনর্থক পয়সা নষ্ট হবে, আমার একটুও খিদে নেই।

: এই যে, ক'নে বউএর মত লজ্জাও শিখেছো দেখ্‌ছি।

: হ্যাঁ, এইবার নির্লজ্জ হবো, তাই শেষবারের জন্যে লজ্জাটাকে উপভোগ করে নিচ্ছি।

চা আসিল। অভয় বলিল : নাও, আর বাক্যব্যয় কোরো না।

: না, আর বাক্যব্যয় করবো না, উঠি : বলিয়া তিমির সত্যই উঠিয়া দাঁড়াইল।

: ও কী ! গাঁট্টা খাবার জোগাড় করছো না কী ?

: ও তো ভাল জিনিষ এবার কোন কিছুই আর অসহ্য হবে না ভাই।

: কেবল অসহ্য হোলো আমার চা'টা, না ? গাঁট্টার চাট্নি তো খাওনি কোনদিন : তারপর তিমিরের হাতটা ধরিয়া সজোরে একটা টান দিয়া বলিল : ইয়ার্কি কোরো না, শোনো, তোমার আজকের প্রোগ্রাম আমি ঠিক ক'রে দিচ্ছি। চা'টা খেয়ে নাও, খেয়ে নিয়ে যাও চট্ ক'রে কলঘর থেকে চান্টা সেরে এসো, এসে কচুর ঘণ্ট ভাত দুটো মুখে পুরে আমার ঐ পালঙ্কটায় একটু গড়িয়ে নাও। নিয়ে চলো বিকেলের দিকে যাওয়া যাক্ ঝুপ্ঝুপ্ করে একবার মেট্রোর দিকে। আর এখানে খাওয়ার জাঁক দেখে যদি আধপেটাই হ'য়ে থাকো, চলো কাফে-ডি-মণিকোতে উঠে সেটা পুরিয়ে নিতে পারবে। তোমার মানিব্যাগের ব্লাড প্রেসার তো হ'য়েই রয়েছে।

: তাই বুঝি তার অপমৃত্যু হোলো।

: সেকী, পকেট মেরেছে নাকী !

: তাহ'লে ভাবনার আর কী ছিলো ?

: তবে ? অঙ্ক নেমেছে তো ?....তাকে মৃত্যু বোলো না, বেলো রুগ্ন হ'য়েছে। তাহোক্, তোমার কাছে যেটা রুগ্ন আমাদের কাছে সেটা স্বাস্থ্যবান, একশোর নীচে নাম্লেই তোমার মন খারাপ হওয়া স্বাভাবিক। তা যাও একেবারে চানই ক'রে এসো, এগুলো আর খায় না। এই নাও তেল এই সাবান আর এই কাপড়। কোনটাই দামী নয় ব'লে আমি লজ্জা পেলেও তোমার অসুবিধে বোধ করা উচিত নয়, কেন না, ধনী হ'লেও তুমি দেশ-প্রেমিক। যাও যাও, দেরী কোরো না : হাতে ও কাঁধে সব গুঁজিয়া দিয়া অভয় তাহাকে বাহিরে টানিয়া আনিল।

: এত অভ্যর্থনার অর্থ খুঁজে পাবে তো শেষে ?

: তার জন্যে তোমার মাথাব্যথা নেই : তাহাকে টানিতে টানিতে অভয় হুড়্মুড়্ করিয়া সিড়ি দিয়া নামিতে লাগিল।

: দেখো, শেষে যেনো দুঃখিত হ'য়ো না।

: নট্ এ সিঙ্গল্ ওয়াড়্ মোর্, যা বলি বাবার সুপুত্তরের মতন ক'রে যাও : তাহাকে কলঘরের ভিতর ঠেলিয়া দিয়া অভয় দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

তিমির ভিতর হইতে সশব্দে হাসিয়া উঠিল : বাবার সুপুত্তুর...ঠিকই বলেছ, হ্যাঁ বাবার সুপুত্তরই বটে, অভয় তাহ'লে চেনো আমাকে ?

উপরে আসিয়া অভয় শুনিল, তিমির তখনো হাসিতেছে।

এ কী অদ্ভুত হাসি !

তিমির স্নান করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল, যেন ধৌত অঙ্গার।

অভয় একদৃষ্টে তাহার পানে তাকাইয়া আছে।

চুল আঁচড়ানো শেষ করিয়া তিমির বলিল : কিছু আবিষ্কারের চেষ্টা কর্‌ছ কী ?

অভয় গম্ভীর হইয়াছে, বলিল : ব্যাপার কী ? এ হাসিরই বা মানে কী তিমির ?

: অনেক আগেই জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিলো, এখন এতদূর এগিয়ে গেছো যে নিজেকে ধিক্কার দেবার সময় এসেছে।

অভয় শুধু তাকাইয়াই রহিল।

তক্তাটায় বসিয়া তিমির বলিল : বেশী কিছু নয়, ছিট্‌কে পড়েছি। দেখিনি, যে জায়গাটায় দাঁড়িয়েছিলাম তাতে ফাটল ধরে আছে।

: অর্থাৎ ?

: অর্থাৎ আমার ডেফিনেশন্ তোমায় নোতুন ক'রে শিখ্‌তে হবে, আমার বিশেষণ বদলে গেছে।

: মানে ?

: মানে আরো স্পষ্ট করে বল্‌তে গেলে বল্‌তে হবে, যেখানে আমি দাঁড়িয়েছিলাম সেখানে আমি অকারণ। কবে কোন শিশুকালে পবিত্রবাবুর বাড়ীতে আমি অনধিকার প্রবেশ করেছিলাম তার রহস্য আজ উদ্ঘাটিত হ'য়েছে।

অভয়ের চোখে ম্যাজিক-দেখা দৃষ্টি : ও কী বল্‌ছো তুমি।

: হ্যাঁ, ঠিকই বল্‌ছি। যা বল্‌ছি তা আমার ইতিহাস। এতদিন আমার সম্বন্ধে তোমরা যা জান্‌তে বা আমি যা জান্‌তাম, তা ভুল। আমার এতদিনকার বাবা মাকে আমি আজ অনায়াসে বন্ধু বল্‌তে পারি। আমার নোতুন-মার বিষাক্ত নিঃশ্বাসের সঙ্গে আমার আগের পরিচয় ঝরে গেছে।

নির্ব্বাক অভয় তিমিরের পাশে বসিয়া পড়িল।

তিমির বলিল : এই-ই শেষ নয়, বিস্ময়ের আরো আছে। আমার দাবীর সাম্‌নে পবিত্রবাবু আর কিছু লুকিয়ে রাখ্‌তে পারেন নি। আমি ওদের পালিত পুত্র মাত্র। আমার সত্যিকারের মা হ'চ্ছেন একজন ব্রাহ্মণ কন্যা, আর জন্মদাতা ছিলেন একজন মুচি।

অভয় খপ্‌ করিয়া তিমিরের হাতখানা ধরিয়া ফেলিল, বলিল : কাঠের মত শক্ত হ'য়ে ব'সে বল্‌ছো কী করে এ সব!

জিব নেড়ে হা হা করিয়া তিমির হাসিয়া উঠিল।

অভয় একবার সন্দেহের দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে তাকাইল, তারপর বলিয়া উঠিল : তাহ'লে তুমি আত্মহত্যা কর্‌তে।

: প্রতিকারের এ পথটা তখন মনে হয়নি ব'লে আমি দুঃখিত। আরো বল্‌লে আশ্চর্য্য হবে অভয়, রাস্তায় নেবে এসে একটা য়্যাক্সিডেন্ট্‌ তো হোলোই না, গায়ে সামান্য একটু জ্বরও না। কেবল খরগোসের স্পীডে লেইকটার চারপাশে কম্‌সে কম বার বাইশেক চক্কর দিয়েছি। কী জানি, এ শক্তি আমার এতদিন কোথায় ছিলো।

একটু বসিয়া থাকিয়া অভয় বলিল : আছাড় খেয়েছো তাহ'লে কবে?

: কাল দুপুরে।

: কাল তাহ'লে খেলে কী ?

: হাওয়া, আর কলের জল।

: শুলে কোথায় ?

: একটা গুদাম ঘরের পাশে।

ঠাকুর খাবার লইয়া আসিল।

অভয় বলিল : বোসো।

: আমার আধুনিক পরিচয় সম্বন্ধে সচেতন আছো তো ?

অভয় সেকথার জবাব দিল না, বলিল : খাওয়ার কষ্ট হবে সেকথা আজ আর তোমায় নাই বা বল্‌লাম।

খাওয়া শেষ হইল।

অভয় বলিল : ঐ মাদুরটার ওপরেই গ'ড়িয়ে পড়ো। প্রিন্স ব'লে পুরু তোষক খোঁজাখুঁজি করে আজ আর তোমায় লজ্জা দোবো না।

তিমির তক্তায় দেহটা এলাইয়া দিয়া বলিল : না, লজ্জা দিও না। রাস্তায় যারা শুয়ে র'য়েছে আজ আমায় অনায়াসে তুমি তাদের পাশে রেখে আস্‌তে পারো।

: তাই তো, একথা ভাব তে পার্‌ছি না যে তিমির।

: চৌরঙ্গীর বুকে ব'সে একদিন শেয়াল ডাক্‌তো একথাও কী তুমি আজ ভাব্‌তে পারো ?

: আচ্ছা সব জেনে শুনেই তো পবিত্রবাবু তোমায় মানুষ ক'রেছিলেন, তিনি তোমায় ছেড়ে দিলেন ?

তিমির কহিল : না, তিনি আমায় বাঁধ্‌তে চেয়েছিলেন। তিনি বরাবরই চেয়েছিলেন, আমি তাঁর সন্তান হ'য়ে থাকি। সে মহামানবে প্রণাম করি।

: তা সত্ত্বেও তুমি চলে এলে ?

: হ্যাঁ, ঠিক পশু নই ব'লেই আমি শিকল কেটে এলাম। আমার সেখানকার সে অস্তিত্বকে আমি সহ্য করতে পারতাম্ না।

অভয় চুপ করিয়া রহিল। একটু পরেই বলিল : দেখো, এ কথা শুনে তোমার মিনু না মিইয়ে যায়।

তিমির কথা বলিল না। ধীরে ধীরে চক্ষু বুজাইল। বহুরাত্রির অনিদ্রার পর গভীর ঘুমের আরামের মত মিনু যেন তাহাকে চারিদিক হইতে ছাকিয়া আসিয়াছে।

অভয় মিনুর সঙ্গে মিশে নাই। মিশিলে সে এমন কথা কখনই বলিতে পারিত না।

মিনু, বসন্তের মত ক্ষণিকের নয়, বক্ষস্পন্দনের মত প্রতিমুহূর্ত্তের।

ঘুম ভাঙ্গিতেই অভয় তিমিরকে বারান্দায় ডাকিয়া আনিয়া বলিল : আমার বন্ধু বিপিনকে তুমি চেনো তো ? চল, তার ওখান থেকে একবার বেড়িয়ে আসি।

তিমির কী যেন বুঝিল, হাসিয়া কহিল : কেন, নেমন্তন্ন আছে না কী ?

অভয় কহিল : না, তোমার এ অবস্থায় তো আর চুপ ক'রে থাকতে পারি না, কিছু একটা হিল্লের জোগাড় দেখ্‌তে হবে বৈকি। তা ছাড়া এমন বিশ্রী জায়গায় তুমি থাকবে কী ক'রে ? সেখানে গেলে—

: সেখানে গেলে আমায় ইন্দ্রপুরীতে ঢুকিয়ে দেবে নাকি ?

: না, তা না হ'লেও গাটা অন্ততঃ ভাল ক'রে ছড়াতে পারবে, এমন কী থাকতে থাকতে একটা আলাদা ঘরও পেয়ে যেতে পারো। এখানে ঘাড় গুঁজে পা মুড়ে 'দ' হ'য়ে থাকবে এমন অসুবিধের ভিতর তোমায় আমি দেখি কী করে ?

তিমির এক প্রকার বিচিত্র হাসি মুখে আনিয়া কহিল : দেখা শক্ত বৈকি, রূপকথার রাজপুত্তুর সোণার পালঙ্ক ছেড়ে তক্তায় ঘুমুবে—

: বলো, এ কী কম দুঃখের কথা ? সেই জন্যেই বল্‌ছি সেখানে গিয়ে—মানে ব্যারাক হ'লেও এটার চেয়ে সেটা স্বাস্থ্যকর এবং প্রশস্ত। না হ'লে আমার কী, আমি তো ঐ কোনটায় একদম 'জিরো' হ'য়ে প'ড়ে থাকতে পারি।

ঘরে ঢুকিয়া নিজের কাপড়খানা প'রিতে প'রিতে তিমির কহিল : হ্যাঁ, সোণার না হ'লেও একটা কাঠের পালঙ্কও তো সেখানে জুটতে পারবে।

: আর খাওয়া দাওয়াও এখানের থেকে ঢের ভালো সেখানে, এমন গোবিন্দের চচ্চড়ি সেখানে কোনদিনই খাওয়ায় না।

: তা কী খাওয়ায় ? আমাদের মতন প্রিন্স যখন সেখানে গিয়ে উঠতে পারে : বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কহিল : তা হ'লে, তোমার ঘরটায় একটু গঙ্গাজল ছ'ড়িয়ে নিয়ো ভাই।

: ও কী ! তুমি রাগ ক'রছো না কী ?

: তা কী পারি ? তুমি আমার দুর্দ্দিনের একবেলাকারও আশ্রয়দাতা তো বটে। আমি কৃতার্থ।

অভয় ব্যস্ত হইয়া বলিল : তুমি কি ভাবছো, আমি তোমাকে নীচু চোখে—

: যদি দেখে থাকো তাকে শোধরাতে গিয়ে আর নিয়মবিরুদ্ধ কাজ কোরো না অভয়।

অভয় হিম্‌সিম্ খাইয়া উঠিল : সত্যি, আমার বিন্দুমাত্র দোষ নেই তিমির, ঐ হরিচরণ বাবুই— মানে যিনি পাশের ঘরে থাকেন, ম্যানেজার, পূজো-আহ্নিক করেন, তিনিই মানে— তুমি ঘরের ভিতর ব'সে ব'সে এমন চেঁচিয়ে কথাগুলো বল্‌লে —

: ঠিক আছে, তার জন্যে ব্যস্ত হবার কী আছে। তিনি বলেছেন, তুমি বল্‌লেও দোষ ছিল না। দেখো যেনো অনিয়ম কোরোনা, বাঙলা দেশে নিয়মও যেমন অনেক, শৃঙ্খলও তেমন প্রচুর : তিমির সিড়ির মুখে আগাইয়া আসিল।

অভয় পিছনে পিছনে আসিয়া তাহার হাত ধরিল : তুমি এমন ক'রে আমায় ভুল বুঝলে, এ তোমায় অন্যায় তিমির, আমি বল্‌ছি। তুমি আমার সঙ্গে চল, নিশ্চয়ই তোমার একটা সম্মানজনক ব্যবস্থা করে দিতে পারবো।

তিমির হাত ছাড়াইয়া লইল : তা পারবে বৈ কি, তুমি যে আমার অনেকদিনের বন্ধু। তাছাড়া তোমাদের এ সব মহার্ঘ করুণার সুযোগ ছেড়ে দিয়ে আমি বাঁচ্‌বোই বা কেমন ক'রে?

অভয় বলিল : যেও না তিমির, দাঁড়াও, একসঙ্গেই যাবো, তোমার জন্যে—

তিমির সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে চেঁচাইয়া বলিল : চেষ্টা ক'রলেও আর একসঙ্গে যাওয়া যাবে না অভয়, আমি হ'চ্ছি ম্যাগ্‌নেটের রিপাল্‌সিভ্‌ পোল, বিকর্ষণই আমার নিয়ম।

তারপর একেবারে রাস্তায়।

ছয়

অভয় সত্যিই মিনুকে চিনে নাই।

বায়োস্কোপ দেখিতে যাইবে বলিয়া সে প্রজাপতির মত উড়িয়া রাস্তায় নামিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু তিমিরকে দেখিয়াই সে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াছে। বায়োস্কোপের চেয়ে তিমির তার কাছে বেশী নেশার।

শুধু তাহাই নয়, এ কয়দিন সে আসে নাই বলিয়া মিনু অভিমান করিয়াছে এবং নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছে : থাক্, আর ভালোবাসার প্রয়োজন নাই।

যাইতেই যদি হইয়াছিল, বেশ, চিরদিনের মত আজও কেন ছুটি লইয়া যাওয়া হয় নাই ?

যাইলেই হইল নাকি ? পিছনে কী কেহ নাই ?

আর দেশসেবা করিতে হয় বলিয়া কী চেহারাটাও এমনি করিতে হয় নাকী ?

ইস্তিরির ভাঁজের বদলে জামা কাপড়ে এমন এলোমেলো ভাঁজ কেনো ? কোথায় পুঁটলি বাঁধা ছিলো নাকী এসব ? পিঠেতে এতো ধূলোই বা কেনো ? ছিঃ।

আর মুখে একহাত দাড়ি গজিয়ে রাখ্বো দেশের বেশী কিছু উপকার করা হয় নাকী ?

এত কথার উত্তরে তিমির শুধু বলিয়াছিল : চলো আগে কোথাও বসি।

: কেন, অসুখ করেছে নাকী ?

: না, এমন ক'রে হাঁট্তে থাকলে কথা বলা যায় না। মানুষ আর গাড়ী ঘোড়া সাম্লাতেই মন ছ'ড়িয়ে পড়ে, তোমার থেকে দূরে চলে যাই।

কোন পার্কের একটা জনবিরল নিভৃত কোন্ তারা বাছিয়া লইয়াছে। মুখোমুখি বসিয়াছে দুজন। অনেক কষ্টে অনেক দুঃখে তিমির অভিমান

ভাঙাইয়াছে মিনুর। তাহাকে শপথ করিতে হইয়াছে, যেখানেই যাক্ না কেন, আগের মত সে মিনুর কাছ হইতে ছুটি লইয়া যাইবে এবং সদাসর্ব্বদা সে মনে রাখিবে তাহার পিছনে নিবদ্ধ হইয়া আছে বিবশ প্রতীক্ষমান দুটী চক্ষু। জামাকাপড়ের ইস্তিরির ভাঁজ সে কোনদিন নষ্ট করিবে না এবং পিঠে কোনদিন ধূলা লাগাইবে না, আর প্রত্যহ অন্ততঃ একবার করিয়া সে দাড়ি কামাইবে।

ইহাতেও হয় নাই। মাথা ছোঁয়াইয়া তিমিরকে শপথ করাইয়াছে মিনু, কাল সে ৫টা ১৫ মিনিটের সময় তাহার কাছে আসিবেই আসিবে। মিনুর কোন কাজ নাই, মিনু প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে। পরিশেষে বলিয়াছে ঃ এ তোমার ভালোবাসার অগ্নি পরীক্ষা।

তার পর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মিনুর কোলে মাথা রাখিয়া তিমির তাহার ইতিহাস শেষ করিল।

একেবারে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে। এমন কি বাড়ী হইতে নামিবার সময় কোন সিঁড়ির মুখে সে কয় সেকেণ্ড দাঁড়াইয়াছিল তাহাও বাদ না দিয়া। এমন করিয়া কাহারো কাছে সে বলে নাই, বলিবেও না।

ধৈর্য্য ধরিয়া শুনিয়াছে মিনু। শুনিতে শুনিতে সে বিবর্ণ হইয়াছে, শিহরিয়াছে, এবং লোহবাসরে বেহুলার মত আতঙ্কে চেঁচাইয়াও উঠিয়াছে।

সর্ব্বশেষে চৈত্রের ঝরাপাতার মত ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল মিনু ঃ কী হবে এবার ?

তিমির ক্লান্ত। আস্তে আস্তে পাশ ফিরিয়া বলিল ঃ কিছু হবে না মিনু।

ঃ এ কী-ই বা হোলো !

মিনুর কোলের ভিতর মাথাটা ডুবাইয়া দিয়া তিমির কহিল ঃ এই ত আমি বেশ আছি।

মিনু চোখের রঙীন কাচটা খুলিয়া একটু দেখিতে চায় ঃ কিন্তু কী করবে এবার ? পথই তো এবার সর্ব্বস্ব হোলো !

স্তূপীভূত কাপড়ের আড়ালে জড়াইয়া জড়াইয়া তিমির বলিল : উল্টে গেলো মিনু, পথ পথই আছে, সর্ব্বস্ব হ'লে তুমি।

: তা তো হ'লাম্, কিন্তু দিন কাটবে কী ক'রে ?

: আজ যেমন ক'রে কাটছে।

: কিন্তু একী ভালো হোলো ?

: খারাপ হোলো কী মিনু, সব খুইয়ে আমি তোমার কাছে আসার অনন্ত অবসর পেয়েছি।

অনেকক্ষণ কথা কহিল না কেউ। নীরবে সময় কাটিতেছিল। কাপড়ের ভিতর হইতে মুখ বাহির করিয়া তিমির কহিল : এমনটা না ঘ'ট্‌লে জীবনটা যে পরিপূর্ণ আরামের নয় একথা বুঝ্‌তাম কী ক'রে ? বুঝ্‌তাম কী ক'রে যে পৃথিবীটা অসমতল ?

: কিন্তু একেবারে পথের ভিকিরী হ'য়ে গেলে তুমি ?

তিমির কহিল : বজ্রাঘাতের চেয়েও আকস্মিক, না মিনু ?

মিনু তিমিরের কপালের উপর হাতখানা রাখিয়া বলিল : বজ্রাঘাতে মানুষ মরে কিন্তু এতে যে তুমি আধমরা হ'য়ে রইলে।

তিমির আস্তে আস্তে চক্ষু বুজাইল।

মিনু বলিল : কোথা থেকে প'ড়েছো তা দেখা গেলেও, কোথায় গিয়ে প'ড়েছো তা আর দেখা যায় না।

তিমির চোখ খুলিয়া বলিল : পাহাড়ের উচ্চতার চেয়ে খাতটা বেশী গভীর না মিনু ? কল্পনাতীত ?

: কল্পনাতীত না হ'লেও ঘটনাতীত। তুমি চূর্ণচূর্ণ হ'য়ে ছাতু হ'য়ে গেলে না ? এর স্বপ্ন দেখ লেও যে আমি চেঁচিয়ে উঠ্‌তাম্।

কপালে-রাখা মিনুর হাতখানার উপর ডান হাতটা রাখিয়া তিমির বলিল : খাতের নীচে যে তোমার কোল পাতা আছে মিনু, তাই তো চূর্ণ হ'য়ে যাই নি, মৃত্যুর চেয়ে এ যে বেশী বিশ্রামের।

: বেশী বিশ্রামে কী জীবন রুদ্ধ হ'য়ে আস্‌বে না?

: রুদ্ধ হ'য়ে গেলে তুমি প্রাণ দেবে মিনু।

: আমি প্রাণ দোবো কী করে?

মিনুর হাতটা মুঠা করিয়া ধরিয়া তিমির বলিল: তোমার আঙ্গুলের সোণার কাঠি ছুঁইয়ে।

মিনু নিঃশব্দে সাম্‌নে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

একটু নীরব থাকিয়া তিমির বলিল: আচ্ছা মিনু, তুমি আমার সঙ্গে নীচে নেমে আস্‌তে পার্‌বে?

: তোমার সন্দেহ আছে কী?

: আমি যে অশুভ, আমি শূন্য।

: তা জানি।

: আমার হাতে যদি চামড়ার গন্ধ ওঠে মিনু?

আঙ্গুল দিয়া তিমিরের ঠোঁট দুইটা টিপিয়া ধরিয়া মিনু কহিল: চুপ, আমি দুঃখ পাবো।

এরপর তৃতীয় পরিচ্ছেদ একটা রচনা করিবার ইচ্ছা ছিল তিমিরের, কিন্তু অনিবার্য্য রূপে যাহা রচিত হইল তাহা পরিচ্ছেদ নয়, পূর্ণচ্ছেদ। উপসংহার।

মিনু কহিল: তাহ'লে তোমার মাথায় যে আইডিয়াগুলো ছিলো—দরিদ্রসেবা, দেশোন্নয়ন ইত্যাদি, সেগুলো এখন ধামা চাপা রইলো?

: ধামা চাপা থাক্‌বে কেন মিনু? সবই চল্‌বে।

: কেমন ক'রে চ'ল্‌বে? এসব ক'র্‌তে হ'লে তো খালি হাতে হয় না?

: না, তা হয় না, তবে আমার জীবনের বড় মূলধন যদি তুমি হও মিনু, ছোট মূলধনটার জন্যে আমি কখনোই ভাবি না।

মিনু শুধু বস্তুটাকে ছুঁইয়া থাকিতে চায় : ধরো, আমি তোমার সহচরীই হলাম, পথে পথে তোমার সঙ্গে ব্যথা কুড়িয়ে বেড়ালাম, কিন্তু তাতে আসল বস্তুটার খোঁজ তুমি পাবে কী ক'রে ?

গভীর শ্রান্তিতে তিমির চিৎ হইয়া শুইল, কহিল : কী জানি, আজ কেন তোমায় বোঝাতে পারছি না মিনু, তবে বার বার শুধু এই কথাই মনে হ'চ্ছে তুমি যদি আমার সঙ্গে থাকো মিনু, দিকচিহ্নহীন অন্ধকারকেও আমি ভয় করি না।

মিনু জবাব দিল না। শুধু আঙ্গুল দিয়া তিমিরের মাথার চুলগুলা বার কয়েক নাড়িয়া বলিল : উঃ, আজ কত অসহায় তুমি, কী মায়াই যে হ'চ্ছে তোমাকে দেখে।

তিমির চম্‌কাইয়া মিনুর মুখের দিকে চাহিল। মায়া ! একী মীনুর কণ্ঠস্বর ! মিনু কী কাছে বসিয়া আছে !

মিনু আস্তে আস্তে তিমিরের মাথাটা নীচে নামাইয়া দিয়া কহিল : ছিঃ, অমন ক'রে তাকিয়ো না, ঐ দ্যাখো কে আস্‌ছে।

তিমির তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল, বলিল : কে ?

পশ্চিমাকাশে আঙ্গুল বাড়াইয়া মিনু বলিল : অন্ধকার।

: অন্ধকার !

: হাঁ্যা, অন্ধকার। এমন বাহাদুরী ক'রে পবিত্রবাবুর বাড়ীটা হঠাৎ না ছেড়ে এলেই পার্‌তে।

: তাতে তুমি আনন্দ পেতে মিনু ?

: আনন্দ না পেলেও এত দুঃখ পেতাম না।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া তিমির বলিল : আজ রাত কোথায় কাটাবো সে কথা তুমি ভাব্‌ছো না মিনু ?

: ভেবে কী কর্‌বো, আমার ঘরে তো তোমায় শুতে দিতে পার্‌বো না : মিনু উঠিয়া দাঁড়াইল।

: এত শীঘ্রি উঠ্ছো যে? বোসো?

: বা-রে সারা রাত এখানে কাটাবে নাকী?

তিমির হাত বাড়াইয়া মিনুর আঁচলটা ধরিতে গেল: কাটালেই বা মিনু?

মিনু এক-পা পিছাইয়া নাগালের বাইরে গিয়া বলিল: ছিঃ, লোকে চরিত্রহীনা বল্‌বে যে।

: কিন্তু বলার অনেক কথাই র'য়ে গেলো যে মিনু?

আরও দু'পা পিছাইয়া গিয়া মিনু বলিল: সে আরেকদিন হবে।

: কাল তা'হলে নিশ্চয়ই আসছি—৫টা ১৫ মিনিটের সময়।

আরো কয়েক পা পিছাইয়া মিনু বলিল: হ্যাঁ নিশ্চয়ই: তারপর হঠাৎ থামিয়া একটু চিন্তা করিয়া কহিল: ও মাই গড্, কাল যে আমার ব্যাড্‌মিণ্টনের ফাইন্যাল, একদম্ ভুলে গেছি।

তিমির হাসিল: তবে পরশু?

: পরশু যে আমরা শিলং যাচ্ছি।

: ও, তারপর, সেখান থেকে? আর কোথাও না কী?

: না, সেখান থেকে এখানে, তুমি বরং ও মাসের মাঝামাঝি ক'রে এসো একদিন।

তিমির একটা অদ্ভুত কণ্ঠে হাসিয়া উঠিল, বলিল: কিংবা জীবনের যে কোনো একদিন! কেমন?

: না ঠিক ও মাসের মাঝামাঝি এলে নিশ্চয়ই দেখা হবে: বলিয়া মিনু পিছন ফিরিয়া চলিতে লাগিল।

তিমির চেঁচাইয়া বলিল: না এলে হে বিরহিনী, যেনো আত্মহত্যা কোরো না।

পার্ক হইতে বাহির হইয়া তিমির সোজা পথ ধরিল উত্তরমুখো।

হে জ্যোতি দেদীপ্যমান! নমো নমো।

তিমির মনে মনে বিদায় লইতেছে আলোর দেবতার নিকট হইতে। দ্বিখণ্ডিত তিমির। সে তিমিরে আলো ছিল, এ তিমির অন্ধকার।

বক্ষস্পন্দন থামিল না, দেহ পরিবর্ত্তিত হইল না, তবুও নবজন্ম। অভিনব! এতদিন সে চলিয়াছিল আলো সাম্‌নে লইয়া, এবার সে চলিবে আলো পিছনে রাখিয়া। দ্রুতপদে চলিতে চলিতে সে ভাবিতে লাগিল, জীবনের মধ্যপথে আসিয়া আবার সে নবযাত্রা সুরু করিল। নূতন বিশ্বে, নূতন পথে। জীবনেতিহাসের প্রথম কয়টা পরিচ্ছেদ আজ নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গেল। এবার শুধু দূর হইতে স্বপ্নের মত মাঝে মাঝে মনে পড়িবে সেই ঐশ্বর্য্যের উত্তুঙ্গ শিখর, আকণ্ঠ সুখস্মৃতি, আর দিকে দিকে মুঠা ভরিয়া দান। আর মনে পড়িবে পবিত্রবাবু ও সাবিত্রী দেবীর বাৎসল্য স্নেহ, অভয়ের মত বন্ধুদের বন্ধুতা, আর মিনুর প্রেম; এবং আরো কত আলোর দিনের চোখ-ধাঁধানো ঝল্‌কানি। আজ আর সে কাহারো স্নেহের নয়, কাহারো প্রেমের নয়, কোন অভিন্নহৃদয়ের নয়; কারো বরণীয় নয়, কারো পূজনীয় নয়, কারো সম্মানার্হ নয়। সে কক্ষচ্যুত। সে আর নয় কোন উৎসবের, নয় কোন মঙ্গলের, নয় কোন আহ্বানের; সে নয় কোন সভার, নয় কোন সঙ্গীতের, নয় কোন সুরের। সে ছিন্নতন্ত্র। সে বৃন্তচ্যুত, শুষ্ক, পদদলিত, নিক্ষিপ্ত। সে শিশির-স্নাত নয়, ধূলিমলিন। খোলা কই তার সাম্‌নে আজ দেউলের পথ, উৎসবের বাতায়ন, যজ্ঞভূমের দ্বার? কই তার পাশে মানুষেরা? যারা এতদিন ভিড় করিয়াছিল তার চারিদিকে, ছুঁইয়াছিল তার আপাদমস্তক! দেব দেবীরা বা কই? সে অবাধ-প্রসারিত অস্তিত্ব তার মিলাইয়া গিয়াছে। সে শুধু আজ অকারণ আবর্জ্জনা, ক্লেদ ক্লিন্ন একটা ময়লার স্তূপ—অপবিত্র অসহ্য। সমাজ তাই তার পবিত্র বক্ষ হইতে তাহাকে সাফ করিয়া দিয়াছে। সে আজ নিখিল সংসারের নৈবেদ্যের ডালায় স্পর্শের, আনন্দের বা উপভোগের কিছু নয়, সে আজ অগ্রহণীয়, দুষ্পাচ্য; পরিচিত বিশ্বের বদহজম।

দুঃখের কিছুই নাই। ভালই হইয়াছে। নীচে নামিয়া আসিয়া জীবনের গুরুভার কাটাইয়া সে লঘু হইতে পারিয়াছে। আজ আর সীমা নাই, বন্ধন নাই, এবার আপনার একান্তে সে আপনাকে পরিব্যাপ্ত করিবার সুযোগ পাইবে। রাত্রিকে তাহার আর ভয় নাই ; দুর্য্যোগ দুর্দ্দিনকে সে ডরাইবে না ; শূন্য হইতে নামিয়াছে, পতনের আর ভয় নাই ; আশা-নিরাশার ঘূর্ণীপাকে সে হাবুডুবু খাইবে না ; এবার সে শুধু পথে পথে দিকে দিকে পথের ধূলি-জঞ্জালের মত উড়িয়া বেড়াইবে। আপনার মসীলিপ্ত চক্ষু দুইটী নত করিয়া গভীরতম অন্ধকারের আড়ালে থাকিয়া থাকিয়া সে শুধু জীবনের বহুতর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া ফিরিবে। যখন ক্লান্ত হইবে, কোথাও বসিয়া বিশ্রাম করিবে, না হয় কোনও অনির্ণীত ধরিত্রীর ধ্যানমৌন বিজনপ্রান্তে বসিয়া আপন মর্ম্মদেবতার সকরুণ বিলাপধ্বনি সঙ্গীতের মত শ্রবণ করিতে করিতে নিঃশব্দে নীরবে ঘুমাইয়া পড়িবে।

তাহাকে ভ্রান্তপথ হইতে ফিরাইয়া দিল যে নারী, জীবনে তাহার মূল্য সে অস্বীকার করিবে কী করিয়া ?

তিমির দ্রুত পায়ে চলিয়াছে সোজা উত্তর দিকে।

চুপি চুপি হেগে রেখে গেছে
ভাঁড় হইতে মাখন চক্‌চক্ করিয়া

সাত

ইহার পর একটা দীর্ঘ দিনের অবগুণ্ঠন—প্রায় পুরা একটা বছরের।

অবগুণ্ঠন অপসারিত করিয়া দেখা গেল, আহিরীটোলায় একটা সঙ্কীর্ণ গলির নীচেকার একটা ঘরের চারপাশে একটু একটু করিয়া ভোর হইতেছে। শেষের শীতের কুহেলিকাচ্ছন্ন মন্থর মৃদু ভোর। ঘোমটা-ঢাকা স্খলিত-চরণা কুণ্ঠিতা বধূর মত।

ঘর—দৈর্ঘ্যে চার হাত প্রস্থে চার হাত, তিন পাশে পাকা দেয়াল, আর এক পাশে কাঠের। টিনের কপাট। পূবদিকে একটা ছোট্ট জানালা। মেঝের সিমেণ্ট উঠিয়া মাঝে মাঝে গর্ত্ত হইয়াছে। তিনপাশের দেয়াল হইতে ঝুরঝুর করিয়া মাঝে মাঝে বালিকাজ ঝরিয়া পড়ে।

ইহারই মধ্যে দুইপাশে দুইটা মাদুর পাতিয়া দুইটী প্রাণী পরমানন্দে নিদ্রা দিতেছে।

মিনিট কুড়ি পরে একটু নড়িয়া চড়িয়া শুইতে যাইয়া তিমিরের ঘুম ভাঙিল। বালিশ হইতে মাথাটা তুলিয়া চোখ দুইটা আধখোলা করিয়া দেখিল, ঘরে এখনো গভীর রাত্রি। তখনি সে চোখ দুইটা বুজাইয়া পাশ ফিরিয়া বালিশের উপর আবার ঝুপ্ করিয়া পড়িয়া গেল। পা দুইটা দুমড়াইয়া বুকের কাছে আনিয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া আবার সে এক পশ্‌লা নাক ডাকাইতে সুরু করিল।

সত্যই যখন তাহার ঘুম ভাঙিল তখন আরো আধ ঘণ্টা কাটিয়াছে। চোখের পাতায় আর একটুও জড়তা নাই। পঞ্চইন্দ্রিয় সজাগ হইয়া উঠিয়াছে। চিৎ হইয়া শুইয়া হাত দুইটা বুকের উপর রাখিয়া সে কড়িকাঠের দিকে তাকাইয়া রহিল। ভাবিতে লাগিল, প্রকৃতপক্ষে ঘুমের মত এমন [illegible]ত্রী বন্ধু জগতে আর দুটী নাই। যাহারা ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাস করিতে [illegible]; পরিচিত বিশ্বের [illegible] করিলে উপকার পাইবে। রূপ রস শব্দ গন্ধ [illegible]

উঠিলে তৎক্ষণাৎ নিদ্রিত হইয়া পড়া দরকার। সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চইন্দ্রিয়ের নির্ব্বাণ অবশ্যম্ভাবী। তিমিরের মনে পড়িল, মাস ছয়েক আগে রাস্তায় ভ্রমণকালে এক অভিজাত বংশীয় রমণীর বিলম্বিত বেণীর চিত্তহারী গন্ধে সে কী ভয়ঙ্কর ভাবে নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছিল এবং ছুটিয়া মনুমেণ্টের তলায় গিয়া চিৎ হইয়া পড়িয়া একটা সুদীর্ঘ ঘুমের ভিতর দিয়া কিরূপে পুনরায় সে সজীবতা লাভ করিয়াছিল।

ঘাড় ফিরাইয়া তিমির দেখিল, মাখন তাহার মাদুরে বসিয়া পকেট হইতে কড়াইভাজা বাহির করিয়া চিবাইতেছে।

চিবাইতে চিবাইতে মাখন জিজ্ঞাসা করিল: খাবি নাকি?

: উঁহু।

: তা খাবি কেন, কাল রাতে যে ভাত খেয়েছিস।

: শুধু ভাত নয়, ডাল আর ভাত।

: ওঃ, তা হ'লে তো ভেলাটা বেঁধেছে ভাল।

'ভেউ' করিয়া একটা ঢেকুর তুলিয়া তিমির উঠিয়া বসিল।

: ঢেকুরে কিসের গন্ধ রে? ভাতের না ডালের?

: ঘুমের।

: তাহ'লে তো এরি মধ্যে গিলে মেরেছ সব।

: ঘুমের ঐ টুকুই যা দোষ, বদহজম মোটে হ'ট্‌তে দেয় না।

তিমির উঠিয়া দাঁড়াইয়া জামাটা গায়ে গলাইতে লাগিল।

মাখন পকেটটা ঝাড়িয়া ভুক্তাবশিষ্ট যাহা ছিল বাহির করিয়া মুখে ফেলিয়াই মুখ বাঁকাইয়া উঠিল: এঃ, ব্যাটা আরশুলা ঢুকেছিল নাকি পকেটে!

: কেন, আমেজ পাচ্ছো নাকী?

: নাঃ, শালাদের জ্বালায় মলাম্—তাই খাবি তো খা বাবা দুটো, না, চুপি চুপি হেগে রেখে গেছে শালারা: কোনে বসানো ছোট্ট একটা মাটির ভাঁড় হইতে মাখন ঢক্‌ঢক্ করিয়া এক পেট জল খাইয়া ফেলিল।

: তা হ'লে তো খাটি নবাবীখানাই জুটেছে দেখ্‌ছি তোমার। খাবার পরেই মুখশুদ্ধি: বলিয়া জুতাটা পায়ে লাগাইয়া তিমির ঘরের বাহির হইয়া আসিল এবং সঙ্গে সঙ্গে মাখনও।

রাস্তায় পড়িয়া তাহারা দেখিল, সকাল গড়াইয়া বেলা হইয়া গিয়াছে। তাহারা আশ্চর্য্য বোধ করিল না। কারণ তাহারা জানে ঘরে যখন তাহাদের ভোর হয় বাহিরে তখন বেলা দশটা। এই অন্ধকারকে ঘড়ি করিয়া আলোর প্রহর গুণিতে তাহারা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে।

: আজ কোন্‌দিকে যাবি তুই? মাখন জিজ্ঞাসা করিল।

তিমির কহিল: দক্ষিণে।

: আমি তাহ'লে উত্তরে। ফির্‌তে আজ বেশী রাত করিস্‌নে, বোধ হয় একটা টাকা পাওয়া যাবে আজ, নিধেরামের দোকানে উঠে ডালপুরী খাবো দুজনে।

ঘাড় নাড়িয়া তিমির সোজা দক্ষিণ মুখে চলিয়া গেল।

মাখনের সহিত বন্ধুত্ব তাহার আট মাসের। একদা রাত্রির অন্ধকারে পাহারাদার পুলিশের হাত এড়াইয়া এ গলি সে-গলি ঘুরিয়া সে যখন একটা সুবিধা মত বিশ্রামের স্থান অন্বেষণ করিতেছিল তখন মাখন তাহাকে ডাকিয়া লইয়া তাহার ঘরে আশ্রয় দিয়াছিল। সেই হইতেই তিমির তাহারই ঘরে রাত্রিযাপন করিতেছে। মাখনের চরিত্রে নানা ত্রুটি সত্ত্বেও তিমির তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই। তাহার প্রধান কারণ, মাখনের রোজগার ছিল বেশী। সে দিক দিয়া সে তাহার কাছে বেশ কিছু সুবিধা পাইত। তা ছাড়াও উভয়ের প্রতি উভয়ের একটা আকর্ষণ ছিল। অন্য কিছু নয়, হতভাগ্যের প্রতি হতভাগ্যের যে আকর্ষণ। গরমিল হইত দুদিন ছাড়া, বনিবনাও হইতে দেরী হইত না। এক একদিন মাখন পেট পুরিয়া মদ খাইয়া ফেলিলেও তিমির তাহা অসহ্য মনে করিত না।

চলিতে চলিতে তিমির দেখিল, পথের দুইপাশ দিয়া পিপীলিকার সারের

মত দলে দলে মানুষেরা চলিয়াছে। বইখাতা হাতে স্কুল কলেজের ছেলে মেয়ে, অফিসের বাবু, শিক্ষক শিল্পী ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার উকিল এটর্ণি, দোকানী পসারী কারিগর মিস্ত্রী—মাঝে মাঝে কুলী মুটে মজুর নগ্ন ভিক্ষুক, আর সে। ঈগলের মত উড়িয়া ফিরিতেছে ইংরাজ বাঙালী মাড়োয়ারী খোট্টা উড়িয়া পাঞ্জাবী। টাল্ সাম্লাইতে সাম্লাইতে পথের উপর ছুটিয়াছে ট্রাম বাস রিক্সা আর ঠেলা। অদ্ভুত চঞ্চলতায় পাক্ খাইতে খাইতে সমস্ত নগরীটা যেন নির্নীরীক্ষ্য গতিবেগে উর্দ্ধমুখ হইয়া কোথায় ছুটিয়া চলিয়াছে। এত সবের অন্তরালে তিমির আর কিছুই দেখিতে পাইল না, শুধু সেই সর্ব্বনাশী ক্ষুধার ঘোম্‌টাটানা পিঙ্গল চক্ষু দুইটী ছাড়া।

সেও একদিন খাতা বগলে কলরব করিতে করিতে উহাদেরই মত বিদ্যালাভ করিতে গিয়াছিল। সেদিন সে ছিল ধনী এবং অভিজাত বংশের। তাহারো সেদিন ছিল উদ্ভাসিত আনন্দোজ্জ্বল একখানি মুখচ্ছবি।

গরম ভাত খাওয়া আর পান চিবানোর আরাম দেখিয়া মাস দুই আগে তাহারও একবার অফিসের বাবু হইবার নেশা লাগিয়া গিয়াছিল। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় অর্দ্ধপথের বেশী আর সে যাইতে পারে নাই। অর্দ্ধেক লিখিবার পর যে কারণে সেদিন সে দরখাস্তখানি হঠাৎ ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিল, তাহা মনে পড়িবামাত্রই আজ তাহার মন্থর পদ সহসা দ্রুত হইয়া উঠিল। হেঁট মুখে চলিতে চলিতে তাহার মনে হইল পথের জনতা হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িয়া সকৌতুকে যেন তাহার পানে চাহিয়া হাসিতেছে। বাঁ দিকের মোড় ঘুরিয়া টপ্ করিয়া একটা গলির মধ্যে ঢুকিয়া সে জনতার কাছ হইতে দূরে সরিয়া আসিল। এড়াইয়া চলা তাহার নীতি। মানুষের পানে মুখ তুলিয়া চাহিবার অভ্যাস সে জোর করিয়া পরিহার করিয়াছে। সঙ্কুচিত হইয়া চলা ঢের ভাল, কাহারো সহিত সঙ্ঘর্ষের ভয় নাই। নিজের আবিল অস্তিত্বকে প্রসারিত করিয়া অপরের ভ্রূকুটিভাজন হওয়া আত্মসম্মান বিসর্জ্জন দেওয়ারই নামান্তর। কোনওখানে যাহার কেহ নাই অবিচার তাহারই প্রাপ্য। সর্ব্বত্র যে অধিকার

হারাইয়াছে ধূলায় তাহার অধিকার চির দিনের। যে অপরকে ঘৃণা করিতে শিখে নাই সে ঘৃণ্য। যে শিশু জন্মিবার সময় জন্মস্থান বাছিয়া লইতে পারে নাই বড় হইয়া তাহার স্থান বাছিবার অধিকার সে হারাইয়াছে। জন্মের পূর্ব্বে যে শিশু পিতামাতার অবৈধ মিলনকে ঠেকাইতে পারে নাই বড় হইয়া সে দেখিবে জীবনের নৌকা তাহার অচিরেই ঠেকিয়া গিয়াছে।

তাহার নবজন্মে সে যে অভিজ্ঞতর হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে ইহাতে তিমির মনে মনে আনন্দিত হইয়া উঠিল।

: এই যে, সেদিন খেয়ে গেলেন পয়সাটা আজও দিয়ে গেলেন না ? : পিছন হইতে খপ্ করিয়া কে তাহার বাঁ হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়াছে।

তিমির ফিরিয়া দেখিল মিষ্টি দোকানী। যাঃ, ভুলক্রমে সে এই পথেই আসিয়া পড়িল! তাড়াতাড়ি বলিল : হ্যাঁ, মানে, আস্‌বার সময়ই পাই নি কিনা।

: আজ তো পেয়েছেন, চলুন, ওটা মিটিয়ে দেবেন।

তিমির ইতস্ততঃ করিয়া বলিল : কিন্তু, আজ আর এক জনকে দেওয়ার কথা ছিলো—

: আর, আমার কাছ থেকে বুঝি বরাবরই পাওয়ার কথা ?

: না, তা নয়—মানে, অন্য একদিন—

: ওরে বাপ্, অনেক কষ্টে ধরেছি, মানুষ তো নয়, পাঁকাল মাছ : বলিয়া দোকানী তিমিরকে টানিয়া দোকানের ভিতর আনিয়া বলিল : কই বার করুন্।

তিমির বিপদগ্রস্থের মত খানিকটা দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিল : তবে নিন্, কী আর করা যাবে : বলিয়া পকেটে আস্তে আস্তে হাত ঢুকাইয়াই একেবারে আঁৎকে করিয়া উঠিল : অ্যাঁ !

: কী হোলো !

চোখ্ দুইটা গোলাকার করিয়া তিমির কহিল : গেছে।

দোকানী হতাশ হইয়া বেঞ্চের উপর বসিয়া পড়িল। সাম্‌নেই যে দুই চারিজন ক্রেতা দাঁড়াইয়াছিল তাহাদের উদ্দেশ করিয়া কহিল: দেখ্‌লেন মশাই কাণ্ডটা! সাতটা পয়সার খাবার খেয়ে দম দিলে এক হপ্তা। সেদিন তো জোচ্চোরে ব্যাগ বার ক'রে নিয়েছে ব'লে ছ'ট্‌কে পালালো, আজ আবার শুন্‌ছেন কথাটা?

একদিন একটা আধপোড়া সিগারেটের অর্দ্ধেকটা খাইয়া বাকীটার আগুন না নিভাইয়াই ভুলক্রমে সে সেটাকে পকেটে সঞ্চয় করিয়া ফেলিয়াছিল। তাহাতে পকেটের তলায় যে ফুটোটা হইয়াছিল আজ এই অসময়ে তিমির সেটাকে কাজে লাগাইল। ছ্যাদার ভিতর সটান হাতটা গলাইয়া দিয়া সে কহিল: আজ বার করেনি, বেরিয়ে গেছে।

ক্রেতাদের পানে তাকাইয়া দোকানী পুনরায় কহিল: দেখ্‌লেন্, দেখ্‌লেন মশাইরা—

সেদিকে কান না দিয়া তিমির দুঃখিত মনে যেন স্বগতোক্তি করিতে লাগিল: আহা! অগ্নিমুখী সিগারেট্ আমার! কী পথই তুমি তৈরী ক'রে গেছ।

দোকানী আর থাকিতে পারিল না, গল্‌দা চিংড়ীর মত লাফাইয়া উঠিয়া কহিল: ও সব পিঁয়াজি চল্‌বে না চাঁদ, পয়সা ফেলে তারপর অন্যকথা, না থাকে গতর খাটিয়ে শোধ দাও। বিনা পয়সায় খেতে দেবে কে এমন কুটুম আছে হে?

: কেউ নেই। তা যদি বলেন তো না হয় গতরে খেটেই—

: হ্যাঁ, সেই-ই ভাল—এখন বারোটা, এই বারোটা থেকে সন্ধ্যে সাতটা অব্দি—কী কর্‌তে পার্‌বে তুমি? বাসন কোষন ধুতে পার্‌বে?

: আপনার বাসন আছাড় খেলে ভেঙ্গে যায় না তো?

: ও বাবা! ওদিকেও লক্ষ্মীমন্ত দেখ্‌ছি। সালপাতার ঠোঙা গাঁথতে পার্‌বে,

সা... মাথা ...তো?

পালা, পালা, চাই...পা যেমন ক'রে গাঁথে সেই রকম তো?

তিমির হেঁট হ

হারাইয়াছে ধূলায় তাহার অধিকার চির দিনের। যে অপরকে ঘৃণা করিতে শিখে নাই সে ঘৃণ্য। যে শিশু জন্মিবার সময় জন্মস্থান বাছিয়া লইতে পারে নাই বড় হইয়া তাহার স্থান বাছিবার অধিকার সে হারাইয়াছে। জন্মের পূর্ব্বে যে শিশু পিতামাতার অবৈধ মিলনকে ঠেকাইতে পারে নাই বড় হইয়া সে দেখিবে জীবনের নৌকা তাহার অচিরেই ঠেকিয়া গিয়াছে।

তাহার নবজন্মে সে যে অভিজ্ঞতর হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে ইহাতে তিমির মনে মনে আনন্দিত হইয়া উঠিল।

: এই যে, সেদিন খেয়ে গেলেন পয়সাটা আজও দিয়ে গেলেন না ? : পিছন হইতে খপ্ করিয়া কে তাহার বাঁ হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়াছে।

তিমির ফিরিয়া দেখিল মিষ্টি দোকানী। যাঃ, ভুলক্রমে সে এই পথেই আসিয়া পড়িল! তাড়াতাড়ি বলিল : হ্যাঁ, মানে, আস্‌বার সময়ই পাই নি কিনা।

: আজ তো পেয়েছেন, চলুন, ওটা মিটিয়ে দেবেন।

তিমির ইতস্ততঃ করিয়া বলিল : কিন্তু, আজ আর এক জনকে দেওয়ার কথা ছিলো—

: আর, আমার কাছ থেকে বুঝি বরাবরই পাওয়ার কথা ?

: না, তা নয়—মানে, অন্য একদিন—

: ওরে বাপ্, অনেক কষ্টে ধরেছি, মানুষ তো নয়, পাঁকাল মাছ : বলিয়া দোকানী তিমিরকে টানিয়া দোকানের ভিতর আনিয়া বলিল : কই বার করুন্।

তিমির বিপদগ্রস্থের মত খানিকটা দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিল : তবে নিন্, কী আর করা যাবে : বলিয়া পকেটে আস্তে আস্তে হাত ঢুকাইয়াই একেবারে আঁক্ করিয়া উঠিল : অ্যাঁ!

: কী হোলো!

চোখ্ দুইটা গোলাকার করিয়া তিমির কহিল : গেছে।

দোকানী হতাশ হইয়া বেঞ্চের উপর বসিয়া পড়িল। সাম্‌নেই যে দুই চারিজন ক্রেতা দাড়াইয়াছিল তাহাদের উদ্দেশ করিয়া কহিল : দেখ্‌লেন মশাই কাণ্ডটা ! সাতটা পয়সার খাবার খেয়ে দম দিলে এক হপ্তা। সেদিন তো জোচ্চোরে ব্যাগ বার ক'রে নিয়েছে ব'লে ছ'ট্‌কে পালালো, আজ আবার শুন্‌ছেন কথাটা ?

একদিন একটী আধপোড়া সিগারেটের অর্দ্ধেকটা খাইয়া বাকীটার আগুন না নিভাইয়াই ভুলক্রমে সে সেটাকে পকেটে সঞ্চয় করিয়া ফেলিয়াছিল। তাহাতে পকেটের তলায় যে ফুটোটা হইয়াছিল আজ এই অসময়ে তিমির সেটাকে কাজে লাগাইল। ছ্যাঁদার ভিতর সটান হাতটা গলাইয়া দিয়া সে কহিল : আজ বার করেনি, বেরিয়ে গেছে।

ক্রেতাদের পানে তাকাইয়া দোকানী পুনরায় কহিল : দেখ্‌লেন্, দেখ্‌লেন মশাইরা—

সেদিকে কান না দিয়া তিমির দুঃখিত মনে যেন স্বগতোক্তি করিতে লাগিল : আহা ! অগ্নিমুখী সিগারেট্ আমার ! কী পথই তুমি তৈরী ক'রে গেছ।

দোকানী আর থাকিতে পারিল না, গল্‌দা চিংড়ীর মত লাফাইয়া উঠিয়া কহিল : ও সব পিঁয়াজি চল্‌বে না চাঁদ, পয়সা ফেলে তারপর অন্যকথা, না থাকে গতর খাটিয়ে শোধ দাও। বিনা পয়সায় খেতে দেবে কে এমন কুটুম আছে হে ?

: কেউ নেই। তা যদি বলেন তো না হয় গতরে খেটেই—

: হ্যাঁ, সেই-ই ভাল—এখন বারোটা, এই বারোটা থেকে সন্ধ্যে সাতটা অব্ধি—কী কর্‌তে পার্‌বে তুমি ? বাসন কোষন ধুতে পার্‌বে ?

: আপনার বাসন আছাড় খেলে ভেঙ্গে যায় না তো ?

: ও বাবা! ওদিকেও লক্ষ্মীমন্ত দেখ্‌ছি। সালপাতার ঠোঙা গাঁথতে পার্‌বে,

সা ... মাথা ... তা ?

পালা, পালা, চাই ... পা যেমন ক'রে গাঁথে সেই রকম তো ?

তিমির হেঁট হ

দোকানী বুঝিল তাহাও সে পারিবে না, তখন সে দাঁত খিঁচাইয়া উঠিল ঃ তবে কী পচা রসগোল্লার মাছি তাড়াবে ?

ঃ তা যদি বলেন তো—

দোকানী আর কথা বলিল না, তাহাকে টানিয়া লইয়া একেবারে পাকশালায় প্রবেশ করিল। হাতে একটুকরা কাগজ পেন্সিল দিয়া সামনের একটা বেঞ্চির উপর ঠেলিয়া বসাইয়া দিয়া কহিল ঃ বোসো, গুদাম থেকে কত আটা চিনি ঘি বেরোচ্ছে তার হিসেব রাখো—কোথাও নড়তে পাবে না, একটানা সন্ধ্যা সাতটা অব্দি, একচুল ভুল না হয়, ভুল হ'লে আট্‌কে রাখা হবে সাতদিন, মনে থাকে যেনো ঃ বলিয়া দোকানী বাহির হইয়া গেল।

ওদিকে চড়িয়াছে রসগোল্লা লেডিকানি, আর এদিকে লুচি আর তরকারী। লুচি তরকারী নামিলেই নিম্‌কি আর সিঙ্গারা এবং রসগোল্লা লেডিকানি নামিলেই বুঁদে আর রসকরা সুরু হইবে। পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া তিমির আরামে দেখিতে লাগিল চক্রাকার লুচি বৃত্তাকার রসগোল্লা আর ডিম্বাকৃতি লেডিকানি। ওদিকে কড়াইএর উপর গরম ঘি'র কল্লোলে কর্ণ মুখর হইয়া উঠিয়াছে। নানা সুখাদ্যের মিশ্রিত গন্ধে বাতাস ভারী হইয়া উঠিল। ময়রা দোকানের পাক্‌শালায় ঢুকিতে পারিলে যে চক্ষু কর্ণ নাসিকার এত সুখ হয় তিমির তাহা জানিত না। সে দেয়ালে ঠেস্ দিয়া নিঃশব্দে নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত করিয়া রহিল। আবার চোখ বুজাইলে নাকি বেশী আরাম হয়, তাই সে চোখও বুজাইল। পরিপূর্ণ আরামে তাহার মুখে ক্ষণে ক্ষণে হাসি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

ঘণ্টা কয়েক পরে দোকানী আসিয়া দেখিল, বেঞ্চের উপর চিৎ হইয়া হিসাব-রক্ষক ঘুমাইতেছে।

মগজ গরম হইয়া উঠিল দোকানীর। এক ধাক্কায় তাহাকে বসাইয়া দিয়া সে কহিল ঃ তোমায় হাত ধ'রে এখানে এনে বসানো হোলে[illegible] জামাই আদর করা হ'চ্ছে ?

চোখ রগ্‌ড়াইয়া তিমির কহিল : না, তবে আর একটু জেগে থাকলেই ভাবতাম্‌।

দোকানী চেঁচাইয়া উঠিল : এই জন্যেই ধ'রে আনা হোলো তোমাকে সোনার চাঁদ?

তিমির কহিল : না ঘুমোলে প্রমান হোতো কী ক'রে যে আমি বেহিসেবী?

দোকানী পুনরায় তাহাকে বহিরে টানিয়া আনিল। এখানে ওখানে বহু ভদ্রলোক তখন খাইতে বসিয়াছেন। একজায়গায় আনিয়া দোকানী বলিল : খোলো জুতো খোলো।

তিমির জুতা খুলিয়া দাঁড়াইল।

: যাও, কোন্‌ ভদ্রলোক কী চান ভিতর থেকে এনে দাও, আর আমাকে বল ;—ঐ ঐ ভদ্রলোক চাচ্ছেন, আটটা সিঙ্গারা আর চারটে নিম্‌কি...যাও, যাও, নিয়ে এসো গিয়ে জল্‌দি।

তিমির ভিতরে চলিয়া গেল এবং সিঙ্গাড়া নিম্‌কি লইয়া আসিয়া পুনরায় দাঁড়াইল।

: যাও, জগন্নাথের মত দাঁড়িয়ে থাকলে কী হ'বে? দিয়ে এসো সেখানে।

তিমির তবু কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর দোকানীর কাছে সরিয়া আসিয়া তাহার কানে কানে ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া বলিল : জগন্নাথ হ'লে তো চলেই যেতাম্‌ কিন্তু আমি দিলে চল্‌বে কি? আমি কিন্তু জাতে মুচি।

দোকানী একেবারে তিড়িং করিয়া ছিট্‌কাইয়া উঠিল, পেটে যেনো কে বল্লমের খোঁচা মারিয়াছে। কিন্তু চেঁচাইতে পারিল না। গলা নামাইয়া সভয়ে বলিয়া উঠিল : বলিস্‌ কি! পালা পালা, বজ্রাঘাত প'ড়বে যে আমার দোকানের মাথায়, সব খ'দ্দের ভেগে যাবে এখুনি...গোল করিস নে বাপু, পালা, পালা, চাইনা আমার সাতটা পয়সা।

তিমির হেঁট হইয়া ঠোঙাটা রাখিতে গেল। দোকানী আরও আঁৎকাইয়া

উঠিল : ছোঁওয়া কোথায় রাখছিস্ আবার! কে কোথায় শুন্‌তে পেলো নাকি! পালা, পালা, কী সর্ব্বনাশ!

: তাহ'লে পয়সাটা শোধ হ'য়ে গেলো তো ?

দোকানী হাত জোড় করিয়া অনুনয় করিয়া বলিল : দোহাই বাবা, কোন কথা নয়, আগে তুই পালা, আমায় রক্ষে কর্।

জুতাটা আবার পায়ে গলাইয়া তিমির হাসিতে হাসিতে দোকান হইতে নামিয়া আসিল। খাবারের ঠোঙাটা দুই হাতে বেশ শক্ত করিয়া ধরিয়াছে, যেন না পিছলাইয়া যায়।

কিছুদূর চলিয়া আসিয়া সে মাথার উপর তাকাইয়া দেখিল কোন চিল উড়িতেছে কিনা। তারপর আস্তে আস্তে ঠোঙাটা খুলিল। সিঙ্গারাগুলির দেহ হইতে তখনো উত্তাপ উঠিতেছে। কী সৌভাগ্য, আজ দোকানী তাহাকে পয়সা-না-দেওয়ার অপরাধে গতর খাটাইতে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। পয়সা না দিয়া সে যে এতখানি বুদ্ধিমানের কাজ করিয়া রাখিয়াছিল তাহা তো সে এতদিন বুঝিতে পারে নাই। তাহা ছাড়া তাহার আধুনিক পরিচয়েও যে এতখানি মহিমা লুকাইয়া আছে তাহারই বা খোঁজ এতদিন কে রাখিত ? সে ভাবিল, কত জন্ম জন্ম সুকৃতির ফলে না সে আজ মুচি হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

অতি সন্তর্পণে ঠোঙা হইতে একটী একটী সিঙ্গারা বাহির করিয়া সে মুখের ভিতর ফেলিতে লাগিল।

গলি পার হইয়া সে আবার একটী বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িল। ইংরাজী বাজনা এবং ঝম্প সংযোগে বিস্তর ঘটা করিয়া দূরে একটী শোভা যাত্রা বাহির হইয়াছে। বর হয়ত।

লক্ষ্য করিয়া দেখা গেল বর নয়, মড়া।

সাম্‌নে একটী লোক একটী চ্যাঙারি হইতে মুঠা মুঠা খই লইয়া ছড়াইতেছে এবং তাহার সাম্‌নে সাম্‌নে ছুটিতেছে একপাল ভিক্ষুক।

কাছে আসিতে দেখা গেল শুধু খই নয় তাহার সঙ্গে আছে পয়সা ডবল পয়সা, আনি, এবং দুয়ানিও। ছুঁড়িবার সঙ্গে সঙ্গে এক একটী মুদ্রার উপর আট দশ জন হুম্‌ড়ি খাইয়া পড়িয়া কুড়াইবার জন্য ছেঁড়াছেঁড়ি কাম্‌ড়াকাম্‌ড়ি করিতেছে। মাঝে মাঝে মারামারি এবং রক্তারক্তি পর্য্যন্ত ঘটিয়া যাইতেছে তাহাদের ভিতর।

পিছনে গাড়ীর ভিতর হইতে লক্ষপতি আত্মীয়-বিচ্ছেদের দুঃখ ভুলিয়া হয়ত এই তামাসাই উপভোগ করিতেছেন।

ইহাও তো দান বটে! কুকুরের পালের ভিতর রুটির টুক্‌রো ছড়ানো!

তৃষ্ণা থাকিলে এ দানের একটা সমালোচনা শোনা যাইত নিশ্চয়ই।

কিন্তু তাহাদের অর্থোপার্জ্জনের ইহাও একটা পন্থা বৈ কি। তিমির ভিড়িয়া যাইবে কিনা ভাবিতেছে, এমন সময় ঠুক্ করিয়া একটী পাথরের টুক্‌রা তাহার পিঠে আসিয়া পড়িল।

তিমির ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল : এ কী!

তৃষ্ণা কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, কহিল : তোমাকে যে আমার খুব দরকার!

তিমির বিস্মিত হইয়া কহিল : আমাকে?

তৃষ্ণা কহিল : বল্‌লাম তো।

মোড় ঘুরিয়া শোভাযাত্রা অন্য পথে চলিয়া গেল। তৃষ্ণা তিমিরের পাশে আসিয়া বলিল : চলো!

দুইজনে তাহারা সোজা চলিতে লাগিল। তৃষ্ণা কহিল : এখানে দাঁড়িয়ে তুমি ক'রছিলে কী? দরিদ্র সেবা?

তিমির কহিল : আত্মসেবা।

তিমিরের সমস্ত দেহটার পানে একবার দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া তৃষ্ণা কহিল : ...র কিন্তু দরিদ্রের বন্ধু বলে ঠিক তোমায় মানিয়েছে। কোনও থিয়েটারের গ্রীনরুমে ঢুকে সেজে এসেছো নাকী?

তিমির কহিল : না, এ আমার নিজস্ব সাজ, আর কিছু সাজতে হ'লেই

বরং গ্রীনরুমে যেতে হবে। দেখলাম, উঁচুতে বসে নীচেকার সব জিনিষ দেখা যায় না, তাই ওদের মাঝে নেবে দেখছি বুকের কোন্ জায়গাটায় ওদের ব্যথা। কাঁটা না ফুটলে কাঁটার ব্যথা বোঝা যাবে কী করে?

তৃষ্ণা হাসিল, বলিল: একদিন এক এয়ো স্ত্রী বৈধব্য যন্ত্রণা যে কী কষ্টের তা অনুভব ক'রবে ব'লে পরণের রঙীন শাড়ী আর হাতের শাঁখা লোহা খুলে চোখে আঁচল চাপা দিয়ে ব'সেছিলো। তোমায় দেখে ও তোমার কথা শুনে আমার সেই কথাটা খালি মনে পড়ছে! কিন্তু সাবধান, এই ছন্নছাড়া পোষাকের ভিতর থেকে রাশি রাশি অর্থ বেরোতে দেখলে পুলিশ যে তোমায় অন্য রকম ভাব্‌বে।

: তা হ'লে তো একটা পুণ্যের পথ পরিষ্কার হ'য়ে যায়। ওদের আলিঙ্গন থেকে মুক্তি পেতে হ'লে কিছু নৈবেদ্য সাজাতেই হবে। রাজপদতলে ডালি আর ব্রাহ্মণ পদতলে দান, দুইটাই সমান পুণ্যের।

তৃষ্ণা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল: তাহ'লে এই প্রকাশ্য রাজপথেই একটা অন্যায় ক'রে ফেলো না, সঙ্গে সঙ্গেই—কিন্তু সত্যিই তুমি বলো দেখি, পুলিশ তোমার হাতে টাকা দেখ্‌লে সন্দেহ করবে কিনা?

তিমির কহিল: নিশ্চয় করবে। পুলিশ যদি কাউকে সন্দেহ ক'রতে বাদ দেয় তবে সে পুলিশ কিসে? আজ চৈতন্যদেব যদি তার দলবল নিয়ে রাস্তায় বেরোতেন পুলিশ ভাব্‌তো, ব্যাটা রায়ট বাধাতে বেরিয়েছে।

: থাক উপকারীর নিন্দা কোরো না, দেখছো না দেশবাসীর মঙ্গলসাধনায় ওদের চোখে নিদ্রা নেই?

: নিদ্রা নেই ব'লেই দেশবাসীর চোখেও ঘুম ছুটেছে, জেগে থেকে তারা ওদের জাগা দেখ্‌ছে।

: থাক্! আর চেঁচিও না। একেই তো অপরাধী। কিন্তু এমন বক্তৃতা ক'রতে ক'রতে কোথায় যাচ্ছো বল দেখি?

: বারে! তুমিই তো আমাকে নিয়ে এলে!

ঃ আমি নিয়ে এলাম! তুমি জগন্নাথের মতন দাঁড়িয়েছিলে বলেই তো পা চালাতে বল্লাম্।

ঃ কিন্তু দরকারটা কী ছিলো, এখনো তো ব'ল্‌লে না।

ঠোঁট বাঁকাইয়া তৃষ্ণা কহিল ঃ দরকার তো হাতী, একা একা রাস্তায় বেড়ানো কী বিরক্তিকর বলো তো?

ঃ তাই সঙ্গী খুঁজ্‌ছিলে? কিন্তু দেখা হ'তেই যে রকম ক'রে কথা ক'য়ে উঠ্‌লে ভাব্‌লাম নেমন্তন্ন চিঠি নিয়ে বুঝি আমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছ।

ঃ খুঁজ্‌ছিলাম কিছু একটা, ঠিক তোমাকেই যে তা নয়, তবে সাম্‌নে যখন পেয়ে গেলাম চেনা মুখ তখন কেন আর একা ঘুরে বেড়াই।

একটা মোড়ের মাথায় তাহারা আসিয়া দাঁড়াইল। সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে। সূর্য্যের আলো আর এতটুকু নাই। এবার গ্যাসগুলির পাহারা দিবার পালা।

কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া তিমির কহিল ঃ তুমি যাও এবার, সন্ধ্যে তো হ'য়ে গেলো, কতক্ষণ আর আমার সঙ্গে ঘুরে বেড়াবে।

তৃষ্ণা অগ্রসর হইতে চাহিয়া কহিল ঃ থামো বাপু, যাবোখন্, বেড়াই আর একটু, কদ্দিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা বলতো?

চলিতে সুরু করিয়া তিমির কহিল ঃ বেশীদিন পরে দেখা হ'লে বেশীক্ষণ থাকৃতে হবে এ ধরণের আত্মীয়তা তোমার সঙ্গে আমার হোলো কবে?

তৃষ্ণা কহিল ঃ হয়নি তো। হয়নি ব'লেই তো বেশীদিন পরে দেখা হোলো।

ঃ তবে বেশীক্ষণ থাকৃতে চাইছো কেনো?

ঃ শীঘ্রি চ'লে যেতে ইচ্ছে ক'র্‌ছে না ব'লে—কিন্তু অমন ঘোড়ার মতন লাফিয়ে লাফিয়ে চল্‌ছো কেনো বলো দেখি? কোথায় ঘাস দেখেছো নাকী?

: না, পশুদের মধ্যে দেখলাম ঘোড়ার চালটাই ছন্দবহুল, সুতরাং ভদ্র। তাই মানুষের চলা যখন ভুলে গেলাম, তখন অভ্যেস করলাম ঐ জন্তুর চালটা, ওটা যখন ভুলে যাবো তখন ধ'রবো বুনো মহিষের চাল।

: দেখো, এখুনি যেনো সুরু করে দিও না। কিন্তু আস্তে চলো, আজকাল পুরুষদের সঙ্গে সমান সমান হবার জন্যে মেয়েদের মধ্যে হৈ চৈ প'ড়ে গেছে, মানসিক সামর্থ্যে সম্ভব হ'লেও দৈহিক সামর্থ্যে যারা তাদের সমকক্ষ হ'তে চায়, মনে থাকে যেনো, সে ক্ষ্যাপাদের দলে আমি নেই।

: এমন মুখ ফুটে নিজেদের দৈন্য স্বীকার করলে তুমি?

: ভীরু নই ব'লেই ক'রলাম, যারা নিজেদের প্রকাশ ক'রতে লজ্জা পায়, আর যাই হোক, সাহসী তারা নয়।

: কিন্তু স্বরূপ প্রকাশ করা আধুনিক কালে নির্ব্বুদ্ধিতার লক্ষণ। ঐ জন্যে দেখা যায় একটা মানুষের মাঝে আজকাল অসংখ্য মানুষের প্রকাশ। তুমি অন্যরূপে বিকশিত হ'লেই পারতে।

: তা হ'লে সেটাকে ঠিক বিকাশ বলা যেতো না, বলা যেতো জোর ক'রে পাপড়ি ছাড়ানো। আসল সৌন্দর্য্য তাতে কুটিল হ'য়ে উঠ্তে দেরী হয় না। কিন্তু চলো না বাপু কোথাও একটু বসি, পা যে খ'সে গেলো, কখন সেই দিন-দুপুরে বেরিয়েছি।

তিমির হঠাৎ কহিল: রাত দুপুরে নয় তো?

তৃষ্ণা চুপ করিয়া গেল, খানিক পরে গম্ভীর হইয়া কহিল: অনেকদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা, তাই তোমার এ অসংযত ভাষাকে নীরবে ক্ষমা ক'রে গেলাম।

তিমির হাসিল, কহিল: অনেকদিন পরে দেখা না হ'লে কী করতে?

ঘাড় ফিরাইয়া তৃষ্ণা কহিল: আমার অসংযত ভাষাকে সংযত ক'রে তোমায় নমস্কার না ক'রেই বাড়ী চ'লে যেতাম।

কৃত্রিম শিহরিয়া তিমির কহিল: উঃ, অহিংস যুগে এর চেয়ে কঠিন শাস্তি

আর কী হ'তে পারে! কিন্তু অমন ঊর্দ্ধমুখে চ'লেছো, রাস্তার লোকের ঘাড়ে গিয়ে প'ড়লে ভাব্‌বে কী?

তৃষ্ণা রাগিয়া কহিল: ভাব্‌বে মেয়েটা মদ খেয়ে ট'ল্‌ছে, আর পুরুষটা তাকে সাম্‌লাতে পার্‌ছেনা, এইত?

পুনরায় তাহারা একটা মোড়ের কাছে আসিয়া পৌছিল। সন্ধ্যা এবার রাত্রির কোলে আসিয়া পৌছিয়াছে। তিমির আজ আর বেশীক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইবে না। তৃষ্ণা চলিয়া গেলেই সে সটান্ বাসায় ফিরিবে এবং মাখনের সহিত ডালপুরী ভোজনে প্রবৃত্ত হইবে। আজ বিকেলের শেষ এবং সন্ধ্যাটা অনর্থক এই মেয়েটার সহিত ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাটিয়া গেল। ইহাতে তাহার লাভ হইল কী? তৃষ্ণার দিকে ফিরিয়া দেখিল সে কেবল এদিক ওদিক তাকাইতেছে। কিন্তু চলিয়া যাইবার লক্ষণ তাহাতে আদৌ নাই। তখন সে নিজেই বিচ্ছিন্ন হইবার উদ্যোগ করিয়া কহিল: এবার বাড়ী যাবে তো?

তৃষ্ণা চটিয়াছিল, কহিল: তুমি কী ভেবেছো, তোমার সঙ্গে আজ রাত কাটাবো?: বলিয়া সে গট্‌মট্‌ করিয়া বাঁদিকের রাস্তাটা ধ'রিয়া চলিয়া গেল।

ক্ষিপ্রপদে সে চলিয়া গেল বটে কিন্তু বেশীদূর গেল না। খানিকটা গিয়াই সে একটা গাড়ীবারান্দার ছায়ান্ধকারে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল।

তিমির দেখিল। দেখিয়া হাসিল। কিন্তু বিস্মিত হইল না। এ পৃথিবীর কোন কিছুই তাহাকে আর বিস্মিত করিতে পারে না। বিস্ময়ের বস্তু চিরদিনের মত তাহার কাছে সহজ হইয়া গেছে। উপরের দিকে মুখ তুলিয়া দেখিল, দুর্ণিবার গতিতে আপন দেহে আগুন জালাইয়া একটী তারা আকাশ হইতে খসিয়া পড়িল। আজ অন্ধকার দ্বীপে তার নির্ব্বাসন। একদিন কিন্তু সে ঐ শূন্যের রাজধানীতে সভা করিয়া বসিয়াছিল। সমস্তটাই এম্‌নি আজগুবী, কিন্তু এম্‌নি সহজ। তৃষ্ণা দাঁড়াইয়া থাক্, কিন্তু তাহার দাঁড়াইয়া থাকিলে চলিবে না। সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পথ দেখিতেছে,

তাহাকে চলিতে চলিতে পথ দেখিতে হইবে। তিমির মুখ ফিরাইয়া উল্টাদিকে চলিতে সুরু করিল।

: শোনো—শুন্‌ছো—

তিমির দাঁড়াইল।

তৃষ্ণা একেবারে পিঠের কাছে পৌঁছিয়াছে, কহিল : একটা কথা আছে, তাই ফিরে এলাম, আচ্ছা এদিকে কোথাও ঘর ভাড়া আছে, বল্‌তে পারো ?

: ঘর ভাড়া ! এই রাতে ! কী জানি ঐ দোকানে গিয়ে জিজ্ঞেস করো।

: তুমি ক'র্‌বে তো, আমি মেয়ে মানুষ, এই রাতে কী ক'রে জিজ্ঞেস কর্‌তে যাই বলো দেখি ?

: তোমারই তো যাওয়া সুবিধে, পুরুষরা যেখানে গিয়ে আজকাল মার খায়, মেয়েরা সেখান থেকে তুড়ি দিয়ে কাজ হাসিল ক'রে আসে। বিশেষতঃ তোমার মতন সুন্দরী মেয়েরা।

: দেখো, সেই দুঃখে যেনো কোনোদিন আত্মহত্যা ক'রে বোসো না, কিন্তু যাও না, না হয় ঐ ভদ্রলোককেই জিজ্ঞেস করো।

: আমার পিঠের চামড়া শক্ত নয় তৃষ্ণাদেবী, মার আমি খেতে পার্‌বো না, গরু যদি হারিয়ে থাকে তো বলো, তা বরং খুঁজে দিতে পার্‌বো, কিন্তু কোলকাতার সহরে বাড়ী আমি খুঁজতে পার্‌বো না।

হতাশ হইয়া তৃষ্ণা কহিল : তা হ'লে এই রাতে কী আমি ভেসে যাবো না কী ?

তিমির হাসিয়া কহিল : ভেসে যাবে কেনো ? কোথাও আট্‌কে পড়ো, পুরুষদের মতন অভাগা তো তোমরা নও। তোমাদের ভক্ত অনেক।

: আচ্ছা তুমি তো আগে এমন ছিলে না ?

: তুমিই কী আগে এমন ছিলে নাকী ? রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এত রাত অব্দি ঘ্যান্ ঘ্যান্ ক'র্‌তে নাকী ?

সাম্‌নের লাইট্-পোষ্টে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া তৃষ্ণা আপন মনে বকিতে

লাগিল : এমন জ্বালা দেখিনি বাপু—জায়গা নেই তো রাস্তায় দাঁড়িয়ে রাত কাটাও—এত লোককে এত দান কর্‌ছেন উনি, রাত কাটাবার জায়গা একটু আর দান কর্‌তে পারেন না—এক ঢেঁকির পাল্লায় প'ড়ে মিছিমিছি আমার সময়টা কেটে গেলো।

: আচ্ছা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তুমি বিলাপ করো ততক্ষণ, আমি চল্‌লাম, সকালবেলা যদি সময় পাই তো আস্‌বোখন : বলিয়া তিমির মুখ ফিরাইল।

তৃষ্ণা আপন মনেই বকিতে লাগিল : শুধুই গোঁফ-দাড়ির অধিকারী হ'য়ে জন্মগ্রহণ ক'রেছো—যারা নারীকে বিপন্ন দেখেও মুখ ফিরিয়ে চ'লে যায় তারা পুরুষ তো নয়ই, মানুষের চামড়াও তাদের গায়ে নেই।

তিমির ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হাসিয়া কহিল : স্বপ্নাতুর যুব-সঙ্ঘে বক্তৃতাটা বাহবা অর্জন কর্‌তো বটে, কিন্তু আমাকে ঠিক বিঁধলো না। মানুষের চামড়া গায়ে থাক্‌তে মেয়েদের উপকার কর্‌তে নেই এ আমি শিখেছি। পুরুষদের কাছ থেকে উপকার পেয়ে তারা কৃতজ্ঞ হয় না, উপকার গ্রহণ ক'রে শুধু তাদের কৃতার্থ করে। এ অপমান স'হবার মত রসসিক্ত মন আমার নেই।

কী ভাবিয়া তৃষ্ণা তাড়াতাড়ি তিমিরের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল : আমায় সঙ্গে না নিলে তোমায় এখনি বিপদে ফেল্‌তে পারি জানো!

তিমির হাসিল, কহিল : তা জানি। সঙ্গে না নিলে তুমি বিপদে ফেল্‌বে, আর সঙ্গে নিলে বিপদ আপনি প'ড়বে, তোমরা যে আস্ত বিপদ। তুমি যদি এখন গাড়ী চাপা পড় তা হ'লেও আমি উদ্ধার পেয়ে যাই। এসো।

তৃষ্ণা হাসিয়া কহিল : কিংবা উল্টোটা ক'রেও উদ্ধার পেতে পারো। অর্থাৎ নিজেই গাড়ীর পায়ে ধ'র্‌তে পারো। কিন্তু তুমি এত ভীরু কেনো বলো দেখি?

: তোমরা ভীষণ ব'লেই আমি ভীরু, তোমাদের একটাকে পিছনে বাঁধার থেকে একশোটা গাড়ীর ইঞ্জিন হওয়া সোজা, রাতেই তোমাদের ভীষণতা বাড়ে, রাতেই তোমাদের ভার বেশী হয়। কিন্তু আমাকে না পেলে তুমি আজ কর্‌তে কী শুনি?

: কিছুই কর্‌তাম না, নিজেই নিজের যথেষ্ট হ'তাম। কিন্তু ঘোড়া দেখে খোঁড়া হওয়া যে মেয়েদের স্বভাব—অবলা থেকে যারা সবলা হ'য়েছে তাদেরও। তোমায় দেখ্‌তে পেয়েই আমার মনে হোলো তোমাকে না হ'লে যেন আমার চল্‌বেই না।

: কিন্তু আমায় হ'লেই বা আর চল্‌ছে কৈ ? ঘাড়ে তো চ'ড়্‌লে, কোথায় যাবে বলো দেখি ?

: তোমার বাড়ীতেই নিয়ে চলো না।

: তা পার্‌বো না।

: কাটোয়ায় আমার বাড়ীতে একদিন খেতে দিয়েছিলাম পর্‌তে দিয়েছিলাম শুতে দিয়েছিলাম, সে কথা মনে করিয়ে দিলেও পার্‌বে না ?

: না। পার্‌বার হ'লে ওসব মনে না করিয়ে দিলেও পার্‌তাম। আমার বাড়ী নেই, আমার বাস এখন এক বন্ধুর বাড়ীতে।

তৃষ্ণা থপ্‌ করিয়া রাস্তার মাঝখানে দাঁড়াইয়া পড়িল, তিমিরের আপাদ-মস্তক একবার দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া কহিল: তুমি কে গো ? তুমি সেই ক্ষণিকের অতিথি তো ?

তিমির একবার সশব্দে হাসিয়া উঠিয়াই পরক্ষণে চুপ করিয়া গেল। মনে পড়িল এত রাত্রে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়াইয়া এমন করিয়া হাসা তাহার উচিত হয় নাই। তৃষ্ণার মুখের পানে চাহিয়া কহিল: চোখ দুটোর বাহাদুরী আছে ব'ল্‌তে হবে, ভুল যে কেন ক'র্‌লে না তাই ভাব্‌ছি।

তিমিরের পানে তাকাইয়া তৃষ্ণা ক্ষণকাল নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর সহজ হইয়া মৃদু হাসিয়া কহিল: না চিন্‌তে পারাই উচিত ছিলো নয় ? কিন্তু আমাদের চোখ দুটো এম্‌নিই, যাদের দেখে না, দেখে না, যাদের দেখে এম্‌নি ক'রেই দেখে। কী করা যাবে, বন্ধুর বাড়ীতেই নিয়ে চলো এখন।

তিমির চলিতে সুরু করিয়া কহিল: সে এক এক-কাম্‌রার বিরাট

অট্টালিকা, দুটী বন্ধুতে আমরা বিলাস-ব্যসনে বাস করি। তার মধ্যে তুমি কোথায় যাবে?

ঃ তারি একপাশে আমি চুপটী ক'রে শুয়ে থাক্‌বো।

ঃ তাহ'লে আমাদের দুজনকে শুতে হবে ঘাড়ে-ঘাড়ে। আচ্ছা, তুমি এক কাজ কর্‌তে পার্‌বে? সারারাত্রি চুপটী ক'রে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পার্‌বে?

তৃষ্ণা বিরক্ত হইয়া কহিল ঃ কী জানি, আমি জানিনা বাপু, যা হয় কর, ভূতের মত আর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মেরো না।

রাত্রি গভীর হইয়া উঠিয়াছিল। পথের মানুষ-জন যে যাহার আশ্রয়ে ফিরিয়া গেছে। আর কোথাও কেহ নাই। কেবল এই দুটী প্রাণীই বুঝি ঘরের বাহিরে রহিয়া গেছে। এতক্ষণ তাহারা জনারণ্যের মাঝখানে মিশিয়াছিল। এখন এই জনহীন, নিস্তব্ধ পথের উপর তাহারা যেন অতিমাত্রায় স্পষ্ট হইয়া উঠিল। যে কেহ তাহাদের দেখিবে, তাহারই মনে প্রশ্ন জাগিয়া উঠিবে, এই স্তব্ধ অবগুণ্ঠিত অর্দ্ধরাতে কেন এই দুটী মানুষ? নতমুখে দ্রুত হাঁটিতে হাঁটিতে তাহারা বুঝি দুইজন দুইজনকে চিনিবার চেষ্টা করিতেছিল, আর ভাবিতেছিল আর কতক্ষণ তাহাদিগকে এমন করিয়া নিরাশ্রয়ে ফিরিতে হইবে।

তিমির প্রথমে কথা কহিল, বলিল ঃ আর একটা বাসা আছে, সেটা আমার নিজের, দোতলার উপর, কিন্তু তার সিঁড়িটা ভয়ানক খারাপ ঃ বলিয়া একটা অন্ধকার গলির ভিতর ঢুকিয়া পড়িল।

খানিকটা গিয়াই দুজনে থামিল। একটা লম্বা নিমগাছ একটা একতলা বাড়ীর দেওয়াল ঘেঁসিয়া উপরে উঠিয়া গেছে। সেইটাকে দেখাইয়া তিমির কহিল ঃ এই সিড়ি, পার্‌বে কী উঠ্‌তে?

এত বিপদেও তৃষ্ণা হাসিল, কহিল ঃ সেই সাহেব বৈজ্ঞানিকের থিওরির সত্যতা প্রমান কর্‌বার ক্ষমতা আমার নেই, তুমি বুঝি পারো?

তিমির কহিল ঃ এই বাড়ীটা একটা মাসিক পত্রের অফিস, কাজকর্ম্ম সেরে রাত্রি ৯টার পর যখন সবাই চ'লে যায় তখন এর ছাতে উঠবার আর

কোনো বাধা থাকে না। বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুতা হবার আগে আমি ঐখানে শুতাম, খুব হাওয়া—মশা নেই—বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়া হ'লে এখনো মাঝে মাঝে এসে শুই।

তৃষ্ণা গা ঘেঁসিয়া আসিয়া বলিল : বেশ করো, এখন বেরিয়ে চলো বাপু, গলির ভিতর গা ছম্‌ছম্‌ কর্‌ছে।

ওপ্রান্ত দিয়া বাহির হইয়া একটা সরু রাস্তায় পড়িয়া তাহারা পুনরায় হাঁটিতে লাগিল। কতক্ষণ চলিবার পর একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর সাম্‌নে আসিয়া তিমির হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল। সাম্‌নেই গ্যারেজ, পাৎলা কাঠ দিয়া ঘেরা। কাঠেরই কপাট। একটা খুঁটির সহিত সেটা শিকল দিয়া জড়ানো, তাতে ছোট একটা তালা। গ্যাসের আলোটা অনেকখানি দূরে জ্বলিতেছিল, তাই জায়গাটা ছায়াচ্ছন্ন। তিমির চক্ষু দৃষ্টিমান করিয়া থামের উপর নামটা পড়িল। শিকলটা আস্তে আস্তে টানিয়া কপাটটা ঠেলিয়া ধ'রিতেই অনেকখানি ফাঁক হইয়া গেল। তারপর একবার এদিক-ওদিক চাহিয়া মাথা গলাইয়া তিমির ফট্ করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। ভিতর হইতে কপাটটা আরও একটু ফাঁক করিয়া ধরিয়া চুপি চুপি ক'হিল : এসো।

: মা গো! জবাই ক'র্‌বে নাকি?

: লক্ষ্মী মেয়ের মতন চ'লে এসো, চেঁচিয়ে কেলেঙ্কারী কোরো না।

: তবে কী না-চেঁচিয়েই কেলেঙ্কারী ক'র্‌তে ব'ল্‌ছো? : অতি সন্তর্পনে তৃষ্ণা ভিতরে ঢুকিয়া আসিল।

ভিতরে অন্ধকার। অমাবস্যার চেয়ে একটু সাদা আলো। ঠাহর করিয়া করিয়া দুইজনে গাড়ীর দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তিমির কহিল : ডাক্তারের গাড়ী নয়, ব্যারিষ্টারের, রুগী আস্‌বার ঝামেলা নেই, আরাম্‌সে ঘুমোও।

তৃষ্ণা কহিল : আলো জ্বাল্‌বে না?

তিমির মুখে একটা শব্দ করিয়া কহিল : সাধে বলে মেয়ে মানুষ—বর জুট্‌লোতো এবার গহনা। ওঠো, বাসর আর নাই বানালে।

তৃষ্ণা গাড়ীতে উঠিয়া কহিল : তোমার মুখ নয়তো, নর্দ্দমা।

: শুধু মুখ কেন, গোটা শরীরটাই আমার নর্দ্দমা। দুর্গন্ধ ছড়িয়ে যাওয়াই আমার নিয়ম : তিমির সামনের সিটে উঠিয়া বসিল।

তৃষ্ণা কহিল : বেশ তো বস্‌লাম, এখন যদি কেউ এসে পড়ে কী হবে বলতো ?

তিমির কহিল : ব'ল্‌বে, আমরা দুজনেই দুজনকে নিয়ে পালাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখ্‌লাম দুজনেই খোড়া, তাই রাতে একটু জিরিয়ে নিচ্ছি, সকাল হলেই যে যার বাড়ী ফিরে যাবো।

: সত্যি—আমি ঘুমুলে তুমি আমায় নিয়ে পালিয়ে যাবে না তো ?

: তুমি যে আমায় নিয়ে পালাচ্ছ তা থেকে উদ্ধার পেলে ওটা না হয় চেষ্টা ক'রে দেখা যাবে। কিন্তু কোন সাহসে তুমি আমার সঙ্গ নিলে বলোতো ? আগে আমায় ভদ্র বেশে দেখেছো, না হয় চিনতে পারোনি, কিন্তু আজও কী আমায় চিনতে পার্‌লে না, আমি ভাল লোক নই ?

: এত চিন্‌তে গেলে চলে কই ? ঠগ্‌ বাছতে যে দেশ উজাড় হ'য়ে যাবে। বাংলা দেশে যে ভাল লোক নেই তা তো মেয়েদের উপর অত্যাচার আর নারীহরণের সংখ্যা দেখেই বোঝা যায়।

: কিন্তু এখন যদি সত্যিই নিজ-মূর্ত্তি ধারণ করি কী কর্‌বে তুমি ? গাড়ীর কাচে কাটা হ'য়ে ম'রবে ?

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তৃষ্ণা কহিল : কী ক'র্‌বো সেটা অত্যাচারীকে জানানো বুদ্ধিমানের কাজ নয়, তবে এটা ঠিক যে আত্মহত্যা ক'র্‌বো না।

: কিন্তু এ অবস্থায় সসম্মানে আত্মহত্যারই উপদেশ অনেকে বিতরণ ক'রেছেন।

: যাঁরা ক'রেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই পুরুষ, না হ'লে মেয়েদের জীবনটাকে এত

তুচ্ছ ক'রে দেখবার স্পর্দ্ধা আর কার থাকৃতে পারে ? এই সব উদ্ধত আত্মাদর-বিলাসী লোক আমার দুচোখের বিষ। আমি জানি, আমি জন্মেছি এত অল্পেই আমার জীবনটাকে বিসর্জ্জন দেওয়ার জন্যে নয়। আমি জন্মেছি, আমার জীবনটাকে ভালবাস্‌বো ব'লে, বেঁচে থাকৃবো ব'লে; আমার সম্মান এত সহজে ক্ষুন্ন হবার নয়। সম্মান বাঁচাবার জন্যে বিষ দেওয়া আমার ধর্ম্মে আছে, কিন্তু বিষ খাওয়া আমার ধর্ম্মে নেই।

হঠাৎ স্বর নামাইয়া তিমির কহিল : চুপ ! শুন্‌ছে।

তৃষ্ণা চম্‌কাইয়া কহিল : কে ?

তিমির গলা বাড়াইয়া কহিল : সমাজ! হিন্দুর নরনারীর ভাগ্য-বিধাতা !

দুইজনে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। এতক্ষণ যে তাহারা কথা কহিতেছিল তাহাদের বুঝি মনেই ছিল না যে তাহারা একটা বিস্ময়কর স্থানে আশ্রয় লইয়া বসিয়া আছে। তাহাদের কথার স্রোতে মনে হইতেছিল, যেন এই রাত্রিটুকুই আর তাহাদের কাছে বাকী আছে, যাহা বলিবার এই রাত্রির মধ্যেই বলিয়া লইতে হইবে। তাহারা কেহ কাহারো আত্মীয় নয়। বহুদিন আগে পরস্পর পরস্পরের কাছে পরিচিত হইয়াছিল মাত্র। সে পরিচয়ও আজ উভয়ের চোখের সাম্‌নে হইতে মিলাইয়া গিয়াছে। কাহারো জন্য কাহারো মাথাব্যথা নাই। রাত্রি কাটিলেই হয়ত যে যার নিজেকে লইয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিবে। তবুও কোথায় যেন এতটুকু একটী মিল, সূক্ষ্ম একটী অন্তরঙ্গতা অন্তরালে থাকিয়া এই অতল রাত্রির বিজন বক্ষে এই দুইটী নরনারীকে জাগাইয়া রাখিয়া কথার প্রেরণা জোগাইতেছে। স্তব্ধ হইয়া দুইজনে বুঝি তাহাই ভাবিতেছিল।

তৃষ্ণা কহিল : ঘুমুলে ?

তিমির কহিল : না, ঘুমুবো।

: চুপ ক'রে কী ভাব্‌ছিলে এতক্ষণ ?

: ভাবছিলাম, নিজের কথা। তুমি যে জোঁকের মতন জড়িয়ে ধ'রেছ, ছাড়াবো কী ক'রে।

তৃষ্ণা সে কথার জবাব দিল না, কহিল: আচ্ছা, আগে তোমাকে 'আপনি' বলে ডেকেছিলাম, না?

তিমির কহিল: হ্যাঁ, 'আপনি' ব'লেছিলে, ভালো খাবার খেতে দিয়েছিলে, —কিন্তু অমন ক'রে পিছনের দিকে তাকিয়ো না তৃষ্ণা দেবী, ভূত দেখতে পাবে।

: তুমি অমন ঘ্যান্‌ঘ্যানে প্রেমেপড়া ছোকরাদের মত 'দেবী' 'দেবী' কোরো না বাপু, আমার বিচ্ছিরি লাগে।

তিমির কহিল: আমারও বিশ্রী লাগে, কিন্তু পাছে তুমি মহিমা-ভ্রষ্টা হও সেই ভয়ে—

: থাক্, ঢের হ'য়েছে, যার ঠ্যাং নেই তার আবার 'চরণ-কমল'—আসলে কিন্তু আমার নামটা আরো ছোট, তৃষ্ণা নয়,—তৃষা।

তিমির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল: আঃ বাঁচলাম, এতদিনে হ'লে তুমি একটী সুন্দরী মানবী, ঐ যে নামের ভিতর থেকে কৃষ্ণ কিংবা বিষ্ণুর ধ্বনিটা বেরিয়ে গেল, ওতেই আমি বেঁচে গেলাম, এবার প্রাণভ'রে আরামে ডাকা যাবে।

: ডাকবে আর কখন? কাল তো ভোরেই আমি চ'লে যাবো।

: তা বটে, তবে আবার যদি কখনো দেখা হয়।

: কিংবা ভোরেই উঠে একবার ডেকে নিতে পারবে।

দুইজনে আবার একটু নীরব রহিল। খানিকটা পরেই তৃষ্ণা কহিল: আচ্ছা, তোমার সঙ্গে আমার এতক্ষণ দেখা হ'য়েছে, বুঝতেই পারছো আমার কিছু একটা হয়েছে, কই কিছু একবার জিজ্ঞাসা ক'রলে না?

তিমির ভাল করিয়া শুইয়া কহিল: আমার কথাই বা কে জিজ্ঞাসা করছে? তা ছাড়া জানা কথা দ্বিতীয়বার জানতে চাওয়ায় লাভ কী?

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে একটা অধঃপতনের ব্যাপার, সে যেমন করেই হোক্। আমার প'ক্ষে ধ'রতে গেলে, হয় মদ এবং আনুষঙ্গিক দোষে সব ফুঁকে দিয়েছি, নয় বাবা আমাকে ত্যজ্যপুত্র করেছে, নয়তো ঐ রকম একটা কিছু। আর তোমার কথা ধ'রতে গেলে, হয় তুমি কারো সঙ্গে পালিয়েছিলে, নয় তোমায় কেউ নিয়ে পালিয়েছিলো, তারপর রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

ঃ কোনটাই অসম্ভব নয়; কিন্তু ঠিক হোলো না।

ঃ তবে ?

একটু থামিয়া তৃষ্ণা কহিল ঃ সে একটা বিরাট প্রতারণা, বিরাট জোচ্চুরি! এতবড় সম্পত্তিটা ছায়াবাজীর মত আমার সাম্‌নে থেকে মিলিয়ে গেলো! অনেক ডাকাডাকির পর তো ম্যানেজার মশাই তাঁর দেশ থেকে এসে পৌছ্‌লেন। এসে জানালেন, তিনি অক্ষম, বৃদ্ধ বয়সে এবার তিনি বিশ্রাম নিতে চান! অনেক অনুরোধেও তিনি যখন রাজী হলেন না দেখাশুনা করতে, তখন আমি বাধ্য হ'য়ে সমস্ত বুঝে নিতে চাইলাম।

তিনি ছিলেন বহুদিনের পুরোনো এবং বিশ্বস্ত, তাই সমস্তই ছিলো তার নখদর্পনে। জবাবে তিনি স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বললেন যে, তিনি অত্যন্ত দুঃখিত যে আমার বুঝবার মতো কোন জটিলতাই আর আমার জন্যে রেখে যান নি আমার বাবা। ব'লে তিনি একখানা কাগজ আমার সাম্‌নে মেলে ধ'রলেন্—দেখলাম, বাবা তাঁর সমস্ত সম্পত্তি লিখে গেছেন আমার নামে নয়, ম্যানেজার মশাইএর ছেলের নামে।

দেশকাল ভুলিয়া তিমির হাসিয়া উঠিল।

তৃষ্ণা রাগিয়া কহিল ঃ এমন বিপদে কাউকে হাস্‌তে দেখলে আমার গা জ্বালা করে বাপু।

তিমির কহিল ঃ রাগ কোরোনা, বিপদে না হাস্‌তে পেলে আমার গা বমি-বমি করে। তারপর ?

: তারপর আর কী—কাটোয়ার ভাড়া বাড়ী থেকে দেশের বাড়ীতে এলাম, এসে দেখি আজব ব্যাপার, ঝি চাকর কেউ নেই, বাইরের ঘরে এক ভদ্রলোক বসে আছেন, এখনো বাড়ীতে নূতন মালিক এসে পৌছন্নি, পৌছলেই তিনি চ'লে যাবেন। অপরিচিত আর কাউকে তিনি ঢুকতে দিতে পারবেন না।

: তারপর ?

: তারপর আর কী—দুচারজন আত্মীয়ের বাড়ী ঘোরাঘুরি ক'রে কিছুদিন কাটালাম, বাবার সঙ্গে তাঁদের খাপ খেতো না, সুতরাং আমার সঙ্গেও খাপ খেলো না, চ'লে এলাম।

: তারপর ?

: তারপর, তুমি জানো।

: তারপর ?

: ও! ঠাট্টা করছো, নয় ?

: না, নিজেকে ঘুম পাড়াচ্ছি, একঘেয়ে সুরে নাকি ঘুম আসে, তাই পরীক্ষা করছি।

: ঘুমবেথন্, এখন তোমার কাহিনীটা বল দেখি শুনি ?

: তার চেয়ে ভোর বেলা উঠে রোমিও-জুলিয়েটের গল্প ব'ল্বো, এখন ঘুমিয়ে পড়ো।

: না ব'ল্তেই হবে, অনেকক্ষণ থেকে কৌতূহল চেপে আছি। তুমি বুঝি জানো না, প্রকাশ ক'র্তে এবং প্রকাশ করাতে না পারলে আমাদের হাঁপানি হয় ?

তিমিরের তন্দ্রা আসিয়াছিল। জড়াইয়া জড়াইয়া অতি সংক্ষেপে সে নিজের কাহিনীটা শেষ করিয়া বলিল : যাক্ গল্পটা ব'ল্লাম ভালোই হোলো, কাল সকালে তোমায় তাড়াতে আর কষ্ট পেতে হবে না।

তৃষ্ণা চোখ বুজাইয়া আপন মনে বলিতে লাগিল ঃ বাঃ, মজা মন্দ নয়, প্রকাণ্ড দুটো ষ্টীমার—হঠাৎ দুটো হালভাঙা, পালছেঁড়া নৌকায় পরিণত হ'য়ে গেলো, ভাস্‌তে লাগলো দোল খেতে খেতে, টাল্ খেতে খেতে। এই ডোবে, সেই ডোবে। মাঝ সমুদ্রে দুজনের মুখোমুখি দেখা। চিন্‌তে পেরে দুজনেই তারা হাস্‌লো। কে কোথায় যাচ্ছে, কেউ কিছুই জানে না। শুধু জানে রাতের ঢেউটা তারা একজায়গায় থেকে কাটাচ্ছে, রাত পোহালে পাশ কাটিয়ে তারা চ'লে যাবে এদিকে ওদিকে—নিশ্চিহ্ন হ'য়ে—নিরুদ্দেশে ! চমৎকার !

আট

বাড়ী হইতে কেহ বাহির হইবার আগেই তাহারা গাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিল। তখন ভোরের আলোয় চারিদিক সাদা হইয়া গেছে। রাস্তায় আসিয়া তাহারা একবার এ উহার মুখের পানে তাকাইল। দুইজনে হাসিল। অর্থাৎ কে এখন তাহাদিগকে বলিবে যে তাহারা চুরি করিয়া গাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া রাত্রি যাপন করিয়াছে। তাহারা এখন পথিক।

পাশাপাশি নতমুখে তাহারা চলিতে লাগিল—ধীরে ধীরে। কেহ কাহারো পানে আর চাহিল না। কেহ কোন কথাও বলিল না। প্রথম সম্ভাষণের মূহুর্ত্তটা বুঝি হাসিতেই সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাই এখন কথা বলিবার বুঝি আর প্রয়োজনও ছিল না। শুধু মন্থর গতিতে চারিখানি পা সম্মুখের অনির্নীত পথে আগাইয়া চলিল।

এ বিশ্বসৃষ্টির আড়ালে বসিয়া কে একজন বুঝি নিত্য নব নব কৌতুকের মালা গাঁথিয়া চলিয়াছেন। এ মালা দীর্ঘ, ইহার শেষ নাই, সমাপ্তি নাই। উপভোগের সূতার উপর একটার পর একটা সাজাইয়া সাজাইয়া অছিন্ন রেখায় তিনি ইহাকে বাড়াইয়া চলিয়াছেন। এ মালা গাঁথিয়াই তাঁহার আনন্দ, গাঁথিয়াই তাঁহার তৃপ্তি। বিশ্বে যাহা কিছু দুঃখের, যাহা কিছু বিস্ময়ের, যাহা কিছু অদ্ভুত সবই এই মালার ফুল—তাই তাঁহার উপভোগের ও আনন্দের। তাঁহারই জন্যই উত্তুঙ্গ পাহাড়ের উপর দিয়া চলিতে চলিতে মানুষের পা পিছলাইয়া যায়, ফাল্গুন চলিয়া গিয়া বৈশাখী ঝড় আর বর্ষা বাদল নামিয়া আসে, জ্যোতিঃসমুদ্রে সহসা অন্ধকারের দ্বীপ জাগিয়া উঠে। মানুষকে লইয়া খেলিবার এ প্রবৃত্তি তাঁহার চিরদিনের।

তাহারাও সে মালার মাঝে দুটী কৌতুকের ফুল মাত্র।

তৃষ্ণা মৃদু মৃদু হাসিতেছিল; দেখিয়া তিমির কহিল: দিনের বেলা জেগে জেগেই সুখ-স্বপ্ন দেখ্‌ছো নাকী?

তৃষ্ণা কহিল: আচ্ছা, কাল দেখা হওয়ার পর থেকে তোমার সঙ্গে কী রকম ব্যবহার ক'রেছি বলোতো? না ছিলো একটু লজ্জা, না ছিলো একটু ভদ্রতা, না?

তিমির কহিল: জাহাজডুবি হ'য়ে দুজন রাজা যখন ভাস্‌তে ভাস্‌তে মাঝ-সমুদ্রে এ ওর দেখা পায় তখন কোমরের কাপড় খুলে যাচ্ছে ব'লে কেউ তা ব্যস্ত হ'য়ে সামলাতে যায় না, বা খাতির ক'রে কেউ কারো জন্যে সিংহাসনও খুঁজতে যায় না।

তৃষ্ণা চলিতে চলিতে তিমিরের কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল: সত্যি, তোমার সঙ্গে পরিচয় থাকলেও তো মেশামেশি ছিলো না, কিন্তু কাল দেখতে পেয়েই মনে হোলো, তুমি যেনো আমার কতদিনের আত্মীয়, কেন বলোতো? বিপদে প'ড়েছিলাম ব'লে?

তিমির বিনাবাধায় বলিল: না, আমাকে ভালো লেগেছিলো ব'লে।

তৃষ্ণা তাড়াতাড়ি দূরে সরিয়া আসিয়া ভ্রু কুঁচ্‌কাইয়া বলিল: তুমি বুঝি ভাব্‌লে আমি তোমার প্রেমে প'ড়ে গেছি!

তিমির কহিল: তাই ভাব্‌তে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তোমার কথার স্রোত আর অবসর দিলে না।

একটা ক্রোধ-কটাক্ষ করিয়া তৃষ্ণা কহিল: তা ভাব্‌তে যাবে না? ছন্নছাড়া যে—বাইরেটা যাদের নোংরা মনটাও তাদের এম্‌নি এঁদো পচা।

: কথাটা ঠিক হোলো না তৃষা, আমি বহু পরিচ্ছন্ন সংসারীকে পাপের পঙ্কিল পথে নেবে যেতে দেখেছি, আবার রাশি রাশি বর্ব্বর ছন্নছাড়াকে দেখেছি ভোরের শিশিরের মত নির্ম্মল হ'য়ে উঠ্‌তে। তাদের পবিত্রতার তুলনা নেই।

: কিন্তু নিজেকে শেষের দলে ফেলে যেনো অহঙ্কার ক'র্‌তে যেয়ো না!

তিমির পথের পরে দাঁড়াইয়া পড়িল। কহিল: না, তা যাবো না। যে সংসারে শুদ্ধির স্বীকৃতি পেলো না, যার সর্ব্বাঙ্গ অসম্মতির অপমানে পুড়ে অঙ্গার হ'য়ে উঠ্‌লো, যার জীবনের স্বচ্ছন্দ নদীপথ শীর্ণ হ'য়ে উঠ্‌লো শুকিয়ে, নির্ম্মলতার অহঙ্কার ক'রতে যাবে সে কোন সাহসে? তার সে মরু-জীবনে প্রেমেরই বা অবকাশ কোথায় তৃষা? আমি শুধু পথ বেয়ে চলে যাই, পথের পাশে শতেক ফুলের মাঝে তুমিও একটী ফুল। আমি শুধু পথ বেয়েই চলে যাবো, তোমাকে তুলে নেবার স্পৃহা বা স্পর্দ্ধা আমার নেই। যাক্, তুমি তো এবার যাবে তৃষা?

সে যে তাহার চেয়ে বড় দুঃখী এ কথা মনে করিয়া সুরটাকে আরও একটু নরম করিলে তৃষ্ণার কী-ই বা এমন আসিয়া যাইত? মনে মনে সে দুঃখিত হইল, ম্লান মুখে শুধু কহিল: যাবো।

সরাৎ করিয়া দুজনের পিঠের উপর হঠাৎ দুইটা জলের ঝাপ্‌টা আসিয়া পড়িল। মুখ ফিরাইয়া তাহারা দেখিল, অদূরে দাঁড়াইয়া পিচ্‌কারী হাতে দুটী ছেলে তাহাদের পানে তাকাইয়া হাসিতেছে। সারা গায়ে তাহাদের রঙের ছাপ, চোখ আনন্দ-চঞ্চল, মুখে হাসি ধরিতেছে না। হেঁট হইয়া পিচকারী ডুঁবাইয়া পাত্র হইতে আবার তাহারা রঙ টানিতেছে।

ওদিক হইতে আরো কতকগুলি ছেলে পিচ্‌কারী আর রঙের পাত্র হাতে হুড়াহুড়ি করিয়া এই দিকেই ছুটিয়া আসিতেছে।

আজ বুঝি হোলি।

তাহারা কাহাকেও কিছু বলিল না। এক পা সরিয়াও গেল না। নিঃশব্দে একস্থানে দাঁড়াইয়া অজস্র রঙের ঝাপ্‌টা খাইল। শুধু মাঝে মাঝে মৃদু হাসিয়া তাহাদিগকে জানাইয়া দিতে লাগিল, তাহাদের এ খেলার দান তাহারা সর্ব্বাঙ্গে এবং সর্ব্বান্তরে গ্রহণ করিয়াছে।

তিমির দাঁড়াইয়া কী ভাবিল, হঠাৎ এক সময়ে ছুটিয়া সে একেবারে শিশুদের মাঝখানে গিয়া দাঁড়াইল। একজনের কাছ হইতে একটা রঙের পাত্র ও একটা পিচ্‌কারী কাড়িয়া লইয়া চেঁচাইয়া বলিল: আয়্‌ তোরা কে আমার

গায়ে রঙ দিবি আয়—আয়্, আয়্ঃ সে পিচকারী ভরিয়া ভরিয়া তাহাদের পানে অবিশ্রাম ছুঁড়িতে লাগিল। ছেলেরা দমিবার নয়। তিমিরকে ঘেরিয়া ধরিয়া তাহারা হুল্লোড় লাগাইয়া দিল। কেহ পিচ্কারী ভরিয়া ছুড়িতে লাগিল, কেহ অঞ্জলি ভরিয়া, কেহ বা বাল্‌তি লইয়া তিমিরের মাথায় ঢালিয়া দিল। তিমির ছুটিয়া ছুটিয়া শুধু বলিতে লাগিলঃ দিয়ে যা ভাই যার যত আছে, যার যত খুসী—আরো আছে ?

এমনি ছুটিতে ছুটিতে হঠাৎ সে এক সময়ে ছেলের দল ছাড়িয়া তৃষ্ণার কাছে আসিয়া পৌছিল, পিচ্কারীটা তুলিয়া ধরিয়া কহিল ঃ দাঁড়াও তৃষা, যাবার আগে তোমায় একটু রাঙিয়ে দিয়ে যাইঃ বলিয়া সে উপর্যুপরি রঙের বৃষ্টিতে তাহাকে একবারে স্নান করাইয়া দিল।

তৃষ্ণা মুখ ফিরাইয়া রঙের ঝাপটাটা একটু কাটাইল। তারপর সহসা পিচ্কারীটা কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। তখন সে সম্মুখের দোকান হইতে এক ঠোঙা ফাগ কিনিয়া লইয়া তিমিরের সারা মাথায় ও মুখে মাখাইয়া দিল। রাস্তার লোক ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া এই দুইটি অপূর্ব্ব তরুণ তরুণীর রঙের খেলা দেখিয়া যাইতে লাগিল। তৃষ্ণার গায়ে আরো বার দুই রঙ বর্ষণ করিয়া পিচ্কারীটা ছেলেদের দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া তিমির কহিল ঃ চলো।

তাহারা পুনরায় চলিতে লাগিল। তৃষ্ণা কহিলঃ আগে তুমি খুব রঙ খেল্‌তে, না ?

তিমির কহিল ঃ হ্যাঁ, খেল্‌তাম, সে অতীত যুগে।

ঃ সে অতীত যুগের ছায়া আজ তোমার মাঝে দেখ্‌তে পেলাম, কিন্তু আজ তোমার হাসিতে ও রঙের স্রোতে কী ঝ'রে প'ড়লো জানো ? আনন্দ নয়, তোমার মর্ম্মবেদনা।

ঃ তা যদি দেখ্‌তে পাও তৃষা, মুখ ফিরিয়ে নিও, আমাদের দুঃখের দিকে তাকিয়ে দেখা সভ্য জগতের নিয়ম নয়।

তৃষ্ণা কথা কহিল না। নিঃশব্দে নতমুখে চলিতে লাগিল। খানিকটা গিয়াই সে হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল, কহিল: ঐ, যাঃ...দাঁড়াও তো, দাঁড়াও তো....

তিমির দাঁড়াইতেই তৃষ্ণা ঠোঙা হইতে আবীরটা হাতে ঢালিয়া লইয়া তাহার পায়ের উপর ছড়াইয়া দিয়া পথেই তাহাকে নত হইয়া প্রণাম করিল, তারপর সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া হাসিয়া কহিল : আমি কী বলতো? যারা বয়সে বড়, তাদের মুখে মাথায় ফাগ না দিয়ে দিতে হয় যে পায়ে, সে কথা আমি ভুলেই গেছি।

: ছিঃ তৃষা, তুমি কী! নিজের তো অপমান কর্‌'লেই, সেই সঙ্গে আমারো?

খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে তৃষ্ণা কহিল: সত্যি বলতো, আমি কী? অপমান করা না হয় আমার স্বভাব, কিন্তু অপমানিত কেন হ'লাম?

পাশেই একটা পার্ক। তাহারা দুইজনে তাহার ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। লোকজন কেহ নাই। এককোনে একটা গাছের ছায়ায় সবুজ ঘাসের আস্তরণের উপর তৃষ্ণা পা ছড়াইয়া বসিয়া পড়িয়া কহিল: ওঃ, খিদেয় জ'লে পুড়ে ম'র্‌লাম, কিছু খাবার-টাবার নিয়ে এসো বাপু।

তাহারই অনতি-দূরে তিমিরও বসিল, কহিল: হ্যাঁ, খাবারের কথা শুনে একটা কথা আমার মনে প'ড়লো। একদিন একটা সদ্য-তপ্ত-ঘৃত-মুক্ত সিঙ্গাড়া নিষ্ঠুরভাবে আমার জিবখানাকে পুড়িয়ে দিয়েছিলো। সে আমার উদর আর জিহ্বাকে যত না আনন্দ দিয়েছিলো জ্বালার যন্ত্রণা দিয়েছিলো তার চেয়ে বেশী। সেই থেকে কামিনী-কাঞ্চন-বিষের সঙ্গে আমি খাবারের তুলনা ক'রে আসছি এবং সেই থেকে খাবারের উপর জন্মেছে আমার নিষ্কাম প্রেম। খাবারের উপর আমার অনন্ত ভালোবাসা আছে, কিন্তু কামনা নেই।

তৃষ্ণা হাসিয়া কহিল: আসলে এটা শৃগালের বৈরাগ্য। কত দুঃখে যে আঙ্গুর ফলগুলি টক্ হ'য়ে যায় তা জানে সে আর জানো তুমি, তার বন্ধু।

তিমির কহিল: না, শৃগালের বৈরাগ্য অভাবে, আমার বৈরাগ্য স্বভাবে।

আমার আগের কথাটা না বিশ্বাস করো কিন্তু এটা তোমার বিশ্বাস করা উচিত যে শ্রদ্ধায় ও সম্মানে আমি খাবারের অঙ্গ সহসা স্পর্শ করি না, খাবার আমার কাছে পবিত্র সতীনারীর মতো।

তৃষ্ণা হাসিয়া কহিল : তুমি সাধু, কিন্তু স্বল্পবুদ্ধি, কিন্তু যাবে? না, এমনি ক'রে শুকিয়ে মারবে?

তিমির কহিল : যেতে পারি, কিন্তু তুমি আমার হাতে খাবে কী ক'রে তৃষা?

: কেন তোমার হাতে কী?

তিমির সহসা যেন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, কহিল : আমার হাতে শুধু নয় তৃষা, আমার মাথায় বক্ষে আর ললাটে, আমার রক্তে অস্থিতে আর মজ্জায়, আমার শব্দে গন্ধে আর স্পর্শে, আমার অঙ্গের প্রতিটী কোনায়, আমার দেহের জীবন্ত আর মৃত অস্তিত্বে সে কী মারাত্মক সংক্রামক বীজানু! আমার ধমনী আমার স্নায়ুশিরা আমার বক্ষস্পন্দনের প্রতিটী নিঃশ্বাস বিষাক্ত। আমার সর্ব্বদেহ বিপদ-সঙ্কুল, আমার প্রতিটী পদক্ষেপ ভয়ঙ্কর। আমি কলেরা, প্লেগ, বসন্ত, আমি মহামারী, আমি নিদারুণ ব্যাধি; তাই আমি মানুষের হতাশার, মানুষের আশঙ্কার, মানুষের নির্য্যাতনের। তাই মানুষ চলে আমাকে এড়িয়ে। আমি কী নই তৃষা! আমি সব। আমি এ পৃথিবীতে অনাহুত, রবাহুত; তাই উপেক্ষিত ও অবহেলিত, তাই সর্ব্বজনের অকাম্যের ও অনাকাঙ্খার। আমি গলিত শব, আমি বদহজমের উদ্গার, আমি আবর্জ্জনা, আমি কৃমি-কীট; আমি তাই অপবিত্র অশুচি ও অস্পৃশ্য। আমি মানুষ কীসে তৃষা? মানুষ যদি, আমি পথের পাশে প'ড়ে কেন? নেই কেন আমি মানুষের দলে? সমাজ সংসার এবং মানুষেরা কেন আমাকে ঠেলে দিলে অপমানের ডালা মাথায় চাপিয়ে? একপথে পাশাপাশি চ'লেছিলাম যাদের নিয়ে কেন তারা স'রে গেলো সসঙ্কোচে?

একটু থামিয়া সে পুনরায় কহিল : এ পৃথিবীতে আমার দাবী নেই,

সংসারে আমি অহেতুক, অকারণ। আমার জন্মলগ্নে বাজেনি কোন মঙ্গলশাঁখ, ছিলো না কারো শুভদৃষ্টি, ছিলো না কোনো দেবতার আশীর্ব্বাদ। আমার জন্ম গোপনীয় ও নিরানন্দের। আমি মূর্ত্তিমান বিদ্রূপ ও উপহাস! তাই তো ভূমিষ্ঠ হবার জন্যে আমার ভূমি নেই! আমি যে অঙ্কুরেই বিনাশের বস্তু, আমার অবাঞ্ছিত আবির্ভাব তাই তো এত লজ্জার, তাই তো আমার অস্তিত্ব এত অসহ্য। আমি পৃথিবীতে আকস্মিক ও মিথ্যা, আমায় সরিয়ে ফেলার জন্যে তাই তো এত দিকে দিকে আয়োজন। অঙ্কুরে নির্দ্দয় হত্যার হাত এড়িয়ে যে বেঁচে উঠ্‌লো সে বেঁচে থাকবে অন্ধকারের গোপন গুহায়, সবার নীচে অমানুষের দলে, নিপীড়িত আর অপমানিতের দলে। বেদনার কশাঘাতের মাল্য-চন্দনে তার সুস্বাগতম্। এই ত নিয়ম। তাই আমি আছি, তাই আমি থাকি লোকচক্ষুর আড়ালে মানুষের পবিত্র সত্ত্বা থেকে দূরে—সবার নীচে ভয়ে ভয়ে, পাছে কাউকে কলুষিত করি! তোমাদের থেকে আমি অনেক দূরে তৃষা ; আমাদের স্থান কোথায় ? তোমরা যদি থাক দোতলায় আমরা থাকি একতলায়, তোমরা যদি একতলায় আমরা রাস্তায়, তোমরা যদি রাস্তায় আমরা কোথাও নেই। আমার হাতে খাবে কী তৃষা ? কুকুরকে কোলে নিয়ে খাওয়া চলে তো আমাদের পাশে নিয়েও চলে না।

তৃষ্ণা অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল, তারপর আস্তে আস্তে বলিল : আমি যদি বলি, আমি ও সব মানি না।

তিমির সোজা হইয়া বসিয়া কহিল : মানো না ? চুপ! দ্বিতীয়বার উচ্চারণ কোরো না এ কথা। ঝন্ ঝন্ ক'রে বেজে উঠ্‌বে শাসকের উন্মুখ শৃঙ্খল। রক্ত চক্ষু নাচিয়ে খুঁজ্‌ছে সে তোমার মতন শিকার। তোমার ক্ষীণতম ভ্রান্তিতে, ক্ষীণতম অপরাধে লাফিয়ে উঠে টেনে ধরবে তোমার টুঁটি। তোমার নিষ্পাপ আত্মার মাঝে কল্পিত পাপের ছলনা এনে তোমায় উৎখাত নিশ্চিহ্ন করে দেবে সংসার থেকে। যাবে কোথায় তৃষা ? পালাবে কোথায় ? তার হাত এড়িয়ে যাওয়া বড় কঠিন। অন্তঃপুর হ'তে টেনে তোমায় নাবিয়ে

দেবে পথে, নির্ম্মল শুদ্ধ-সুন্দর ক'রে তোল্‌বার আছিলায় ক'রে তুল্‌বে ক্লেদ-ক্লিন্ন। কণ্ঠে তোমার পরিয়ে দেবে লাঞ্ছনার মালা, মাথায় চাপিয়ে দেবে অপমানের ডালা, নির্য্যাতনের হুতাশনে পুড়িয়ে তোমায় ক'রে তুল্‌বে মৃত্যু-ক্ষুধাতুরা। মানুষের পবিত্র সভার পথে প'ড়্‌বে তোমার বাধা, মন্দিরের রুদ্ধ দ্বারে ব'সে কেঁদে কেঁদে তোমার অশ্রুকাতর চোখ হবে অন্ধ, তুমি হবে পৃথ্বি-পূজা উৎসবের মঙ্গলমাল্য হ'তে খসে-পড়া অবাঞ্ছিত ঝরাফুল।

তৃষ্ণা আর কথা কহিল না, পা গুটাইয়া নতমুখে নীরবে বসিয়া রহিল। মাথার উপর ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল ফাল্গুনের আগুন। গাছের তলা হইতে ছায়া সরিয়া গিয়া রৌদ্রের পথ করিয়া দিতেছিল।

কতক্ষণ নীরবে কাটাইবার পর তৃষ্ণা কহিল: তোমার মুখটা খুব শুকিয়ে গেছে। তুমি খুব ক্লান্ত।

তিমির ম্লান হাসিল, কহিল: শুক্‌নো মুখই আমার স্বাভাবিকতার লক্ষণ, আমার সরস মুখ আমাকে চমকে দেয়। আমার জীবনে কোথাও ছায়া নেই ব'লেই ক্লান্তিতে আমি অশ্রান্ত। কিন্তু আমার চেয়ে যে তোমার মুখ শুকিয়েছে বেশী। কবে খেয়েছিলে তুমি?

: কাল দুপুরে। কী ভাগ্যি এত তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা কর্‌লে। না হ'লে তো আমি অভিমানে চ'লেই যেতাম।

তিমির কহিল: যারা তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করে তারা অতিথি-বৎসল, সে রসে বঞ্চিত আমি, কিন্তু তুমি তো তবু কাল দুপুরে খেয়েছো, আমি যে পরশু রাত্রে।

তৃষ্ণা বিস্মিত হইয়া কহিল: পরশু রাত্রে!

: হ্যাঁ পরশু রাত্রে, এবং প্রাতরাশ হ'য়েছে কাল বিকেলে, আমাকে মরুভূমি পার হ'তে হয় কিনা, তাই আমার খাওয়া উটের জল সঞ্চয়ের মতো।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তৃষ্ণা ঘাসের উপর কাত হইয়া শুইল, কহিল: আঃ, ঘাসের উপর শুতে কী আরাম। যখন খিদে পায় তখন হাঁটতেও ইচ্ছে

করে না, ঘুমও আসে না, কেবল গড়াতে ইচ্ছে করে, রোদ না থাকলে সমস্ত মাঠটায় আমি গড়াতাম।

: কিন্তু আমার খিদের খাদ্য হ'চ্ছে ঘুম, খিদে পেলেই আমার ঘুমটা জমে ভাল। মেয়েদের বিয়ে না হ'লে খিদে সহ্য করার অভ্যেস হয় না। যাও একটা হোটেল থেকে খেয়ে এসোগে।

তৃষ্ণা বিরক্ত হইয়া কহিল: অমন কানের কাছে বকর্ বকর্ কোরো না বাপু, আমার মাথার ঠিক নেই। দিন দুপুরে এলেন সাপের মন্তর ঝাড়তে।

খানিক নীরবে কাটাইবার পর তিমির উঠিয়া দাঁড়াইতেই মাথা তুলিয়া তৃষ্ণা কহিল: কোথায় যাওয়া হ'চ্ছে শুনি?

তিমির জবাব দিল না, দাঁড়াইয়া রহিল।

তৃষ্ণা পুনরায় কহিল: বাপ্‌রে, খালি ট্যাকেই চল্‌লেন খাবার আন্‌তে। দরদ আর ধরে না। ফোতো বনেদীর চাল, সব গেছে আছে লজ্জাটুকু, কেন পয়সা চাইতে কী হ'য়েছিলো? : উঠিয়া বসিয়া বুকের ভিতর হইতে ছোট্ট একটা মনিব্যাগ বাহির করিয়া তাহা হইতে গোটা কয়েক টাকা ফেলিয়া দিয়া কহিল: কেপ্পনের মত পিঁপড়ের পেটের মাপের খাবার এনে হাজির কোরো না যেন, বেশী ক'রে এনো। আর জলও এনো ঐ সঙ্গে।

তিমির হেঁট হইয়া টাকা কয়টা কুড়াইয়া লইয়া চলিয়া গেল।

খানিক দূর যাইতেই তৃষ্ণা পিছন হইতে চেঁচাইয়া কহিল: টাকা কটা গাপ ক'রে পালাবে না তো?

তিমির মুখ ফিরাইয়া কহিল: যেতেও পারি, আমাদের মত ছোট লোকদের ওটাই কিন্তু স্বভাব।

খাবার আসিল। একরাশি খাবার। লুচি, তরকারী, আর সন্দেশ। একটা কাচের গ্লাস ভরা জল।

ঠোঙাটা হাতে লইয়া তৃষ্ণা কহিল: এত শালপাতা এনেছো কেনো? তুমি ভেবেছো তোমার খাবারো এতে আছে, নাকী?

তিমির বসিয়া কহিল : খেটে খুটে মানুষ মজুরীটাও তো আশা করে।

: কিছু না, ঐদিকে মুখ ক'রে ব'সে থাকো, এ সবই আমার লাগবে : বলিয়া তৃষ্ণা একটা পাতার উপর কিছু খাবার নামাইয়া লইয়া খাইতে লাগিয়া গেল।

কিছুক্ষণ খাইবার পর তৃষ্ণা ঘুরিয়া তিমিরের দিকে পিছন ফিরিয়া বসিল, কহিল : খিদের সময় একটু শান্তিতে ব'সে খাবো তারো উপায় নেই, পেটুক অমনি ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে আছে।

তৃষ্ণার রকম দেখিয়া তিমির না হাসিয়া থাকিতে পারিল না, কহিল : ওতেও হবে না তৃষা, আমার দৃষ্টি তোমার পিঠ ফুঁড়ে যাচ্ছে।

: তাই বটে, কাঙালের দৃষ্টি তীরের ফলার চেয়ে ধারালো, নাও, বোসো : বলিয়া তৃষ্ণা ঘুরিয়া বসিয়া আর এ কটা পাতার উপর তিমিরের খাবার গুছাইয়া দিয়া বলিল : আর নজর দিও না, এদিকে ঘুরে বোসো।

তিমির পাতাটা টানিয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ খাইতে বসিয়া গেল। কিন্তু তৃষ্ণা তাহাকে যৎসামান্যই দিয়াছিল। বারকয়েক মুখ নাড়িতেই তাহা শেষ হইয়া গেল। তখন সে খালি পাতাটা সম্মুখে লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

তৃষ্ণা চিবাইতে চিবাইতে আড়চোখে একবার দেখিয়া লইয়া কহিল : ব'সে আছো কেনো, যাও, কল থেকে হাত ধুয়ে এসো গে।

তিমির কহিল : পেটের কোণাচ্ টাও ভর্‌লো না বটে, কিন্তু এতেই আমার অন্ততঃ একটা দিন কেটে যাবে : বলিয়া সে আস্তে আস্তে উঠিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

তৃষ্ণা কহিল : ভ'রবে কী ক'রে, পেটে যে দিস্তা দু'চারের জায়গা ক'রে রেখেছো! আমাদের বাড়ীতে একদিন একটা চাকরকে আদর ক'রে ব'সে খাইয়েছিলাম, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তার সাম্‌নে লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে তবে ভাণ্ডার রক্ষা ক'র্‌তে হয়েছিলো। নাও, উঠ্‌তে হবে না বোসো, ভালো ক'রে খেতেই যখন হবে তখন সরেই এসো না কাছে, এক মাইল দূরে ঘুরে ঘুরে আমায় পরিবেশন কর্‌তে হবে নাকী? : বলিয়া সে তিমিরের এঁটো

পাতাটা ডানহাত দিয়া কাছে টানিয়া আনিয়া পুনরায় তাহাতে খাবার তুলিয়া দিল।

কিছুক্ষণ খাইবার পর তৃষ্ণা কহিল: অমন্ 'চাকুম' 'চাকুম' ক'রে খাচ্ছ কেন? এ বিশেষ শব্দটা গৃহপালিত একটা বিশেষ জন্তুর পক্ষেই সম্ভব।

তিমির কথা বলিল না। নতমুখে একমনে খাইতে লাগিল।

তৃষ্ণা কহিল: যারা খেতে খেতে একবার মুখ তোলবারো অবসর পায় না, একটা কথাও বলে না, মনে হয় তারা জন্ম-কাঙাল।

তিমির মুখ না তুলিয়াই কহিল: আমি তো জন্ম-কাঙালই. আমার ধনী হওয়াটা একটা ঘটনা-চক্র ছিল বৈত নয়।

তৃষ্ণা কিছুক্ষণ নীরবে তিমিরের মুখের পানে তাকাইয়া রহিল পরে একসময়ে আস্তে আস্তে তিমিরের কাছে সরিয়া আসিয়া কহিল: দেখি, তোমার পাতে কী আছে? কই মিষ্টি নেই যে—মিষ্টিগুলো তুমি সব খাও, ও আমি খেতে পারি না, তরকারীও নাও, পেট খালি রেখে খেও না, আমি জানি, আমার চেয়ে তোমার বেশী খিদে পেয়েছে। দিনের পর দিন খালি পেটে কাটাতে তোমার কত কষ্ট হয় বলতো? : বলিয়া সে সযত্নে খাবারগুলি সাজাইয়া সাজাইয়া তাহার পাতে তুলিয়া দিতে লাগিল।

তিমির খাওয়া বন্ধ করিয়া অবাক হইয়া তৃষ্ণার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

তৃষ্ণা হাসিয়া কহিল: আমার মুখে কোন খাবার নেই, খাবার তোমার পাতে। তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও, বেশী ধুলো আর না জমতে দেওয়াই ভাল, মনে থাকে যেনো মাঠে ব'সে খাচ্ছো: তারপর চুমুক দিয়া গ্লাসের জলটা পান করিয়া লইয়া কহিল: তুমি খাও ততক্ষণ, আমি আস্ছি, কেমন? : বলিয়া সে গ্লাসটা হাতে লইয়া উঠিয়া গেল।

রাস্তার কল হইতে জল ধরিয়া আনিয়া তিমিরের হাতে দিয়া কহিল: এরি মধ্যেই খাওয়া হ'য়ে গেলো? ও আমার সাম্‌নে তোমার খাওয়া ভাল হচ্ছিল না বুঝি?

তিমির কহিল ঃ ভালোই হচ্ছিল, কেবল শেষের দিকে খানিকটা গুলিয়ে গেলো। কিন্তু তৃষা, এই কী তোমার আসল রূপ ?

তৃষ্ণা পুনরায় রূপ ফিরাইয়া কহিল ঃ থাক্ জলটা তুমি খেয়ে নাও, আমার আসলরূপ তোমায় চিন্‌তে হবে না।

পড়ন্ত বেলায় তাহারা পার্ক হইতে বাহির হইয়া আসিল। খাদ্য যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহা ভাল করিয়া পাতা দিয়া মুড়িয়া পার্কের মাধবী লতা দিয়া জড়াইয়া বাঁধিয়া তৃষ্ণা তাহা তিমিরের কাঁধে ঝুলাইয়া দিয়াছে। দেশের এই খাদ্য-সমস্যার দিনে খাদ্যের অপব্যয় করা দেশের শত্রুতা করা মাত্র। দেশপ্রেমিক তিমিরের ইহা করা মোটেই উচিত হইবে না ইহা তৃষ্ণা তাহাকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দিয়াছে। তাহা ছাড়া তিমিরের কাছে টাকা-পয়সা নাই। আজ না হয় তৃষ্ণা সঙ্গে আছে বলিয়া তাহার ভাল ভাবেই কাটিয়া গেল। কিন্তু সে যখন চলিয়া যাইবে তখন তিমির কী করিবে ? ঐগুলা সঙ্গে রাখিলে অন্ততঃ দিন কয়েক তাহার নির্ভাবনায় কাটিয়া যাইবে। আর কাচের গ্লাসটা যখন কেনাই হইল তখন তিমিরের মাটীর ভাঁড়ে কিংবা টিনের মগে জল খাইবার প্রয়োজন কী ? তৃষ্ণার অকাট্য যুক্তিগুলি তিমির খণ্ডন করিতে পারে নাই। সুতরাং বাঁ হাতে কাঁচের গ্লাস আর ডান কাঁধে দুর্দ্দিনের জন্য সঞ্চিত খাদ্য সম্ভার বহিয়া লইয়া তিমির আস্তে আস্তে পথ চলিতেছে। পাশে তৃষ্ণা টিপি টিপি হাসিতেছে।

ঃ কোত্থেকে ফির্‌ছো ? বিয়েবাড়ী না শ্রাদ্ধবাড়ী ?

ঃ কোনোটাই না, মনের খুসীর দ্বার থেকে।

ঃ কার মনের খুসী ?

ঃ একটী সুন্দরী রমণীর।

ঃ কেমন বিদেয় কর্‌লো ?

ঃ খুব ভাল, তিনি যে মহাপ্রাণা।

ঃ পাত-কুড়োনো তো অনেক পেয়েছো, পয়সা কত দিলো ?

ঃ পয়সা দেননি, পয়সার বদলে সুন্দরী নিজেই সঙ্গে আস্‌ছেন।

তৃষ্ণা হাসিল, কহিলঃ তোমার কথার গতিভঙ্গীগুলো মন্দ লাগে না, আনন্দ পাই।

তিমির কহিলঃ আমি আনন্দ পাই তুমি যখন আমাকে আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করো।

তৃষ্ণা কহিলঃ সমস্ত বেসুরোর মাঝে তোমার ভিতর বুঝি একটী সুরোলো যন্ত্র আছে। তাই বুঝি তুমি আঘাতে বেজে ওঠো।

দুটী রুগ্ন ভিক্ষুক রাস্তার পাশে হাত পাতিয়া বসিয়া আছে। যাইতে যাইতে তিমির তাহাদের সাম্‌নে দাঁড়াইয়া পড়িল। খাবারের বাণ্ডিলটা কাঁধ হইতে নামাইয়া বাঁধন খুলিয়া তাহাদের সামনে আগাইয়া দিল। কী দুর্ব্বার আনন্দ তাহাদের। দুঃখে যাহারা এতদিন বাঁচিয়া ছিল, সুখে বুঝি আজ তাহারা মরিয়া যাইবে। কাচের গ্লাসটাও তাহাদের সাম্‌নে রাখিয়া দিয়া তাহারা পুনরায় পথ চলিতে লাগিল। তিমির কহিলঃ সত্যিকারের নারায়ণ কখনো দেখেছো তৃষা?

ঃ দেখবার জন্যে কোনোদিন তপস্যা করিনি।

তিমির কহিলঃ তপস্যার প্রয়োজন নেই। চোখ ফেরালেই দেখা যাবে বাংলাদেশের অলিগলি ছেয়ে রয়েছে নারায়ণের দল। ব'সে রয়েছে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের নৈবেদ্যের প্রতীক্ষায় নয়, বিশ্বমানবের অভিন্নহৃদয় বন্ধুত্বের কামনায়। পরিপূর্ণ উপচার থালার প্রত্যাশী এরা নয়; এরা প্রত্যাশী মাত্র যাহোক কিছুর, একটু কিছুর। মানুষ বাছবার জন্যে জাগ্রত নেই এদের চোখ—ব্রাহ্মণ কিংবা শূদ্র, স্পৃশ্য কিংবা অস্পৃশ্য—যেই হও তুমি, যাবার পথে দিয়ে যাও কিছু, এদের পায়ে নয়—হাতে; নিয়ে যাও এদের হর্ষোচ্ছল সহজ মুখের হাসি আর মুক্তস্রোত অকৃপণ আশীর্ব্বাদ। এরা বাংলা দেশের আঁধার-দেউলের তাকে-তোলা স্পর্শ-ভঙ্গুর ঠুন্‌কো নারায়ণ নয়, এরা বিশ্বমানবের প্রেমাকাঙ্ক্ষী আলিঙ্গনকামী সত্যিকারের অপরূপ নারায়ণ।

বহুরাত অবধি লক্ষ্যহীন এলোমেলো পথে তাহারা ঘুরিয়া বেড়াইল, পাহাড়-ছাড়া দুইটী স্রোতের মত, এদিকে ওদিকে। সরীসৃপের মত আঁকা-বাঁকা পথে আঁকিয়া বাঁকিয়া অবিরাম পথ-চলা। দুজনেরই মুখে ঝরঝর কথার শ্রাবণ। প্রয়োজন-হীন পদক্ষেপ—তাই তাহাতে অধীরতা নাই, ব্যাকুলতা নাই। চলিতে চলিতে তাহারা দাঁড়াইয়াছে, বসিয়াছে, অকারণে রাস্তার মোড়ে দাঁড়াইয়া দুইজনে ঝগড়া করিয়াছে। কখনো বা নিঃসঙ্কোচ হাসি আর আলাপের ঝলকানিতে চমকাইয়া দিয়াছে পথের জনতাকে এই দুইটী আপাদমস্তক রঙে-রাঙা মানুষ। চলিতে চলিতে পথের দুই পাশে তাহারা বাড়ী ভাড়া খুঁজিয়াছে। এবং খুঁজিয়া খুঁজিয়া অবশেষে মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছে এই নগরীতে ঘর-বাড়ী ভাড়া পাইবার মত উপযুক্ত পাত্রপাত্রী তাহারা নয়। যেখানে টু'লেটের বদলে ঝুলিতেছে 'বাড়ী ভাড়ার জন্য অনুরোধ করিবেন না' সেখানে অনুরোধ করিয়া তাহারা তিরস্কৃত হইয়াছে। তাহাদের যুগলমূর্ত্তি সন্দেহজনক, তাই তৃষ্ণাকে পথের উপর দাঁড় করাইয়া তিমির কোথাও কোথাও একাই চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু সে সংসারহীন, তাই বেপরোয়া ও বিপদজনক এই আখ্যা পাইয়া নির্ব্বিবাদে তাড়া খাইয়া আসিয়াছে। আবার তৃষ্ণা যেখানে একা গিয়াছে, বাড়ীওয়ালার বিস্মিত দৃষ্টি লাভ করিয়াছে এবং কলিকাতার কয়েকটী বিশেষ অঞ্চলে বাড়ী খুঁজিবার উপদেশ লাভ করিয়া সসম্মানে ফিরিয়া আসিয়াছে।

তিমিরের মাথায় গোপনে গোপনে ফিরিতেছিল আজিকার রাত্রিযাপনের চিন্তা। তৃষ্ণার মনে সে চিন্তা আদৌ ছিল না। তাহাকে দেখিলে মনে হয় সে যেন আত্মনির্ভর হওয়ার কথা ভুলিয়াই গিয়াছে। গতদিনের রাত্রিবাসের ঠাঁইএর কথা মনে করিয়া সে একবার ভাবিল, যেমনই হউক যে লোকটার পাশে পাশে সে পথ চলিতেছে, সে ভূমিশূন্য হইলেও এই মহানগরীতে তাহার স্থানের অভাব নাই। যেখানেই হউক সে তাহাকে লইয়া আশ্রয় গ্রহণ

করিবে। সে স্থান বাসপোযোগী না হইতে পারে, কিন্তু ইহা স্থির যে সে-স্থান কুৎসিত অধঃপতনের পথে নয়।

এদিক ওদিক আশ্রয় অন্বেষণ করিতে করিতে হঠাৎ তিমিরের মনে পড়িল, আজ বুধবার সপ্তাহের এই দিনটায় রাত্রে মাখন কোনদিন বাসায় থাকে না, অতিবড় দুর্দ্দিন দুর্য্যোগেও না। তিমির তাহা জানিত। সুতরাং বাসাতেই গিয়া তৃষ্ণাকে লইয়া আজিকার রাত্রিটা স্বচ্ছন্দে কাটাইয়া দেওয়া যাইতে পারে ইহা ভাবিয়া গভীর রাত্রিতে তাহারা দুইজনে আহিরীটোলার বাসার কাছে আসিয়া পৌছিল।

ঘরে ঢুকিবার আগেই তৃষ্ণা ব্যস্ত হইয়া কহিল : আগে বাথ্‌রুম্‌টা দেখিয়ে দাও দেখি—চান্‌ ক’র্‌বো ; বাবাঃ, রঙে আবীরে আর ধূলোয় গা-হাত যেনো নর্দমা হ’য়ে আছে।

: ঠাণ্ডায় রাতের বেলা চান করবে ?

: হোক্‌ ঠাণ্ডা, অমন গাবুরের মতন নোংরা গায়ে আমি থাক্‌তে পারি না।

: এসো তবে, খুব সন্তর্পণে যেতে হবে, না হ’লে পরিষ্কার হ’তে গিয়ে আরো নোংরা হ’য়ে পড়বে : বলিয়া কয়েক পা আগাইয়া গিয়া একটা অতি-সঙ্কীর্ণ গলির মুখে দাঁড়াইয়া তিমির কহিল : যাও, আট দশ পা গিয়েই দেখতে পাবে বাঁ দিকে টিনের দেওয়ালের গায়ে মানুষ গল্‌বার মতো একটা ফুটো, হেঁট-হ’য়ে সেখানে ঢুক্‌লেই পাবে একটা কল আর একটা চৌবাচ্চা, কলে এত রাতে আর জল নেই, চৌবাচ্চায় হয়ত একটু-আধটু আছে, ইচ্ছে হ’লে টুপ করে তাতে নেবেও প’ড়্‌তে পার্‌বে। তার ওদিকে আর যেও না কিন্তু, মহিষের খোঁয়াড় আছে, এত রাতে তাদের রোমন্থনে বাধা প’ড়্‌লে সুন্দরী রমণী ব’লে তোমায় ক্ষমা ক’র্‌বে না। যাও, তিড়বিড় ক’রে যেও না যেন, মাত্র একহাত চওড়া রাস্তা, বাঁ দিকে পচা নর্দমা, আর ডান দিকে ঐ সব বাড়ীর জানালা থেকে পড়ে খবরের কাগজে মোড়া দুধে-ছেলেদের মল। সুতরাং—

: আলো নেই ?

: না, ওদিকটা একদম্ ফাঁকা। এখানে যারা স্নান করে তাদের অনেকেরই একখানা কাপড়। সুতরাং রাত্রি ছাড়া তাদের স্নানের সুযোগই হ'য়ে ওঠেনা, সে সুযোগও নষ্ট হয়, যদি আলো থাকে। সুতরাং ও ঝামেলা সম্প্রতি নষ্ট করা হ'য়েছে। তা যাও, পরিপূর্ণ স্নানের আনন্দ পাওয়া এবং দেহ সাফ্ করাই যদি তোমার উদ্দেশ্য হয় তবে অপ্রকাশ্যে ও অন্ধকারেই তা সুবিধে হবে।

তৃষ্ণা ঘাড় ফিরাইয়া তিমিরের দিকে একটা তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিল, তারপর গলির নিরন্ধ্র অন্ধকারের দিকে একবার তাকাইয়া কহিল: থাক্, আমি চান্ করবো না, আমার প্রাণের মমতা আছে।

তিমির কহিল: তা যদি থাকে ঐ রাস্তার ওপোর একটা টিউবওয়েল আছে সেখানেও যেতে পারো। লোকজন নেই, গ্যাসের আলোও পাবে।

: একা একা জল টেনে আবার চান করা যায় নাকী ?

তিমির কহিল: যদি বলোতো আমিই টেনে দিতে পারি, তুমি নীচে বস্‌বে, আমি অবশ্য চোখ বুজিয়েই থাক্‌বো।

ঘরের দিকে পা বাড়াইয়া তৃষ্ণা কহিল: তুমি যে কতবড় সাধু তা তোমার বেহায়া কথা গুলো শুনেই বোঝা যাচ্ছে।

দুইজনে আবার ঘরের কাছে আসিয়া পৌঁছিল। দরজার তালা অর্থাৎ নারিকেল দড়ির বাঁধন খুলিতে খুলিতে তিমির কহিল: ঘর পেয়ে যেনো লাফালাফি কোরো না, খুব সাবধানে ঢুক্‌বে। ঢুকেই ডানদিক চেপে দাঁড়াবে, বাঁ দিকে আমার বিছানা আছে।

: উঃ, কী অন্ধকার! সুইচ কোথায় ?....ইস্: তৃষ্ণার পায়ের ধাক্কা লাগিয়া ঘট্ ঘট্ করিয়া কী যেন একটা গড়াইয়া পড়িল।

তিমির ব্যস্ত হইয়া উঠিল: থামো, থামো, নড়াচড়া কোরো না, মাথ্‌নার জলের কলসী উল্‌টে দিয়েছো, এ আমাদের নোতুন ধরণের সুইচ, তুমি টিপ্‌তে পারবে না।

তৃষ্ণা বিরক্ত হইয়া বলিল : তুমিই দয়া ক'রে টেপো না বাপু, তাড়াতাড়ি।

তিমির কথা বলিল না। শুধু মেঝের উপর খস্ খস্ করিয়া তাহার পায়ের সাড়া হইতে লাগিল।

তৃষ্ণা অতিষ্ঠ হইয়া কহিল : ও কী করছো ? আমার ঘাড়ে এসে পড়বে না তো ?

: না দাঁড়াও, সুইচ টিপ্ ছি : বলিয়া তিমির অন্ধকারে ঠাহর করিয়া আগাইয়া গিয়া কাঠের দেওয়ালের গায়ে একটি ছোট্ট গহ্বর খুলিয়া দিল। সেই ফাঁকে কোথা হইতে এক চিল্‌তে আলো ঠিকরাইয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া আসিল। তাহাতে ঘরটা আলোকিত হইয়া না উঠিলেও অন্ধকারটা কাটিয়া গেল।

সারা ঘরটায় একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া তৃষ্ণা কহিল : এই তোমাদের আলো ? এই তোমাদের সুইচ ? এই তোমাদের ঘর ?

তিমির হাসিয়া কহিল : বলেছি তো আমরা বিলাস-ব্যসনে বাস করি, আমরা এমন আলো পছন্দ করি, যা আলো অথচ অন্ধকার, যার জ্যোতি আছে, জ্বালা নেই। অর্থাৎ যেমন আলোয় নাকী পরীরা নাচে। আর সকাল হ'লে দেখতে পাবে ছোটখাট নয়, একটা বিরাট অট্টালিকার এটাও একটি কুঠ্ রী।

: কুঠ্ রী বোলো না, বলো কোটর : ছড়ানো মাদুরটার উপর তৃষ্ণা বসিয়া পড়িল, কহিল : একী খাওয়ার জলের কলসী, না পায়খানা যাওয়ার ভাঁড় ? তাও বসিয়ে রেখেছো আবার ঢোকার পথে, গেলো পা'টা আর জুতোটা আমার ভিজে।

জলের ভাঁড়টা সোজা করিয়া বসাইয়া দেয়ালের গায়ে পেরেকে ঝোলানো লুঙ্গিটা নামাইয়া দিয়া তিমির কহিল : নাও এইটে দিয়ে পাটা মুছে ফেলো, অতিথি তুমি, আস্‌বে জেনে পা ধোওয়ার জল তুলে রেখেছিলাম : বলিয়া সে কোনের জলনালা হইতে একটা ছেঁড়া ন্যাকড়া টানিয়া বাহির করিয়া মেঝের জলটা মুছিতে লাগিল। মোছা শেষ করিয়া কহিল : তুমি কোন্ বিছানায় শোবে ?

বিছানা অর্থাৎ দুটি মাদুর। তৃষ্ণা কহিল : আমি জানালার দিকটায় শোবো, একটু হাওয়া না হ'লে আমি বাঁচবো না।

তিমির কহিল : ভালোই হোলো, আমি হাওয়া মোটে সহ্য করতে পারি না, এ মাদুরটা তুমি নাও, ওটা আমার মাদুর।

তৃষ্ণা জানালার ধারের মাদুরটার উপর বসিয়া কহিল : এটাতেই আমি শোবো, ওসব অপরের মাদুরে-টাদুরে আমি শুতে পারি না।

তিমির কহিল : আমিই বা তোমার কী এমন আপনার ?

তৃষ্ণা শুইয়া পড়িয়া কহিল : না, তা নয় বটে, তবু কিছু-দিনের চেনা। অচেনার চেয়ে চেনাটা একটু কাছের বৈকি : তারপর তিমিরের শয্যার দিকে একবার তাকাইয়া জানালার কাছে যথাসম্ভব সরিয়া গিয়া শুইয়া কহিল : ধুৎ তুরি, এমন ঘর যে উনি শুলেই ওর নিঃশ্বাস এসে লাগবে আমার নাকে।

আলো নিভাইবার আগে তিমির কহিল : দাঁড়াও, মাঝখানে একটা পার্টিশান তুলে দিই, তুমি নাবালিকাও নয়, বৃদ্ধাও নয়, তুমি এমন কিছু যাতে তোমার অস্বস্তি হওয়া স্বাভাবিক : বলিয়া সে একখানা কাপড় লইয়া মাঝামাঝি লম্বাদিকে টাঙাইয়া দিতে লাগিল।

তৃষ্ণা শুইয়া শুইয়া দেখিতে দেখিতে কহিল : অতি সাধুতা শেষে চোরের লক্ষণে না পরিণত হয়....হুঁ, ছেঁড়াটা কিন্তু ঠিক চোখের কাছেই রাখা হ'য়েছে।

: আচ্ছা ওটা ঘুরিয়েই দিচ্ছি।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া তৃষ্ণা হঠাৎ ধমকাইয়া উঠিল : থাক্ বাপু, ঢের হ'য়েছে, এতরাতে ঐ দুর্গন্ধ কাপড়-চোপড় নিয়ে নাকের কাছে নাড়া চাড়া কোরো না, গন্ধে ঘুম তো ঘুম, ভূতও পালিয়ে যায়।

তিমির ধমক খাইয়া কাপড়টা রাখিয়া দিয়া আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়িল।

তৃষ্ণা কহিল : দেখো, রাত্রে গড়িয়ে গড়িয়ে যেন এদিকে পৌঁছে যেও না।

তিমির কহিল : না যাওয়াটাই অস্বাভাবিক হবে, কিন্তু দেখতেই পাচ্ছো

কোনদিকেই আমার স্বাভাবিকত্ব কিছুই নেই, সুতরাং আমকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ক'রে তুমি নির্বিবাদে নাক ডাকাতে পারো।

দুইজনে নীরব হইল। গভীর রাত্রি। অন্ধকার ঘর। গোপন, নির্জন। তাহারই মাঝখানে এই পরিপূর্ণ অবসরে উছল যৌবনের শিখরে বসিয়াও অসীম সংযমী দুটি নরনারী শান্ত নিরুদ্বেগে সঙ্কীর্ণ কক্ষে স্পষ্ট ব্যবধান রচিয়া পাশাপাশি অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়া রহিল।

কোথা হইতে একটা ঘোঁ ঘোঁ শব্দ কানে আসিয়া বাজিতেছে। কিছুক্ষণ নীরবে শুনিয়া স্বর নামাইয়া সভয়ে তৃষ্ণা কহিল : ও আবার কী ?

তিমির হাসিল, কহিল : ওটা আমাদের রেডিও, বড়লোকের বাড়ীতো, দিন দুপুরে এবং রাত দুপুরের ঐ রেডিওর সঙ্গীত শুন্‌তে শুন্‌তে আমরা নিদ্রিত হই।

: রাত দুপুরের রেডিও !

: হ্যাঁ, এ রেডিও রাত দুপুরেই বেশী বাজে : একটু থামিয়া তিমির পুনরায় বলিল : ভয় পেয়ো না, পাশের বিড়িওয়ালার নাক ডাকৃছে।

ঠোট বাঁকাইয়া তৃষ্ণা কহিল : ফুঃ : একটু পরেই আবার কহিল : আচ্ছা, আমার গা'টা কেন ন্যাক্কার দিয়ে উঠ্‌ছে বলতো ?

: বোধ হয় বদহজম হ'য়েছে।

তৃষ্ণা কহিল : না, বোধহয় তোমার হাতে খেয়ে, ওয়াক্।

তিমির তাড়াতাড়ি কহিল : ওকী, বমি কর্‌বে নাকী ? যদি করো তো উঠে বাইরে গিয়ে কোরো, ঘর নোংরা কোরো না।

ঠোট বাঁকাইয়া তৃষ্ণা কহিল : ফুঃ, কয়লার আবার কালো হওয়ার ভয়; ঘর নয়তো, ডাষ্টবিনের অধম। দেখো, দিনের বেলা ঘরের দরজা যেন খোলা রেখো না, রাস্তার লোক ভুলে পায়খানা ব'লে ঢুকে যাবে।

পাশ ফিরিয়া তিমির কহিল : এত বিড়বিড় কোরো না বল্‌ছি, রাত হয়েছে, এটা বিশ্রামের জায়গা, যে বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটায় তাকে এখানে শুতে দেওয়া হয় না।

তৃষ্ণা কহিল : বেশ করবো, আমি বিড়বিড় করবো, গান গাইবো, দেওয়াল বাজাবো, কী ক'রবে তুমি ?

তিমির কহিল : শুধু গাইবে আর বাজাবে ? নাচবে না ?

: হ্যাঁ, দরকার হ'লে তাও করবো, ইচ্ছা করলে চ্যাঁচাতেও পারি, কী করবে তুমি, তাড়িয়ে দেবে ?

তিমির কহিল : না, সযত্নে কোলে তুলে নিয়ে বড় রাস্তায় রেখে আসবো।

তৃষ্ণা চুপ করিল, একটু পরে কহিল : আচ্ছা, আমি যদি এখন রাগ ক'রে চলে যাই, কষ্ট হবে না তোমার ? তুমি খুঁজতে যাবে না ?

তিমির নির্লিপ্ত ভাবে কহিল : হ্যাঁ, হায় হায় ক'রে কাছা-কোঁচা সামলাতে সামলাতে সারা কোলকাতা সহরটা তোলপাড় ক'রে ফেলবো, চেহারার বর্ণনা দিয়ে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে দেবো,—একটী সুন্দরী তরুণী একই শয্যার পার্শ্ববর্ত্তী বালিশ হইতে উধাও হইয়াছে, যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি সন্ধান পান অক্ষত অবস্থায় ফেরৎ দিলে ইত্যাদি ইত্যাদি। কোন দিকে ফল না হ'লে ফিরে এসে ঐ জানালার ধারে ব'সে চোখে আঁচল ঢাকা দিয়ে দু'এক দমকা কেঁদেও ফেলতে পারি।

তৃষ্ণা দেখিল, তাহার কথাটাকে তিমির ফুঁ দিয়া উড়াইয়া দিয়াছে। সে আর সাড়া করিল না, নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল। কতক্ষণ পরে হঠাৎ একসময়ে বলিয়া উঠিল : ঐ যাঃ—

: কী হোলো : অন্ধকারে তিমির মুখ ফিরাইয়াছে।

তৃষ্ণা কহিল : আজ যে আমার চ'লে যাওয়ার কথা ছিলো।

তিমির হাসিল, কহিল : দিনে কিংবা রাতে জাগরণে তা তো আর হোলো না, এবার দেখো যদি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যেতে পারো।

: কাল অব্যর্থ যাবো, সকালে উঠেই আমায় মনে করিয়ে দিও।

তিমির হাসিল, কহিল : একটী ছোট ছেলে তার মাকে বলছিলো, 'মা

রাতে আমার যখন পায়খানা পাবে আমায় ডেকে দিও' একথাটায় আর তোমার কথায় খুব বেশী তফাৎ নেই।

তৃষ্ণা সে কথার জবাব দিল না, পাশ ফিরিতে যাইয়া কাতর হইয়া কহিল : উঃ, কী এবড়ো খেবড়ো মেঝেরে বাবা, তার ওপোর শুধু মাহুর, তায় আবার চ্যাপটা কাঠের মত একটা বালিশ, মাথায় পিঠে ব্যথা হ'য়ে গেলো।

তিমির কহিল : মেঝের ও গর্ত্তগুলো আমাদের বাটী, ওতে আমরা ডাল ঢেলে খাই।

তৃষ্ণা সে কথায় কাণ দিল না, আগের সুরেই কহিল : তায় আবার সারাদিন ঘোড়ার মত দৌড় করিয়েছে, পাগুলো কন্ কন্ ক'রে খ'সে যাচ্ছে।

: টিপে দেবো ?

তৃষ্ণা কহিল : দিতে বল্‌তাম, কিন্তু আমায় ছুঁয়ে যে তোমার আরাম হবে, তাই দিতে দোবো না, ওঃ, ঘাড়টা ব্যথা হ'য়ে গেলো, তোমার বালিশটাও আমায় দাও না, একটু উঁচু হোক্।

তিমির কহিল : না, তোমার আরাম হবে, তাই দোবো না। তা ছাড়া মেয়েমানুষকে বেশী খাতির করা আমার ধাতে নেই, তারা মনে করে আমরা তাদের মন ভিজোচ্ছি।

: মন ভিজোতে পার্‌লে তো কৃতার্থ হও : বলিয়াই তৃষ্ণা হঠাৎ নাক মুখ সিট্‌কাইয়া উঠিল : উঃ, কীসের গন্ধ বলতো ?

বিনাবাধায় তিমির বলিল : বকুল ফুলের।

: রাম রাম, যেনো পচা নর্দমা, এই জানালার দিক থেকে আস্‌ছে।

তিমির কহিল : পাচ্ছো তা হ'লে ? ওটাই এ ঘরের বড় লজ্জা। ঠিক্ নীচে দিয়ে ড্রেনটা গেছে কিনা, জানালাটা না থাক্‌লে বোধহয় ঘরটা স্বাস্থ্যকর হোতো।

অন্ধকারে তৃষ্ণা উঠিয়া বসিল, কহিল : শোবো না আমি এদিকে, কিছুতেই না, ওঠো, এদিকে এসো তুমি, মোষের মত প'ড়ে ঘুম দেবার আয়োজন হ'চ্ছে,

স্বার্থপর কোথাকার, এই জন্যে বলে হাওয়া আমার সহ্য হয় না, ওঠো, ওঠো···· ওয়াক্ থু···· ঃ তৃষ্ণা সত্য সত্যই মাদুর আর বালিশ লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

তিমির পাশ ফিরিয়া ভাল করিয়া শুইয়া চোখ বুজাইল, কহিল ঃ তোমার কাপড়ের খানিকটা বেশ করে দু'নাকের ছাঁদায় গুঁজে জানালার দিকে পিছন ফিরে চোখ বুজে প'ড়ে থাকো, আর মালুম হবে না।

ঃ হ্যাঁ, নিজের মতন ইল্লং মনে ক'রছো আমাকেও, রাম রাম একী মানুষের ঘর! জানোয়ারেও ঢুকবে না এখানে, কই উঠেছো? কানে ঢুক্‌ছে না, নাকী? কই গো ঃ হাতের কাছে আর কিছু না পাইয়া তৃষ্ণা তাহার আঁচল দিয়া আন্দাজ করিয়া তিমিরের গায়ের উপর পুনঃ পুনঃ ঝট্‌কা দিতে লাগিল।

ঃ বাবা রে বাবা, মেয়ে বটে একখানা, ঐ গলির মোড়ে শোও গে যাও পরিষ্কার আছে ঃ বলিয়া তিমির উঠিয়া মাদুর খানা টানিয়া লইয়া জানালার ধারে পাতিয়া শুইয়া কহিল ঃ তুমি বিয়েই বা করনি কেন এদ্দিন? বিয়ে ক'র্‌লে তো এতক্ষণ স্বামীর সঙ্গে পালঙ্কে গদির উপর আরামে শুয়ে থাক্‌তে।

তৃষ্ণা রীতিমত ধমকাইয়া উঠিল ঃ চুপ করো, অত উপদেশ দিতে হবে না, যেমন মানুষ তেমন থাকো, আদা ব্যাপারীর অত জাহাজের খবরে দরকার কী ঃ বলিয়া মাদুরটা পাতিয়া তৃষ্ণা তাহাতে আস্তে আস্তে বসিয়া কহিল ঃ বিয়ে, ও নাম আর কোরো না, শুনলে গা জ্বলে যায়।

তিমির কহিল ঃ ও, ঐ যে আজকাল একদল নোতুন মেয়ে উঠেছে, যারা স্বল্পাবৃত ফ্যাশানে কাপড় প'রে রুজ লিপষ্টিক্ মেখে মেয়েদের বিয়েটাই আসল নয়, বিয়ের চেয়ে আরো বড় জিনিষ আছে ইত্যাদি হাঁক্ ডাক্ ক'র্‌তে ক'র্‌তে রাস্তায় বেরিয়েছে, তুমি বুঝি তাদের দলে?

ঃ মোটেই না, আমি রুজ লিপষ্টিক্ মাখি, স্বল্পাবৃত ফ্যাশানে কাপড় পর্‌তেও আমার বাধে না, কিন্তু বিয়ের চেয়ে বড় জিনিষকে পাওয়ার জন্যে বিয়েটাকে এড়িয়ে যাওয়ার মতন উদ্ধত ও অপদার্থ মন আমার কোনদিনই ছিল না। ব উল্টোটাই আমার মনে ছিলো, বিয়েটাকে এড়িয়ে নয় তাকে স্বাগতম্ জানি

সেই বড় জিনিষকে আমি পাবো এই আশা ছিলো। আমার একান্ত ইচ্ছে ছিলো বিয়ে কর্‌বার, স্বামী গ্রহণ কর্‌বার, কিন্তু কাকে আমি গ্রহণ কর্‌বো? এ দেশের কোন্ পুরুষটীকে এনে আমি আমার মনের কাছে বসাবো?

ঃ ও, মনের মতন পাত্র পেলে না বুঝি?

তৃষ্ণা কহিল ঃ না, সত্যিই পেলাম না। এ কথা শুনে তুমি ভাব্‌বে, নিজের রূপ গুণ সম্বন্ধে আমার খুব বড় ধারণা আছে এবং আমি দাম্ভিকা এ অপবাদটাও হয়ত তোমার মুখ থেকে বেরিয়ে আস্‌বে। কিন্তু আমি জোর ক'রে বল্‌তে পারি বাংলা দেশের কোন মেয়েরই উপযুক্ত পাত্র বাংলা দেশে নেই। বাংলার পুরুষের চেয়ে বাংলার নারীরা অনেক বড় একথা বল্‌তে আমার মুখে বাধে না। বঙ্গনারীর সুনামে শুধু দেশ নয় বিদেশও ছেয়ে আছে, কিন্তু বাংলার পুরুষরা সুনাম অর্জ্জন করা তো দূরের কথা দুর্নাম এড়াতেও পার্‌লো না। বাংলার মেয়েদের অবর্ণনীয় সৎগুণাবলীর কথা মনে রেখে বাংলার পুরুষরা যদি তাদের স্বভাব একটু বদলাবার চেষ্টা কর্‌তো, একটু ভদ্র হ'য়ে জীবন যাপন কর্‌তে চেষ্টা কর্‌তো, তাহ'লে দিকে দিকে হাজারে হাজারে বাংলার মেয়েরা এমন আত্মহত্যার মাঝে শান্তি খুঁজে বেড়াতো না। বাবা তখন বেঁচে আছেন। পাত্র এসেছিলো আমার তিনটী। একটী ধনী, একটী ছদ্মবেশী ধনী, একটী কেরাণী। আমরা বাঙালী তায় আবার মেয়ে। আমাদের মাথার ওপোরে আছে পুরুষ, তার ওপোরে আছে সমাজ, আমাদের শাসক অনেক। আমরা বহু-পরাধীন। এদের রক্তচক্ষুর নীচে থেকে, এই সঙ্কীর্ণ পারিপার্শিকের মাঝে দাঁড়িয়ে এই তিনটী পাত্রের কোনটীকে আমি বরণ কর্‌বো? ধনীদের আমি চিনি, তুমি তাদের যে বিশেষণ দিয়েছো তা ছেড়ে দিলেও তারা যে মানুষ নামের মধ্যে পড়ে না। তাদের পত্নীর অভাব নেই, তাদের আছে বাগান-বাড়ী। বাসরের পর থেকেই সহধর্ম্মিণীরা তাদের প্রোষিতভর্ত্তৃকা, স্ত্রীর চেয়ে এল্ হাউসে তাদের অগাধ প্রেম। তারা পাড়ার দুষমন্। প্রতি বাড়ীর বৌ-ঝিদের নালিশ শুন্‌তে শুন্‌তে

নিরুপায় সহধর্ম্মিণীর চোখের জল যার বেড়ে। তারপর কেরানী—এদের ঘরের ছবি রয়েছে আমার দুচোখে আঁকা। টানাটানি, অনশন, অর্দ্ধাহার ওদের স্ত্রীদের নিত্যদিনকার ব্যাপার। বাপের বাড়ী থেকে সরস একখানি শরীর ওখানে গিয়ে শুকিয়ে দুদিনে হ'য়ে দাঁড়ায় পোড়া কাঠ। কেরাণীর বউ স্বামীর গলা চেনেনা। বিয়ের পর তাদের মিলনের অবসর কোথায় ? ঐ ছদ্মবেশী ধনীর কথা আর নাইবা বল্‌লাম। কিন্তু তবু—তবু ইচ্ছা ছিলো এরই মধ্যে একটু দেখে-শুনে আমায় বিয়ে কর্‌তেই হবে। ভাগ্যহীন দেশে জন্মেছি ভাগ্যহীনা আমরা, এরই মধ্যে মানিয়ে নিতে হবে কোনোমতে, কর্‌বো কী ? মেয়েদের সাম্‌নে আজ বড় বড় কাজ এসেছে, বড় বড় রাস্তা খুলে গেছে। কিন্তু সব চেয়ে যা বড় কাজ আমাদের তা ভুলে গেলে চল্‌বে কেমন ক'রে ? ভুলে গেলে চল্‌বে কী ক'রে যে জগতের সমস্ত কাজের মধ্যে জড়িয়ে থেকেও আমাদের মা হ'তে হবে, মর্‌বার আগে দু একটী ছোট্ট ছোট্ট জীবন উপহার দিয়ে যেতে হবে পৃথিবীকে—নবযুগের অগ্রদূতকে ধরার বুকে নাবিয়ে দিয়ে তবে যে আমাদের বিদায় নিতে হবে। তবে তো হবো আমরা মহীয়সী। কিন্তু ঐ ধনী আর ছদ্মবেশী ধনীর আর একটা দিক দেখতে পেয়ে বাংলা দেশের পুরুষদের উপর আমার সমস্ত মন বিতৃষ্ণায় ভরে গেলো। জুজুবুড়ী হ'য়ে থাকার মতন অকারণ লজ্জা আমার কোন কালেই নেই। তারা যখন আমায় পরীক্ষা কর্‌ছিলো আমিও তাদের পানে স্পষ্ট চোখে তাকিয়েছিলাম। সেদিন তাদের চোখে মুখে যা দেখেছিলাম, সে কথা মনে হ'লে আজও আমি বিধাতার কাছে প্রার্থনা করি যে, আমি যেন বাঙালী হ'য়ে কখনো না জন্মাই। উঃ, কী অশ্লীল দৃষ্টি, কী উৎকট দেহ-লালসা তাদের চোখে। এই ভেবে তারা আনন্দে ফেটে পড়ছিলো যে, আমার দেহ ঠিকই তাদের উপযুক্ত উপভোগের। তারা যে ব'সে রয়েছে একটী সভ্য ভদ্রস্থানে, সে কথাও বুঝি তারা তখন ভুলে গিয়েছিল। আমার বিশেষ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্বন্ধেও ফিস্‌ফাস্ ক'রে মন্তব্য প্রকাশ কর্‌তে ছাড়ছিলে.

আমি তাদের খেতে না-দিয়েই গেটের বাইরে বার ক'রে এনেছিলাম এবং দারওয়ানকে বলেছিলাম—'যাও, এদের ষ্টেশনের পথে রেখে এসো, পথে যেতে যেতে এদের কেউ যদি আড়চোখেও একবার আমার বাড়ীর দিকে ফিরে তাকায়, বিন্দুমাত্র ইতস্তত: না ক'রে মাথাখানা চৌচির ক'রে দিও।' বিয়ে ক'র্‌বো কাকে? প্রেম আছে কার বুকে? আমাদের মনের খোঁজ কে রাখে? এদেশের পুরুষরা জানে মেয়েদের আবার মন কী? স্ত্রীর পাশে পাশে থাকে না তারা, তারা থাকে তাদের মাথার উপরে, তারা জানে এরা আর কিছু নয়, শুধু তাদের উপভোগের মাত্র, এরা শুধু দিন কাটিয়ে দেবে পদসেবা ক'রে আর দেহ দান ক'রে। পরিব্যাপ্ত প্রেম কই? যে প্রেমে মানুষ স্ফীত হ'য়ে উঠবে? এদেশের বিয়ে আর প্রেম মানে, শুধু ক্ষুধিত অঙ্গের স্বাদ, কলুষিত দেহ বিলাস, আর অগণিত সন্তান-ধারণের গ্লানি। পৃথিবীর অন্যদেশের মেয়েদের যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনে আসে আনন্দ, এদেশের মেয়েদের যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনে ধরে পোকার বাসা। অত্যাচার—সমাজের অত্যাচার, পুরুষের অত্যাচার। আমাদের পাশের বাড়ীর একটী বউ—এতদিনে সে বোধ হয় আত্মহত্যা করেছে—স্বামী তার মাতাল, নিজের যাকিছু সবই উড়িয়েছে, অত্যাচার ক'রে স্ত্রীর যা-কিছু লুণ্ঠন করেছে, তারপর নিরুপায় হ'য়ে ধনী বন্ধুদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে প্রতিদানে স্ত্রীর ঘরে তাদের পৌছে দিয়ে দোকানে মদ কিন্‌তে বেরিয়ে গেছে। সেদিন সে আমার কাছে এসে কেঁদে বলেছিলো, স্বামী বেঁচে থাকার চেয়ে বৈধব্য-যন্ত্রণা ঢের বেশী সুখের। আর আমার হাত ধ'রে সে উপদেশ দিয়ে গেছে, আমি যেনো কখনও বিয়ে না করি। বাঙালী মেয়েদের স্বামী তাদের গলার মালা নয়, গলার দড়ি।

তিমির কহিল: থেয়েছে, সমস্ত মেয়েরাই যদি ঐ একই রা' ধরে আর দলে দলে তোমার মতন ধর্ম্মঘট সুরু করে তাহলেই তো সর্ব্বনাশ, বাঙালী জাতটা যে লোপ পেয়ে যাবে।

তৃষ্ণা কহিল: যাক্, ধ্বংসেরই প্রয়োজন হ'য়েছে, পুরাতন মানুষের

ধ্বংস হ'য়ে গিয়ে নূতন মানুষের সৃষ্টি হোক্ দেশে, যারা মেয়েদের মাথার উপর দিয়ে না চলে চল্‌বে পাশে পাশে, যারা সহধর্ম্মিণীদের করকবলিত ক্রীতদাসী মনে না ক'রে মনে কর্‌বে জীবনসঙ্গিনী, যারা তাদের মুখের দিকে ফিরে তাকাবে, কী চায় তারা জান্‌তে চাইবে, মনের ঠিকানা রাখবে তাদের, যারা পাশব শক্তি দিয়ে তাদের হরণ কর্‌বে না, অত্যাচার কর্‌বে না, মর্য্যাদা দেবে তাদের। সেদিন এই স্বার্থ-দুষ্ট সমাজ লোপ পেয়ে গিয়ে নিশ্চয় হবে নূতন সমাজের সৃষ্টি, সৃষ্টি হবে নূতন আইন, যার শাসনে নির্দোষেরা সাজা পাবে না, দোষীরা বুক ফুলিয়ে বেড়াতে পারবে না, যে যার পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় চুকিয়ে পাবে। নিষ্ঠুর নয়, সে সমাজ হবে অনাবিল ক্ষমাসুন্দর সমাজ। সেদিন দূর থেকে দেশের মুখে নূতন আলো এসে পড়বে—নূতন জ্যোতি, নূতন দীপ্তি, আমরা নারীরা হাসিমুখে চোখ মেলে তাকাবো, সমস্ত নূতনকে মাল্যচন্দন দিয়ে বরণ করে নেবো, গৌরবে আমাদের চোখে ঘুম আসবে না। আমরা পাবো শিক্ষা সৌন্দর্য্য, প্রচুর কর্ম্ম ও বিশ্রাম, আমরা পাবো প্রচুর হাওয়া, প্রচুর খাদ্য, স্বামীর পেটের উদ্বৃত্তের আশায় এঁটোপাতের কাছে আর ব'সে থাকৃতে হবে না প্রতীক্ষায়। আমরা পাবো স্বাস্থ্য, সুখ, জীবন, যৌবন, প্রেম, ভালবাসা, আশা ও আনন্দ। সেদিন আমরা হবো সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী, আমাদের সঙ্গে তখন তুলনা চল্‌বে না পৃথিবীর কোন দেশের মেয়ের। সেদিন আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবে আমাদের পুরুষেরা, যারা মানুষ।

তিমির ক'হল : তোমার বাবা কষ্ট ক'রে বর খুঁজ্‌ছেন তোমায় পার কর্‌বেন ব'লে, আর তুমি তাঁদের অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিলে। তোমার বাবা তোমায় কিছু বল্‌লেন না?

তৃষ্ণা কহিল : না, বাবা শয়তান ছিলেন না, বাবা ছিলেন ভগবান। তিনি মানুষকে মানুষ বলেই জান্‌তেন, অন্য কিছু না। উচ্চ নীচ ধনী-দরিদ্র পুরুষ-মেয়ে তাঁর চোখে ছিল সকলেই সমান। আমি যে ছেলে না হ'য়ে মেয়ে হ'য়ে জন্মেছি তার জন্যে মনে মনে তিনি কোনদিন এতটুকুও দুঃখিত ছিলেন না।

আমার জন্যে তাঁর মনে কোনদিন চিন্তাও ছিল না। মেয়ে জন্মালেই বোঝার ভারে এদেশের বাবাদের চোখে ঘুম ছুটে যায়। আমার বাবা কোনদিনই ভাবেন নি যে, আমি তাঁর ঘাড়ে বোঝার সৃষ্টি করেছি। তাই আমায় নামিয়ে দেবার তাগিদও তাঁর ছিল না। আমি যেদিন ওদের তাড়িয়ে দিয়েছিলাম সেদিন বাবা আমায় কাছে ডেকে কী আদরই করেছিলেন, বলেছিলেন, আমাকে মানুষ করবার চেষ্টা তাঁর বৃথা হয়নি। আমি চেয়েছিলাম এমন একটী মানুষ যে আমাকে দলিত করবে না, আমাকে মানুষের মর্য্যাদা দেবে, আমার দেহের চেয়ে আমার মনকে বেশী ভালবাস্‌বে। মরবার আগে তিনি আমায় বলে গিয়েছিলেন, জীবনের পথ চল্‌তে চল্‌তে যদি কাউকে মনের মত পাও তো গ্রহণ কোরো, আর যদি না-পাও তো কোরো না। মাটীর পুতুলের সঙ্গে সমান ক'রে তিনি আমায় কোনদিনই দেখেন নি, আমার হাতেই তিনি আমাকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি জান্‌তেন, আমি যে পথেই তাকাবো সে পথই আমার সুন্দর। আমার উপর ছিল তাঁর অসীম বিশ্বাস। কেননা আমার গঠনে কোথাও তিনি অসম্পূর্ণতা রাখেন নি।

তিমিরের বুঝি তন্দ্রা আসিয়াছিল, কিছুক্ষণ নীরবে কাটাইয়া জড়াইয়া-জড়াইয়া সে বলিল : দেশশুদ্ধ সবাই তো আর খারাপ নয়, সুপাত্তরও তো আছে তারই একটা দেখে শুনে—

তৃষ্ণা ঝাঁঝিয়া উঠিল : জড়িয়ে-জড়িয়ে বল্‌তে চাচ্ছো কী? তুমি কী ভেবেছো তুমি একটী সুপাত্তর?

তিমির কহিল : আরে ছোঃ, এত রসালো আমি নই, তবে অন্ধকার ঘরে শুয়ে শুয়ে মাঝে মাঝে মনে হয় আমি একজন সুন্দর মহাশয় ব্যক্তি, কিন্তু আলোয় আয়নার সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়ালে ছুটতে পথ পাই না। তাই মাঝে মাঝে ভাবি, আমি তবে কী?

তৃষ্ণা আস্তে আস্তে শুইয়া পড়িয়া কহিল : তুমি একটী রূপবান কুৎসিৎ··· এ আবার কী! তোমার বালিশ ফেলে গেছো কেনো?

: তোমার ঘাড় কন্‌কন্ করছিলো যে ?

: ও, ধন্যবাদ : উপর-উপর দুটো বালিশ মাথায় দিয়া ভাল করিয়া শুইয়া তৃষ্ণা আরামে কহিল : আঃ।

দুইজনে নীরব হইল। এতক্ষণ তাহাদের দেখিয়া মনে হইতেছিল, তাহাদের বুঝি বিশ্রামের প্রয়োজন নাই। কথার পর কথা, কথার পর কথা, অবিশ্রান্ত অফুরন্ত কথার স্রোতে দুটী ছিপছিপে পান্‌সির মত তাহারা ভাসিয়া চলিয়াছে। মিলনের প্রথম রাত্রির বরও বধূকেও হার মানাইয়াছে তাহারা। বিশ্বব্যাপী গভীর স্তব্ধতার মধ্যে এই দুটীপ্রাণী কী যে বলিতেছে, কেন যে জাগিতেছে তাহার কোন ঠিকানা নাই।

তিমিরের তন্দ্রা আসিয়াছিল। একটু একটু করিয়া তাহার নাক ডাকিতেছে। মিনিট কয়েক পরে তৃষ্ণা আঁক্ করিয়া হঠাৎ মাদুরের উপর উঠিয়া বসিল। মাগো! ছপ্ করিয়া কী যেন তাহার গায়ের উপর পড়িয়াছে! অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না।

আবার। একটা, দুটো, তিনটে। ফর্ ফর্ করিয়া সারা ঘরময় কী যেন উড়িতেছে! তৃষ্ণা ঠিক্‌রাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। পালাইতে গিয়া ধাক্কা খাইয়া তিমিরের গায়ের উপর পড়িয়া হাঁউমাউ করিয়া উঠিল : মাগো, গেলাম মরে, ওঠো ওঠো···দু'ত্তুরি মোষের মতন ঘুমুতে লাগ্‌লো।

তিমির ধড়্‌মড়্ করিয়া উঠিয়া বসিয়াছে : কী হোলো ?

: বাবা রে, খেয়ে ফেল্লে : ঝাঁক বাঁধিয়া কী যেন সব উড়িতে উড়িতে ছপ্ ছপ্ করিয়া এখানে ওখানে আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিল। কখনো বা গায়ের উপর। তৃষ্ণা আত্মরক্ষার জন্য ঘরময় ছুটা-ছুটি করিতে লাগিল।

: আরসুলা বেরিয়েছে, দাঁড়াও দাঁড়াও, ছুটো না···জল নালার ন্যাক্‌ড়াটা খোলা হ'য়েছিলো, আর বন্ধ করা হয় নি।

তিমির উঠিয়া হাতড়াইয়া-হাতড়াইয়া সেই বিশিষ্ট সুইচটী টিপিয়া আলো জ্বালিল। জ্বালিয়া জুতা দিয়া পট্‌পট্ করিয়া গোটাকয়েক বধ করিয়া ফেলিল।

বাকী কটা উড়িতে উড়িতে জানালা দিয়া পলাইল। নালার মধ্যে ন্যাকড়াটা গুঁজিয়া দিয়া তিমির কহিল : নাও শুয়ে পড়ো, আর আস্‌বে না।

তৃষ্ণা হাঁপাইতেছে : কিছুতেই না, কিছুতেই শোবো না এঘরে, কিছুতেই না, চলো আমায় নিয়ে চলো তাড়াতাড়ি, কেন আমায় এখানে এনেছো ? মানুষ না কী থাকে এখানে !

: বা-রে, রাতে আবার যাবে কোথায় ?

তৃষ্ণা গর্‌গর্‌ করিতে করিতে কহিল : চুলোয়, নিমতলার ঘাটে। বাইরে গিয়ে মরে যাবো তো এখানে থাক্‌বো না। কিছুতেই না : বলিয়া সে পায়ে চটি গলাইয়া ফেলিল।

এমন সময় বাহির হইতে টিনের কপাটে ধাক্কা পড়িল : কে বাওয়া ঘরের ভিতর ? যেন বেশ মেয়ে-মেয়ে গলা মনে হচ্ছে ?

ভিতরে তাহারা চম্‌কাইয়া উঠিল। খানিক স্তব্ধ থাকিয়া তিমির কহিল : কে ?

: চিন্‌তে পার্‌লে না বাওয়া ? আমি তোমার বউ ? নে নে খোল্‌, তোর পাশে না শু'লে আমার ঘুম হবে না।

তিমির দরজা খুলিতে যাইতেই তৃষ্ণা বাধা দিয়া বলিল : থাক্‌ থাক্‌, খুলো না।

তিমির কহিল : না খুল্‌লেও এ সিংহদরজা ভাঙ্‌তে বেশীখন্‌ লাগবে না : তারপর দরজাটা খুলিয়া দিয়া বলিল : কী মাখন, অসময়ে হঠাৎ যে !

মাখন চোখ দুইটা ঢুলুঢুলু করিয়া কহিল : এই তোর জন্যে প্রাণটা আমার কেঁদে উঠলো, বলি, ঘরের বউ বুঝি খালি বিছানায় আইঢাই করছে : তারপর ঘরের ভিতর ঢুকিয়া আসিয়া তৃষ্ণাকে দেখিয়াই অবাক হইয়া বলিয়া উঠিল : মাইরি ! ডুবে ডুবে জল খাওয়া হচ্ছে ! ঐ জন্যে ঘরের ভিতর ফিস্‌ফাস্‌ গুজ্‌গাজ্‌, দরজা আর খোলেই না ! তাই কদিন পাত্তাই নেই বাছাধনের— মাইরি : বলিয়া সে টলিতে টলিতে আসিয়া তিমিরের হাত ধরিয়া দাঁড়াইল।

তিমির কহিল : আহা, তা তো হোলো, কিন্তু তুমি যে আজ সুখ-নিদ্রা ছেড়ে হঠাৎ এখানে ?

তৃষ্ণার আপাদমস্তকে দৃষ্টি বুলাইতে বুলাইতে মাখন কহিল : মাইরি, খাসা বাগিয়েছিস্, পেলি কোথায় বাওয়া ? ভোর রাতে কামিনীর সাথে ঝগড়া হ'য়ে গেলো, বলে এত কম পয়সায় পিরীত চল্‌বে না। আজ ভাল খাওয়াই হয়নি কামিনীর বাড়ীতে, দেনা দা-আ তোর বউটা পেট ভরে খিদে মিটিয়ে খেয়ে নিই একবার।

বিশ্রী গন্ধে নাকে কাপড় ঢাকা দিয়া তৃষ্ণা এতক্ষণ একপাশে চুপটী করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। এবার তিমিরের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাইয়া গম্ভীর কণ্ঠে শুধু বলিল : এসো, বেরিয়ে এসো : বলিয়া সে ঘরের বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল।

মাখন তাড়াতাড়ি বলিল : ঐ ভ্যাখ্ চলে গেলো রাগ ক'রে, ডাক্, ডাক্, তুই ছাড়া আর কারো ডাকে আস্‌বে না। তোর বউ তোর পেরাণের, তুই আমার পেরাণের, তাহলে তোর বউ আমার পেরাণের, ডাক্ ডাক্ মাইরি, আমি তোকে বড্ড ভালবাসি : বলিয়া সে তিমিরকে বুকের উপর সাপ্‌টিয়া জড়াইয়া ধরিল।

নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া তিমির কহিল : তুমি নিজেই একবার ডেকে দেখো না, তুমি যে যাতা' বল্‌ছো, ঐ জন্যে তো রাগ ক'রে চলে গেলো।

: এই মা-কালির দিব্বি : বলিয়া মাখন টপ্ করিয়া মাটীতে উপুড় হইয়া পড়িয়া একটু নাকখৎ খাইয়া লইল, তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল : কোন শা-আ আর যা-তা বলে, আমি আস্ত ভদ্দরলোক্। বলি ও মোহিনী, যেও না, এসো, এসো, আমি চুপটী করে পড়ে থাক্‌বো একপাশে, পড়্‌বো আর ঘুমুবো, রাত্রে যদি উঠি তো আমি শা-আ গোটা মাতাল।

: না না তুমি ভদ্রলোক, শুয়ে পড় : বলিয়া তিমির মাখনকে ছাড়াইয়া তৃষ্ণার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। তারপর দুইজনে রাস্তায় নামিয়া পড়িল।

মাখন তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল : চলে যাচ্ছো, কথ

শুন্‌লে না আমার ? ঐ শা-আ তিমি্‌রে, তুই অন্ততঃ একটা চুমু দিয়ে যা, তোর ঠোঁটে ওর ঠোঁটের স্বাদ লেগে আছে : বলিয়া সে একটু একটু করিয়া আগাইয়া যাইতে লাগিল।

তৃষ্ণা হঠাৎ একটা ধারালো ছুরির ফলার মতো ঘুরিয়া দাঁড়াইল, চোখ রাঙাইয়া কঠোর কণ্ঠে কহিল : খবরদার, আর এক পা এগিয়েছো কী খুন ক'রে ফেলেছি।

পদ্মের ভিতর সহসা নাগিনী দেখিয়া মাখন দাঁড়াইয়া পড়িল। একদৃষ্টে সে তৃষ্ণার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিল। তারপরেই হাসিয়া কহিল : মাইরি, খাসা চাউনি, খাসা চন্দন বদন, কী কর্‌বো, সোয়ামী রয়েছে যে সাথে, নইলে—আচ্ছা যাও, কিন্তু মাখনার কাছে গোখ্‌রোরও ওষুধ আছে সুন্দরী, সাম্‌লে থেকো।

তৃষ্ণা ও তিমির গলি হইতে বাহির হইয়া বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িল। ধোঁয়াটে অজগরের মতন কুণ্ডলী পাকাইয়া ধূসর রাজপথ ঘুমাইতেছে। রাতের গভীরতায় চড়া পড়িয়া আসিয়াছে। আকাশে নিভু-নিভু তারা। যে পথ সাম্‌নে পাইল তাহাই তাহারা কেহ আর কোনো কথা বলিল না। নিঃশব্দে অতিক্রম করিতে লাগিল।

কতক্ষণ চলিবার পর তাহারা গঙ্গার ধারে আসিয়া পৌঁছিল। প্রসারিত নদী বক্ষ। ছোট ছোট ঢেউ। এখন বুঝি জোয়ার। কে জানে এটা কোথাকার ঘাট, তাহার সিঁড়ির তলায় জল আসিয়া ঠেকিয়াছে। এদিকে ও'দকে দুচার জন লোক পড়িয়া ঘুমাইতেছে। নদীর বুকের উপর দুচারটে আলো, বোধ হয় নৌকার আলো। তীরে আসিয়া পেঁছিতেই কোথা হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে অবাধ হাওয়া উড়িয়া আসিয়া তাহাদিগকে ঘেরিয়া ধরিল। উপরের সিঁড়িতে তাহারা পাশপাশি নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

কতোক্ষণ পরে তৃষ্ণা কহিল : ছি ছি, ঐ লোকটার সঙ্গে তুমি একঘরে বাস কর!

তিমির কহিল : হ্যাঁ, ওর চেয়ে ভালো লোক আর কে আমার সঙ্গে বাস করবে ? কেন, লোকটার দোষ কী বলতো ?

তৃষ্ণা তিমিরের মুখের দিকে তাকাইল, কহিল : প্রশ্ন শুনে মনে হয় তুমিও ঐ একই গোত্রের, ও তোমারই সঙ্গে বাস না করলে আর কার সঙ্গেই বা বাস করবে।

: অর্থাৎ বল্‌তে চাচ্ছো, আমি চরিত্রহীন ?

: চরিত্রহীন নয়, মানুষ কথনো চরিত্রহীন হ'তে পারে না, তুমি অসচ্চরিত্র।

: আমরা ছোট জাত, আমাদের জাতটা প্রায়ই ঐরকম। অসচ্চরিত্র না হওয়াটা আমাদের একটা অনিয়ম। আচ্ছা, তুমি কথনো মদ খেয়েছো ?

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া তৃষ্ণা কহিল : আমি যে একজন ভদ্রমহিলা তাও বুঝি ভুলে গেছো ?

তিমির হাসিল, কহিল : তুমি যে মহিলা তাও মাঝে মাঝে ভুলে যাই; আলাপ করবার সময় জেণ্ডারের দিকে আমার অত নজর থাকে না।

তৃষ্ণা কথা কহিল না। একটু পরেই তিমির কহিল : শৃঙ্গচ্যুত হ'য়ে যখন আমার হাতে পায়ে ও মনে ব্যথা হয়েছিল, দিনের পর দিন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে রাস্তায় চল্‌ছিলাম, তখন আমার এক হিতৈষী বন্ধু জুটেছিলো। সব-কিছু ব্যথা সারাবার জন্যে তার উপদেশে একদিন পুরো একটা বোতল গলায় ঢেলেছিলাম, দেখলাম জিনিষটা পষ্টিক, খেলে চোখে বেশ কবি-কবি ভাব আসে, এত বড় রুক্ষ পৃথিবীটাকে ডেলিকেট মনে হয়। তুমিও তো কক্ষচ্যুত, ভাবলাম্, শরীর হাল্‌কা করবার জন্যে হয়ত এর শরণ নিতেও পারো।

তৃষ্ণা কহিল : দুঃখ তোমাদের কাছে বিলাস, দুঃখ পেলে তাই তোমরা মদের শরণ নাও, আমাদের কাছে ওটা নিত্যকার বস্তু, তাই ভাতের হাড়ির মত দুইবেলা ওটাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করি। বিত্ত হারিয়ে আমার দুঃখ যত না হয়েছিলো ক্রোধ হয়েছিল তার চেয়ে বেশী।

ভোর হইয়া গিয়াছিল। অন্ধকারের গভীরতা কাটিয়া গিয়াছে। মুখর

হইয়া উঠিতেছে রাজপথ। দু'একটী করিয়া লোক ঘাটে আসিয়া নামিতেছিল। সাম্‌নে তাকাইয়া থাকিয়া তৃষ্ণা কহিল : আচ্ছা ঢেউগুলো কেনো সিঁড়ির তলায় এসে এমন মাথা কুটে মরছে বলতো?

তিমির কহিল : ওরা অবিশ্বাসীদের মিনতি ক'রে বল্‌ছে, 'বিশ্বাস করো, আমরা নির্ম্মল, আমরা পবিত্র'।

তৃষ্ণা উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল : দাঁড়াও, কী বল্‌ছে ওরা শুনে আসি : বলিয়া সে আস্তে আস্তে নামিয়া গিয়া জলের উপরকার সিঁড়িটাতে কতক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। খানিক পরে পুনরায় তিমিরের কাছে ফিরিয়া আসিয়া বুকের ভিতর হইতে মানিব্যাগটা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল : এইটে রাখো তো : তারপর তিমিরের মাথাটা ধরিয়া পিছনের দিকে ঘুরাইয়া দিয়া বলিল : ঐদিকে ঘুরে বোসো, খবরদার জলের দিকে তাকিও না।

তিমির ঘুরিয়া বসিল; বলিল : এ আবার কী! এযে ষ্টেজের দিকে পিছন করে থিয়েটার দেখার মতন।

: হ্যাঁ, তাই, এ অভিনয় তোমায় দেখতে হবে না : বলিয়া তৃষ্ণা সিঁড়ির উপর জুতাটা খুলিয়া রাখিয়া আস্তে আস্তে জলে গিয়া নামিল।

নিমজ্জিত সিঁড়িতে বক্ষ ডুবাইয়া তৃষ্ণা বসিল। ভিজে হাওয়া প্রথম প্রেমের মত কাঁপিয়া কাঁপিয়া কপালে আসিয়া লাগিতেছে। নৃত্যপরা নটিনীর মত রাশি রাশি ছোট ছোট ঢেউ দূর হইতে নাচিয়া নাচিয়া আসিয়া তৃষ্ণার গালে টোকা দিয়া যাইতেছে। চন্দনবর্ণা পবিত্র ঢেউ—নরম, ঠাণ্ডা, ধরিতে গেলে চূর্ণ হইয়া যায়। শুচিস্নিগ্ধ প্রভাতের কিনারায়—এই প্রসারিত চঞ্চলার মাঝে নিজেকে ডুবাইয়া তৃষ্ণা মনে মনে অসীম আনন্দ অনুভব করিল। আরামে তাহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

কতক্ষণ পরে স্নান সমাপ্ত করিয়া তৃষ্ণা তীরে উঠিল। রঙেরাঙা বসন ধৌত অঙ্গের চাঁপা রঙে আগুন ধরাইয়া দিয়াছে। সে বসন অঙ্গে অঙ্গে জড়াইয়া আছে মুগ্ধ নিশীথ-প্রিয়ার মত, সিক্ত আবরণ টুটিয়া রেখায় রেখায়

ফুটিয়া উঠিয়াছে নিবিড় যৌবন—তাহার উদ্ধত উচ্ছল তরঙ্গ অচঞ্চল লাবণ্যের কোলে আসিয়া শান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। উপরের পাখী-ওড়া অনন্ত আকাশ সাগ্রহে সন্নত নয়নে তাকাইয়া আছে তার পানে, নিখিল বিশ্বের অফুরন্ত বাতাস তার সর্ব্বাঙ্গ চুম্বন করিয়া ফিরিতেছে। সোপানে সোপানে সজল চরণচিহ্ন আঁকিয়া আঁকিয়া সে উপরে আসিয়া দাঁড়াইল। নগরীর অভ্রলেহী অট্টালিকার ফাঁকে ফাঁকে প্রথম সূর্য্যের তরুণ-রশ্মিটী আসিয়া তাহার রাঙা পায়ে লুটাইয়া পড়িল। পিঠের উপর খসিয়া পড়িল শিথিল আবীর-রুক্ষ চুলের রাশি। তিমির তাহার মুখের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল।

এমন সময় হঠাৎ একটী লোক পাশের একটী থামের আড়াল হইতে বাহির হইয়া দ্রুতপদে তৃষ্ণার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ক্ষণকাল তাহার মুখের পানে নির্ব্বাক হইয়া তাকাইয়া রহিল। মৃদু হাসিল একবার। তারপর সহসা নত হইয়া তৃষ্ণার পায়ের কাছে পরিপূর্ণ একটী প্রণাম রাখিয়া নীরবে নিঃশব্দে জনতার ভিড়ে অদৃশ্য হইয়া গেল।

লোকটাকে দুইজনেই চিনিয়াছে। তৃষ্ণা কথা কহিল না। শুধু মৃদু হাসিয়া তিমিরের মুখের পানে তাকাইল।

তিমিরও নিঃশব্দে হাসিল, কহিল: কাল কিন্তু ও তোমার জন্যে পাগল হ'য়েছিল। কাল রাতে তুমি ছিলে উর্ব্বশী, আজ প্রাতে লক্ষ্মী, পায়ের ধূলো নেবার মতোই।

ভিজে কাপড়ে ভিজে গায়ে অল্প অল্প শীত করিতেছে। কাঁপিতে কাঁপিতে তৃষ্ণা কহিল: কী পরবো? যাওনা, সামনের ঐ দোকান থেকে দু'একখানা জামা কাপড় নিয়ে এসো না।

তাহার মুখের পানে চাহিয়া তিমির কোন কথা কহিল না, উঠিয়া দাঁড়াইল। তৃষ্ণা কহিল: শোন, আমার একটা শাড়ী, একটা সায়া, একটা ব্লাউজ, আর অমনি তোমার জন্যেও একটা জামা কিনে নিও। সব নিয়ে ত্রিশটাকার বেশী খরচ কোরো না। শীতে কাঁপছি, তাড়াতাড়ি এসো।

তিমির চলিয়া গেল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই জামা কাপড় লইয়া আসিল। তৃষ্ণা সেগুলি হাতে লইয়া কহিল : তোমার জামা কই ? এ কী শাড়ী কিনেছো ? এর যে অনেক দাম !

তিমির কহিল : আর একটা ছিলো, কম দামের, কিন্তু ফর্সা মেয়েকে সেটা মানাবে না, দোকানী জিজ্ঞাসা করলো, আপনার স্ত্রী,·· মানে ওরা বল্‌লো, মেয়েটী ফর্সা না কালো এবং ফর্সা জেনে এইটাই পছন্দ ক'রে দিলো। সব নিয়ে তিরিশ টাকাই পড়েছে, ভাল মানাবে তোমাকে।

: তার চেয়ে বলনা তোমারই পছন্দ।

: আরে রামোঃ, শাড়ী পছন্দ করা ঠিক মেয়ে পছন্দ করার মতো, রসিক ধাতের না হ'লে পারবার যো নেই।

: কিন্তু তোমার যে একটা জামা কিন্‌তে বল্‌লাম ?

: চলো চলো, ঠিক আছে, অভদ্র সেজে বরং ভদ্র আছি, ভদ্র সেজে শেষে হয়ত অভদ্র হ'য়ে যাবো।

ঘাটের ঘরের মধ্যে যাইয়া তৃষ্ণা কাপড় ছাড়িয়া আসিল। ভিজে জামা কাপড়গুলি পুঁটলি বাঁধিয়া জুতাটা পায়ে লাগাইয়া কহিল : চলো।

দুইজনে চলিতে লাগিল। তিমির কহিল : এবার তোমার পাশ থেকে আমায় ছুটে পালাতে হবে, এখন আমাদের দুজনকে একসাথে দেখলে লোকের মাথায় মদের পাশে গঙ্গাজলের তুলনা আস্‌বে।

তৃষ্ণা কহিল : ঐ জন্যেই তো তোমায় মানুষ ক'রে নিতে চেয়েছিলাম।

তিমির কহিল : এখন কী চতুষ্পদ আছি নাকী ?

: না, আর যাই হও পশু তুমি নও।

: তবে কী পক্ষী ?

তৃষ্ণা সে কথার জবাব না দিয়া বিরক্ত হইয়া কহিল : দূর, আবার সেই রাস্তায় টো টো করে বেড়ানো, ভাল লাগেনা আমার। দাঁড়াও তো, দাঁড়াও, দুটো টাকা দাও দেখি।

তিমির মানিব্যাগটা তৃষ্ণার হাতে দিল। দুটো টাকা বাহির করিয়া লইয়া সেটা আবার ফিরাইয়া দিয়া তৃষ্ণা কহিল : নাও রাখো।

তিমির কহিল : ও তোমার জিনিষ তুমিই রাখো।

: দূর বাপু রাখো না, ওসব বোঝা আমি বইতে পারিনা।

: আমি না থাক্‌লে বইতে কী করে ?

: তখন বওয়া যেতো, এখন তুমি থাক্‌তেও যদি আমি বইবো তবে তুমি আছো কী কর্‌তে ? আমি আস্‌ছি এখনি, তুমি ততক্ষণ ঐ নাপিতটাকে ডেকে গালের মিনেগুলো তুলে ফেলো দেখি।

: কেন এতে তোমার অসুবিধে হচ্ছে না কী ?

: না হয়নি, হবে। অসভ্যের মতন বেয়াড়া মানে কোরো না যেন কথাটার : বলিয়া সে ব্যাগটা তিমিরের হাতে দিয়া চলিয়া গেল।

তিমির দাড়ি কামাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। খানিক পরেই তৃষ্ণা ফিরিয়া আসিল। হাতে একটি নূতন আয়না, আর ছোট্ট একটা সিঁদূরের প্যাকেট। তাহার মাথার দিকে চাহিয়া তিমির অবাক হইয়া গেল, কহিল : একী তৃষা।

তাহার সীঁথিতে দীর্ঘ সিঁদূরের রেখা, রাঙা আয়তির চিহ্ন। অর্থাৎ সে এখন শ্বেতসীমন্তিনী কুমারী নয়, রক্তসীমন্তিনী বধূ। তিমিরের জিজ্ঞাসু চোখের পানে চাহিয়া সে শুধু হাসিয়া কহিল : প্রয়োজন : বলিয়া একখানা গাড়ী ডাকিল, ডাকিয়া তাহাতে তিমিরকে লইয়া উঠিয়া বসিল। গাড়ী চলিল, তৃষ্ণা ড্রাইভারকে পথ বলিয়া দিল। খানিকটা গিয়া তৃষ্ণা কহিল : সেই বাড়ীটা এই রাস্তায় না ? যারা বলেছিলো ফ্যামিলী না নিয়ে এলে ভাড়া দেওয়া হবে না ? হ্যাঁ, এই রাস্তাই, এই যে, বাঁধো বাঁধো : তিমিরের দিকে ফিরিয়া কহিল : এবার বুঝেছো তো ? যাও, ঘর ঠিক্‌-ঠাক্‌ করে আমায় ডেকে নিয়ে যেও, সু-অভিনেতা হ'য়ো : বলিয়া তাহারা গাড়ী হইতে নামিয়া ভাড়া চুকাইয়া দিল। তৃষ্ণা ইতিমধ্যে কখন মাথায় আঁচল তুলিয়া দিয়াছে।

দরজার সামনেই বাড়ীওয়ালার সহিত তিমিরের দেখা হইয়া গেল। বাড়ীওয়ালা তেমন আগ্রহের সহিত কথা কহিতে চাহিতেছিল না, কহিল : ওখানে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন উনি বুঝি তোমার মনিব?

তিমির কহিল : না...মানে, হ্যাঁ একরকম মনিবই বটে।

: একরকম মনিবই বটে মানে? বলি, তুমি ওঁর চাকর তো?

তিমির হাসিয়া বলিল : একরকম চাকরই বটে।

: তোমায় নিয়ে উনি বাড়ী খুঁজতে এসেছেন, ওঁর স্বামী কোথায়?

জেরায় পড়িয়া পাছে তিমির জড়াইয়া ফেলে, তাই তাড়াতাড়ি তৃষ্ণা আগাইয়া আসিয়া স্পষ্ট করিয়া কহিল : কাকে চাকর বল্ছেন আপনি? ওঁর কথা শুনে বুঝতে পারছেন না উনি আমার কে হতে পারেন?

বাড়ীওয়ালা ড্যাব ড্যাব করিয়া বারকয়েক তাহাদের মুখের দিকে তাকাইল তারপর বিস্ময়ের সুরে কহিল : এ তোমার স্বামী! তুমি ওর স্ত্রী? না এর সঙ্গে গৃহত্যাগ ক'রে পালিয়ে আসোনি তো?

তৃষ্ণা রাগিবার ভান করিয়া কহিল : আপনার মেয়ে বুঝি সম্প্রতি তার স্বামীর গৃহত্যাগ ক'রে আর কাউকে নিয়ে পালিয়েছে, না হ'লে অপরিচিত ভদ্র মহিলায় সম্বন্ধে এমন অভদ্র চিন্তা হঠাৎ মাথায় গজাবে কী করে?

বাড়ীওয়ালা লজ্জিত হইয়া কহিল : না, তাই বলছিলাম মা···আজকাল ···তা এঁর চেহারাখানা তোমার পাশে দাঁড়াবার মতোই, কেবল জামা কাপড়গুলো···

তৃষ্ণা কহিল : হবে না? ধুলো-মাটি নিয়েই ওঁর কাজ, এদেশের ধুলোমাটিই ওঁর প্রিয়। যাদের জন্যে এদেশ ক্রমেই আলোকের পথে এগিয়ে যাচ্ছে, ইনি তাদেরই একজন। ইনি দেশপ্রেমিক। একমাস পরে আজই ইনি পল্লীসফর থেকে ফিরেছেন এবং ফেরামাত্রই এক কাপ চা পর্য্যন্ত না খেতে দিয়ে একবারে বাড়ীর সন্ধানে টেনে এনেছি। দেখছেন না এঁর মাথার ঠিক নেই?

: তাই নাকি? শুনে খুব আনন্দ হোলো, এসো মা এসো।

একখানা ঘর পাইল তাহারা, উপর তলায়, চড়া দামে, কিছুটাকাও অগ্রিম দেওয়া হইয়াছে বাড়ীওলাকে। দু'চার-জন বৌ-ঝিরা উঁকিঝুঁকি দিয়া দেখিয়া গিয়াছে নূতন ভাড়াটেকে, দেখিয়া তাহাদের পছন্দও হইয়াছে, কিন্তু মেয়েটার রকম-সকম দেখিয়া কেহ কথা বলিতে সাহস করে নাই। এদিকে ঘরে ঢুকিয়া কপাট ভেজাইয়া দিয়া তিমির পরিষ্কার তক্‌তকে মেঝের উপর একেবারে লম্বা হইয়া পড়িয়াছে। তৃষ্ণা ভিজে কাপড়টা শুকাইতে দিয়া বসিয়াছে একটা কোন দখল করিয়া দেয়ালে ঠেস দিয়া।

গড়াইতে-গড়াইতে তিমির কহিল : মেঝেটা বড্ড বেশী সমতল, আমার পিঠে ঠিক খাপ খাচ্ছে না।

তৃষ্ণা কহিল : বাড়ীওলার কাছ থেকে একটা খন্তা চেয়ে এনে তোমার ওদিকটা গর্ত্ত ক'রে নিতে পারো।

তিমির কহিল : নিতাম, কিন্তু এত আরাম বাড়ীওলা দেখতে পারবে না যে, তাড়িয়ে দেবে, তোমাকেও।

তৃষ্ণা চোখ রাঙাইল : খবরদার, এত সবের পর তুমি যদি আমায় গৃহ থেকে বঞ্চিত কর, তোমায় আমি ক্ষমা করবো না।

তিমির কহিল : আমায় কিন্তু যারা গৃহ থেকে বঞ্চিত করেছিলো, তাদের নির্ব্বিবাদেই ক্ষমা করে এসেছিলাম।

: নিরুপায় বলেই ক্ষমা ক'রেছিলে। ক্ষমা করে তারা যারা মহৎ, আর যারা ভীরু, তোমার ক্ষমা শেষের দলের।

তিমির পাশ ফিরিয়া কহিল : তুমি নিপুণ সমালোচক।

: তুমি নিপুণ উপাধি-দাতা : বলিয়া তৃষ্ণা উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ঘরটার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে কহিল : ওঃ, দুটো রাত কী কষ্টই পেয়েছি আর আজ যে কী আরামে ঘুমোবো....আজ আর দিক বাছবার দরকার নেই যে যেদিকে খুসী শুতে পারো, : দেয়ালের গায়ে সুইচটা টিপিয়া কহিল : ও, আলোটা ঠিক আছে, বাল্‌ব আর কিন্‌তে হবে না। কিন্তু শোয়া যাবে কীসে?

ঃ ও সব আমি ভুলেই গেছি, কেবল আমার মেঝেটাকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে ইচ্ছে করছে।

তিমিরের অদূরে তৃষ্ণা বসিয়া কহিল ঃ সত্যি, এ কথা এতখন্ মনেই হয়নি, বিকেলে একবার বাজারে যাওয়া যাবে কি বল? কিছু কিছু জিনিষপত্তর কিনে আন্‌বো।

ঃ বিকেলে আমি ঘুমোবো, বিকেলে মানে দুপুরে, দুপুর থেকে একেবারে কাল ন'টা অব্দি এ মেঝে ছেড়ে একদণ্ড আমি নড়ছি না। আঃ ঃ বলিয়া একটা পাক খাইতেই সে গড়াইয়া একেবারে তৃষ্ণার কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিয়া গেল।

তৃষ্ণা কহিল ঃ দিনে ঘুমোলে আয়ুক্ষয় হয়। তোমার আয়ুক্ষয় হতে আমি দেবো না।

কী বলিতে গিয়া তিমির সহসা থামিয়া গেল, একটু পরে আস্তে আস্তে কহিল ঃ তোমার মুখে একথাটা শুনতে খুবই ভালো লাগলো তৃষা, সেইসঙ্গে তোমাকেও খুব ভালো লাগলো। অনেকদিনের পুরোনো কথা আজ মনে করিয়ে দিলে তুমি। আমার মা আমার শিয়রে বসে একদিন ঠিক এই কথাই বলেছিলেন। যে মা আমায় পালন করেছিলেন—মা—সাবিত্রী দেবী। সে কী গভীর পরিতৃপ্তি! ঃ বলিয়া তিমির একটু থামিয়া পুনরায় কহিল ঃ আয়ু, আয়ু আমার কই তৃষা? বেঁচে আছি বলে? তোমার সঙ্গে কথা কই ছি বলে? যে মুহূর্তে আমি আছি সেই মুহূর্তে আমি নেই। নেই এ জন্যে, আমি চলে গেলে কেউ জানবে না এ পৃথিবীতে, কেউ কাউকে জানাবে না, কেউ শুনবে না, কেউ কাউকে শুনাবে না, কানাকানি উঠবে না কোথাও, দীর্ঘশ্বাস পড়বে না এতটুকু, আমার জন্যে কারো বুকে ব্যথা নেই, কারো চোখে এতটুকু তপ্ত অশ্রুও সঞ্চিত হ'য়ে নেই; তুমি কী ক'রে আমার আয়ু বাড়াবে তৃষা? কেনই বা বাড়াবে? ভয় নেই, আমি চলে গেলে তোমার এ সিঁথির সিঁদূরের একটী রেণুও খসে পড়্‌বে না।

তৃষ্ণা বসিয়া রহিল, কথা কহিল না। অনেকক্ষণ পরে কহিল : অকারণে কোন জীবন অন্ধকার হ'য়ে যাচ্ছে এ আমি দেখ্‌তে পারি না।

তিমির উঠিয়া বসিয়া কহিল : কেন পার্‌বে না তৃষা ? পারাই তো নিয়ম, শুধু তাই নয় যাতে সে নিমগ্ন নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় প্রাণপণে তারই চেষ্টা করাই হচ্ছে মনুষ্যত্ব, দেশজুড়ে তো এই মনুষ্যত্বেরই সমারোহ চলেছে। তোমাদের নিয়েই তো দেশ, তোমাদের নিয়েই তো যা কিছু, কেন পার্‌বে না তৃষা ?

তৃষ্ণা মাথা নাড়িল : না, পারি না। কী জানি কেন পারি না, আমি যেন কী রকম। পবিত্রদের সাম্‌নে দরজা বন্ধ ক'রে দিলাম, অপবিত্রের সাম্‌নে ঠাকুর ঘরের দরজা খুলে দিয়েছি : বলিয়াই তৃষ্ণা লজ্জিত হইয়া পড়িল, কথাটা শোধ্‌রাইয়া লইবার জন্য তাড়াতাড়ি কহিল : অবশ্য দরজা খুলেছি যাওয়া আসার জন্যে নয়, দূর থেকে দেখে চলে যাওয়ার জন্যে : তারপর কথাটাকে একেবারে ফিরাইয়া দিয়া কহিল : বাজে কথা রাখোতো, এসো কী কী কেনা যাবে মনে মনে একটা ফর্দ্দ ক'রে ফেলা যাক্ ;—দুটো মাদুর, দুটো তোষক, দুটোই অবশ্য আমারই লাগবে, তুমি একটাও পাবে না, একটা জলের কুঁজো, একটা গ্লাস, একটা চিরুণী, তারপর সাবান তেল তোয়ালে, আর তোমার জন্য একটা কাপড়, একটা জামা, ব্যস—আর বেশী কিছু না, টেনে-টুনে চল্‌তে হবে, ব্যাগের রক্ত কমে এসেছে।

: কমে এসেছে, শেষ হ'য়ে গেলে কী কর্‌বে ?

: তার ভাবনা এখন থেকে ভাব্‌তে গেলে ঘর পাওয়ার আরাম নষ্ট হয়ে যাবে। তবে অল-ইণ্ডিয়া-রেডিওর এনাউন্‌সারের চাক্‌রীটা তো আমার বাঁধা, মাইনে পাওয়া যাবে অনেক।

: তা ছাড়া আমিও জুতো সেলাই ক'রে কিছু কিছু আন্‌তে পার্‌বো।

: তোমার পথটাই ভালো, আমার এটা চাকরী, তোমার ওটা ব্যবসা, স্বাধীন ব্যবসা।....হ্যাঁ, আমার সেই জামাখানা আর গেষ্ট-চার্জ্জের দামটা কবে দিচ্ছো বলতো ?

তিমির কহিল : জামাখানা বাক্সে রেখে দিয়েছি, পাঠাবো বলেই রেখে দিয়েছি, কিন্তু পোষ্ট-চার্জ্জটা ঠিক মিলিয়ে উঠতে পারছি না বলেই পাঠানো হয়নি। ভালো পকেটওলা জামা গায়ে দিলে পকেটে পয়সা থাকে কিনা পরীক্ষা ক'রবো বলে সে জামাটা একদিন পরবার ইচ্ছা আছে।

তৃষ্ণা কহিল : পরো আর যা করো, কড়ায়-গণ্ডায় আমার সব মিটিয়ে দিও কিন্তু, অনেক দিন হয়ে গেলো, সুদও দিও কিছু—ঐ যাঃ, এখনো যে কিন্‌বার অনেক জিনিষ আছে, চাল ডাল তরী-তরকারী, খুন্তি, কড়া, ভাতের হাড়ি ফর্দে ধরা হোলো না তো ? যাও, যাও তুমি তাড়াতাড়ি স্নানটা সেরে এসো।

: হ্যাঁ, আরো অনেক কিছু, যেমন থালা, বাটী, ঘটী, বাল্‌তি, নুন, লঙ্কা, জিরে, মরিচ, ছাই-পাঁশ মাথা-মুণ্ডু : বলিতে বলিতে তিমির উঠিয়া দাঁড়াইল।

তৃষ্ণা কহিল : আমার ভিজে কাপড়খানা নিয়ে যাও, পরে চান করবে।

দ্বিরুক্তি না করিয়া তিমির কাপড়খানা হাতে লইয়া কহিল : ধন্যবাদ : বলিয়া সে দরজা খুলিতে গেল।

: থামো, থামো, খুলো না : বলিয়া তৃষ্ণা তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া গায়ের কাপড়-চোপড় ঠিক করিয়া লইল, তারপর মাথার উপর আঁচলটা তুলিয়া দিয়া কহিল : খোলো এবার।

তৃষ্ণার পানে চাহিয়া ক্ষণকালের জন্য তিমিরের চোখে স্বপ্ন নামিল। তারপর দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া আস্তে-আস্তে দরজা খুলিল। ওদিকে কাহাদের একটী বধূ দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিতে পাইয়াই তৃষ্ণা তাড়াতাড়ি একেবারে তিমিরের বুকের নীচে আসিয়া দাঁড়াইল ; কহিল : এবেলা রান্না করবো না, খেতে না পেয়ে তোমার কত কষ্ট হবে বলতো ?

তিমির পরম আদরে কহিল : সময় কম, তাড়াতাড়ি ছুটোছুটি ক'রে রান্না ক'রতে তোমার বুঝি কষ্ট হোতো না ?

তৃষ্ণা কহিল : মালুম হোতো না, সে কষ্ট যে করবো তোমার জন্যে : চোখের তারায় সে একটা অদ্ভুত চাহনি ফুটাইল।

: তোমার চাউনিতে কাচ কেটে যায় তৃষা : বলিতে বলিতে তিমির সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল।

তৃষ্ণা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিল, যেন স্রোতের নীচে কাঁকরের শব্দ, তারপর রেলিং-এর ওপর ঝুকিয়া পড়িয়া নীচের দিকে তাকাইয়া কহিল : তুমি সেই কাচ, তুমি আয়না।

: আর তুমি ছবি—আয়নার বুকের ভিতরকার ছবি : বলিয়া তিমির কলঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

তৃষ্ণা বউটার দিকে একবার তাকাইয়া ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

দুদিন তিমিরের স্নান হয় নাই এবং বহুদিন পরে আজ সে বাথরুমে ঢুকিয়া স্নান করিতেছে। আধঘণ্টা পরে কলঘর হইতে বাহির হইয়া সে উপরে উঠিয়া আসিল এবং দরজা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিয়াই একেবারে অবাক হইয়া গেল। মেঝের উপর চূর্ণ-চূর্ণ কাচখণ্ড এদিক-ওদিকে ছড়াইয়া আছে এবং জানালার গরাদ ধরিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া গম্ভীর একটা মেঘচ্ছায়ার মত নিঃশব্দে তৃষ্ণা দাঁড়াইয়া আছে। সিঁথি তাহার সাদা। তিমিরের পদশব্দে সে ফিরিয়াও তাকাইল না।

একী পট পরিবর্ত্তন!

খানিক পরে তৃষ্ণা আস্তে আস্তে ঘুরিয়া দাঁড়াইল, মুখে এতটুকু আনন্দ নাই, কহিল : যাওয়ার আগে জানিয়ে যাওয়া দরকার সেইজন্যে অপেক্ষা করছি।

: যাবে কোথায়?

তৃষ্ণা সহসা ঝাঁঝিয়া উঠিল : সে কথা জানতে চাওয়ার অধিকার তোমার হোলো কোথা থেকে? তুমি কে? তুমি মনে করেছ এ কথা বলতে আমি তোমার কাছে বাধ্য? কেন? কেন? এতখানি স্পর্দ্ধা তোমার হোলো

কোথা থেকে? কেন তুমি ওকথা জিজ্ঞাসা করবে? জানো আমি তোমায় না জানিয়েই এখান থেকে চলে যেতে পার্‌তাম্?

তিমির নিঃশব্দে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তৃষ্ণা পুনরায় বলিতে লাগিল: কেন, কেন ঘটা করে এত সব করা? তোমার সঙ্গে আমার কী সম্বন্ধ? বিপদে পড়ে না হয় এক জায়গায় এক ঘরে রাত কাটিয়েছি, কিন্তু আবার কেন? আর একখানা ঘর তো তুমি ভাড়া নিলেই পার্‌তে? কেনই বা এত ঘর-কন্নার আয়োজন? যা নয় তার কেন এত সমারোহ? তুমি আমাকে ছেড়ে চলেই বা যাওনি কেন? গাধা-বোটের মত সঙ্গে সঙ্গে ফির্‌ছো? : বলিতে বলিতে তাহার গলার স্বর কাঁপিয়া উঠিল, : কেন এত সব? কেন এত লোক দেখানো ব্যাপার? তোমার সঙ্গে আমার কেনই বা এত কথা? কেনই বা আমার সিঁথিকে এমন ক'রে কলঙ্কিত করা? আমি কুমারী, তুমি কোথাকার কে? কেন তুমি আমায় এমন করে অপমান কর্‌বে? : বলিতে বলিতে সে ঘরের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

তিমির আস্তে-আস্তে কহিল: আমি তোমার কী কর্‌লাম, তৃষা? সিঁদুর তো তুমি নিজেই প'রেছো!

তৃষ্ণার সুরে গভীরতা বাড়িয়া উঠিল, কহিল: না কিছুই করনি। এবার একটু কর। আমি চলে যাচ্ছি, তুমিও আমায় ছেড়ে চলে যাও। দুজনে দুজনকে নিয়ে কোথায় চলেছি? আমার এ অহেতুক রাঙা সিঁথির অসম্মান আমাকে আজই ভুলে যেতে হবে: জুতাটা পায়ে গলাইয়া তৃষ্ণা দরজার বাহির হইয়া গেল।

তিমির ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিল। ঘরের চারিদিকে একবার তাকাইল। তারপর সেও আস্তে-আস্তে বাহির হইয়া আসিল। তৃষ্ণা তখন সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতেছে।

তিমিরও নামিতে-নামিতে কহিল: তোমার ভিজে জামা-কাপড়গুলো পড়ে রইলো তৃষা।

: সে কথা মনে করিয়ে দেবার জন্যে তোমায় আমি কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিনি, তোমার পরা-কাপড় আমায় পরতে হবে এমন দৈন্য আমার নেই।

দুইজনে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল, দূরে দূরে, পথের পানে তাকাইয়া। কাহারও মুখের পানে ফিরিয়া চাহিবার স্পৃহা কাহারো আর নাই। দুপুর পার হইয়া গিয়াছে। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবার পর দু'পা আগাইয়া আসিয়া তিমির কহিল: আচ্ছা চলি তাহ'লে, এই নাও তোমার মানিব্যাগটা।

: তৃষা! তুই এখানে! : পিছন হইতে কে তৃষ্ণার ঘাড় চাপিয়া ধরিয়াছে।

: আরে বীথি? তারপর? ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তৃষ্ণা তাহার হাত ধরিল।

: এইতো, খবর ভাল? কবে কোলকাতায় এলি?

: এই দিনকয়েক, তারপর জোড়ে কোথায় যাওয়া হ'য়েছিল?

: সিনেমা দেখ্‌তে কিন্তু টিকিট পাওয়া গেলো না। তারপর এখানে দাঁড়িয়ে কি হচ্ছে, চল্, কদ্দিন দেখিনি বল্‌তো তোকে, সেই যা আমার বিয়ের সময় দেখেছি, সে আজ তিন বছর।

তৃষ্ণা কহিল: তোর সেই রোগটা বুঝি এখনো যায়নি, দেখতে পেলেই টেনে নিয়ে যাওয়া বাড়ীতে, আর ধরে রেখে দেওয়া যদ্দিন খুসি, কিন্তু আমি যে এখন বেরিয়েছি বাজারে, অনেক কিছু কেনা-কাটার কাজ।

: সে তখন বেরোনো যাবে একসময়ে, দুজনে। উনি কে ভাই? ওঁকেও ডাক্‌না: তারপর নিজেই তিমিরের দিকে ফিরিয়া কহিল: আসুন।

এ ক'দিন তৃষ্ণার পিছনে অকারণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া সে নিজেকে নিতান্ত দীন ক্ষুদ্র করিয়া ফেলিয়াছে। আর তাহার দীনতা সে বাড়াইতে চাহিলনা, সবিনয়ে হাত যোড় করিয়া কহিল: ধন্যবাদ, কিন্তু নষ্ট করার মত একবিন্দুও সময় আমার নেই, উনি গেলেই যথেষ্ট হবে।

বীথির ইঙ্গিতে বিকাশ গিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া আনিল: থাক্ কাজ, চলুন।

চলিতে চলিতে বীথি কহিল : উনি কে ভাই ?

তৃষ্ণা কিছু বলিবার আগেই তিমির কহিল : দেখেই তো বুঝতে পারছেন, চাকর-বাকর শ্রেণীর লোক্, উনি আমার প্রভু।

তৃষ্ণা কহিল : চাকর, কিন্তু ও ভাই আমাদেরই পাশে পাশেই থাকে, পাশে-পাশেই বেড়ায়, খায় দায়, অনেক দিনের পুরোনো কিনা, বড্ড বেশী বেড়ে গেছে।

চারপাঁচখানা বাড়ী পরেই বীথির বাড়ী। শ্বশুরবাড়ী। তাহার বাপের বাড়ীতে তৃষ্ণা অনেকবার গিয়াছে, কিন্তু এ বাড়ীতে একবারও আসে নাই। প্রকাণ্ড বাড়ী। চকচকে ঝক্‌ঝকে। আয়নার মত মেঝে। মূল্যবান গৃহসজ্জা। চারিদিকে উৎকৃষ্ট রুচি আর আধুনিকতার ছাপ। দস্তুরমত বড়লোক। তাহারা উঠিল একেবারে দোতলার উপর, একটী ঘরে। একটা গোল টেবিলের চারপাশে চেয়ার পাতা, কিন্তু কেহ তাহাতে বসিল না। তৃষ্ণার নূতনত্বের লজ্জা বা জড়তা নাই। সে ঘরের ভিতর চঞ্চল পায়ে ফিরিতে লাগিল। তিমির সঙ্কুচিত হইয়া বসিল এক কোণে একটা সোফার উপর, কারণ সে বুঝিয়া লইয়াছিল চেয়ারে বসিলে দেওয়ালের গায়ে প্রকাণ্ড আয়নাটায় তাহার চেহারা ফুটিয়া উঠিবে।

তৃষ্ণা ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেওয়ালে টাঙানো ছবিগুলা দেখিতে লাগিল, কহিল : মানুষের চেয়ে জলমাটি তোর বেশী পছন্দ, কাব্য তোর প্রিয় কবির চেয়ে।

বীথি কহিল : ঠিকই বলেছিস্, এতগুলো ছবির মধ্যে মানুষের ছবি কেবল তিনটে। রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র আর গান্ধীর এই দেশ, এই দেশে বাস করে এঁদের ছবি তিনটে না রেখে নেমকহারামি করতে পারিনি।

তৃষ্ণা কহিল : দেশ এঁদের, এঁরা দেশের, আমাদের করণীয় আমরা করেছি কী ? শুধু ছবি টাঙিয়ে দায় এড়িয়ে গেলে নেমকহারামি ছাড়া কিছুই করা হবে না। স্বর্ণ-উষার রুদ্ধ দরজা খুলেছেন এঁরা, আমরা কী করেছি সে দরজা খুলতে ?

: আমরা আপ্রাণ চেঁচিয়েছি 'জয় নেতাজী কী জয়', 'জয় গান্ধীজী কী জয়' আর মনে মনে তাঁদের পায়ে প্রণাম করেছি : বলিয়া বীথি হাসিল।

তিমির একটা খবরের কাগজে মুখ ঢাকিয়া বসিয়াছিল। এ বাড়ীতে ঢুকিতে যাইয়াই ইহার অধিবাসীদের উপর তাহার মনটা কেন যে বাঁকিয়া গিয়াছিল বোঝা যায় নাই। বোধ হয় ইহারা বড়লোক বলিয়াই। বিতৃষ্ণ মনে বসিয়া বসিয়া সে প্রথম হইতে কেবল একটা আঘাতের সুযোগ খুঁজিতেছিল। এবার কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া আড়চোখে বীথির পানে তাকাইয়া সে আস্তে আস্তে কহিল : ঐ নগ্ন ফকিরকে দেখে লুকিয়ে লুকিয়ে হেসেছেন কতবার?

অদ্ভুত প্রশ্নে বীথি চম্‌কিয়া তাকাইল, তারপর মৃদু হাসিয়া কহিল : চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারিনি, যতবার হাস্‌তে গিয়েছি ঐ তপঃক্লিষ্ট মূর্ত্তি অশ্রু এনে দিয়েছে চোখে, তিনি নিজে ছিলেন যে অশ্রুময়।

তিমির কহিল : হাসেন নি? আমরা হাসি। পিঠের পিছনে লুকিয়ে লুকিয়ে হাসি। ফুটপাতে যারা বাবুদের জুতোর ঠোক্কর খেতে খেতে গড়ায় তাদের দেখে যেমন হাসি ওঁকেও দেখে ঠিক তেম্‌নি হাসি। অৰ্দ্ধনগ্ন অভদ্র অসামাজিক, ধৰ্ম্ম খোয়ালে, জাত খোয়ালে!

বীথি হাসিল, তৃষ্ণাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল : চাকরটা পেয়েছিস্ ভালো।

তৃষ্ণা সংক্ষেপে কহিল : বললাম্ যে বড্ড বেশী বেড়ে গেছে।

: হ্যাঁ, এত বেশী বাড়িয়েছিস্ যে দোতলায় তুল্‌তে ইতস্ততঃ করবার অবসরই পেলাম না।

তিমির আবার মুখ তুলিল, কহিল : হ্যাঁ, একটু ভুলের জন্যে পরিচ্ছন্ন ঘরটা নোংরা করে ফেল্‌লেন। আমার কাপড়ের ময়লা আপনার সোফায় লেগে যাচ্ছে। মেঝেয় বসলে ঔদ্ধত্য কম দেখানো হ'তো বটে কিন্তু তাতে মেঝের ঔজ্জ্বল্য যেতো কমে। সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময় জুতোটাকে হাতে ক'রে নিলে জুতোর ধুলো থেকে মেঝেটাকে বাঁচানো যেতো বটে, কিন্তু পায়ের ধুলো থেকে বাঁচানো যেতো না। সার্কাসওলাদের মত উপর দিকে পা ক'রে হাতের তালুর উপর

দিয়ে হেঁটে চলা আমার অভ্যেস আছে বটে, কিন্তু আমার হাত ও পায়ের তফাৎ আবার অনেকেরই নজরে পড়ে না। সুতরাং নানা দিক বিবেচনা ক'রে দেখলে বড় জোর এবাড়ীর গেটের বাইরে পর্য্যন্ত আমার আসা চলে, অর্থাৎ এবাড়ীর চাকর হওয়াও আমার চলে না। ভগবানের অসীম কৃপা আপনার ভুল ঘটিয়ে দিয়ে আমার খানিকটা পুণ্য অর্জ্জনের সুযোগ জুটিয়ে দিলেন। এ সব বাড়ীর দোতলায় ওঠা আমার কাছে বদরীনাথ দর্শনের মতো।

বীথি এমন ভাবে হাসিতে লাগিল যেন তিমিরের সমস্ত আঘাত তাহার গা হইতে পিছলাইয়া পড়িয়াছে। হাসিতে হাসিতে সে কহিল : ঠিক এক জায়গাতেই বসে থাকুন. নড়াচড়া ক'রে ঘরের সমস্ত জায়গা অপরিষ্কার ক'রে আমাদের খাটনি বাড়াবেন না যেনো। তৃষ্ণা বোস্ ভাই, আস্‌ছি : বলিয়া সে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

তৃষ্ণা চেঁচাইয়া কহিল : খিদে পেয়েছে, শীগ্‌গির খাবার নিয়ে আয়।

দূরে বীথির হাসির শব্দ শোনা গেল।

ঘরে রহিল তিমির ও তৃষ্ণা. বিকাশ আগেই বাহির হইয়া গিয়াছিল। অনেকক্ষণ কেহ কোন কথা কহিল না। ইচ্ছা করিয়াই বনিবনা তাহারা নষ্ট করিয়াছে। শুধু অহেতুক মেলামেশার কোন অর্থ নাই বলিয়াই নয় তাহা অপমানকর বলিয়াও বটে। তাহারা সদ্য ভাড়া করা বাড়ী ছাড়িয়া আসিয়াছে পরস্পরকে ছাড়িয়া যাইবার জন্য। কিন্তু ঘটনাচক্রে তাহা এখনো ঘটিয়া উঠিল না। অনেকক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিবার পর একবার আড়চোখে তাকাইয়া দেখিতে গিয়া তৃষ্ণা দেখিল তিমির তাহারই দিকেই চাহিয়া আছে। সে তাড়াতাড়ি চোখ ফিরাইয়া লইল। তিমির হাসিয়া কহিল : মিথ্যে কথা বল্‌বো না, তোমার দিকেই তাকিয়েছিলাম, দেখ্‌ছিলাম, ঠিক এই ঘরই না হ'লে তোমায় মানায় না।

: আবার ঘুসিয়ে ঘুসিয়ে কথা কইছো ? : তৃষ্ণা তর্জ্জন করিল।

: না, তাই বল্‌ছিলাম।

: তুমি কী ভেবেছিলে, আস্তাকুঁড়েয় ঢুকলে আমায় ঠিক্ মানাবে ?

: না, বরং ভাব্ছিলাম, আমার সঙ্গে দু'দিন আস্তাকুঁড়েয় ঢুকে তোমার কী হালটাই না হ'য়েছিলো।

: কী আর হবে, ছাইগাদার ভূতের সঙ্গে পেত্নী হ'য়েছিলাম।

: পেত্নী হ'য়েছিলে, পেত্নী থেকে যাওনি, তাই বল্ছিলাম।

: কিন্তু তুমি আমার সঙ্গ ছাড়ছো না কেনো ? আবার পিছু পিছু এখানে এসেছো ?

: এর কারণ মায়া মোহ কোনটাই না, গিয়ে আবার যাতে ফিরে না আস্তে হয়, সেইজন্যেই একটু দেরী ক'রে যাচ্ছি।

: সেই জন্যে ? না, আজকের দিনের পেটটা এখানেই ভরিয়ে নেবে বলে ?

বীথি ঢুকিল দুহাতে দু'থালা খাবার। পিছনে দুজন চাকরের হাতে আরো দুটো থালা ও চায়ের সরঞ্জাম, তারপর বিকাশ। টেবিলের উপর পর পর চারখানা থালা বিছাইয়া দিয়া বীথি কহিল : বোস্ তৃষা। তারপর তিমিরের দিকে ফিরিয়া কহিল : কই আসুন ?

এত সমাদর ও অভ্যর্থনায় তিমিরের মন সোজা না হইয়া আরও চিড়িক খাইয়া উঠিল। আতিথেয়তার অজুহাতে তাহাকে এত অসম্মান করিবার অধিকার কী আছে ইহাদের ? তাহার প্রাপ্য সে ইহাদের কাছে কেন পাইবে না ? তাহারা কী তাহাকে করুণার পাত্র ভাবিয়াছে ? সহসা তাহার মনে হইল যেন অনন্ত কৌতুক ও বিদ্রূপের জন্য আজ এই যতকিছু আয়োজন, তাহাকে লইয়া আসা এই ইন্দ্রপুরীতে, এমন করিয়া ভোগের নৈবেদ্য সাজানো দেবতাদের পাশে। ভাবিতে ভাবিতে তাহার মনে হইল এখানে বসিয়া বিন্দুমাত্র জলগ্রহণ করিলে যেন তাহার জাত চলিয়া যাইবে, তাহার দীনতা ও নীচতা তাহার আপন সত্তায় জনহীন সমাজের কাছে অসীম অনন্ত হইয়া উঠিবে। সে না উঠিয়া আস্তে-আস্তে শুধু কহিল : ধন্যবাদ। আপনাদের এ অভ্যর্থনা আমার মনে থাক্‌বে, কিন্তু আমায় ক্ষমা করুন।

বিকাশ কহিল : তার মানে ?

তিমির কহিল : একেই অনধিকার প্রবেশ করেছি আপনাদের ঘরে, তার উপর বিষ ছড়িয়ে আপনাদের অধঃপতন ঘটিয়ে আমার পাপ আর অপমানের বোঝা আর বাড়াতে চাইনা। আমি শুধু কী চাকর, আমি ভয়ঙ্কর।

বীথি বুঝিতে পারিলনা। সে তৃষ্ণার মুখের দিকে চাহিয়া জবাব খুঁজিতে লাগিল। তৃষ্ণা কহিল : কী জানি বাবা, ওসব ঝামেলায় আমি নেই, ও বলে ও নাকি নীচ জাতের, অশুচি। দেখোনা রাগ ভাঙাতে ভাঙাতে আর সকলে খিদেয় যাক্ মরে : বলিয়া সে বীথি ও বিকাশের দিকে ছুটো ডিস্ ঠেলিয়া দিয়া একটা নিজের কাছে টানিয়া লইয়া খাইতে লাগিয়া গেল।

বীথি হাসিয়া কহিল : এই কথা ? আসুন, আসুন ওসব আমরা মানি না, আমরা স্পর্শাতুর নই।

সহসা তিমির বিদ্যুতের মত ঝলসিয়া উঠিল : কেন মানেন না ? মানতেই হবে, মানা উচিত, না হলে সৃষ্টির সঙ্গতি থাকে কী করে ? আপনারা বড়লোক আপনারা স্রষ্টা, আপনারা প্রভু, আপনারাই পরিচালক। আপনাদের হাতেই নীতি, আপনাদের হাতেই নিয়ম, দেশ আপনাদের একচেটে। পাকে পাকে জড়িয়ে আছে দেশকে আপনাদেরই শুভদৃষ্টি। আপনাদেরই চোখের ইসারায় আপন মেরুদণ্ডের উপর ঘুরছে সমাজ—সে বেঁচে আছে আপনাদেরই পদপ্রান্ত আশ্রয় ক'রে। আপনারা যদি সরে দাঁড়ান সব যে একাকার হয়ে যাবে, দেশ যে যাবে রসাতলে। মানুষের স্তরে স্তরে বেড়া যে যাবে ভেঙে, একজায়গায় গড়িয়ে মিশে গিয়ে গোলতাল পাকিয়ে খিঁচুড়ি হ'য়ে মরে যাবে যে সব। বাছ বিচার চলে যাবে দূরে, অহঙ্কার ঘৃণা অত্যাচার যাবে ফুরিয়ে, বিদ্বেষ হিংসা পরশ্রীকাতরতা সব যে যাবে মিলিয়ে। গরীবরা যে উঠবে বেড়ে, অভাগিনী মেয়েদের পিঠের চামড়ার কালো দাগ যে উঠবে শুকিয়ে। ছিঃ ছিঃ! সে যে হবে ভীষণ বিশৃঙ্খলা, টল্-মল্ করবে যে চারধার! সিংহাসন নেবে কে তবে ? শাসনের তরবারি থাকবে কার হাতে ? সুনিয়ম

গজাবে কার মাথা থেকে? পাপ যে বেড়ে উঠবে দেশে, অন্যায়ে যে ভরে যাবে দশদিক। কাঙাল আর ভাগ্যহীনের বুকের উপর খুসির খেয়াল চরিতার্থ করবে কারা? দুরভিসন্ধি আর গোপন মন্ত্রণার জন্ম দেবে কে? মানেন না? একী কথা! মানতেই হবে, না মানলে মন্দিরের দ্বার আটকাবে কারা? যজ্ঞভূমের দরজায় আমাদের জন্য প্রহরী মতেয়ান করবে কে? উৎসবের দরজায় বাছাই কাজ আমাদের চলবে কেমন করে? অপবিত্র দৃষ্টিতে আর ঘৃণ্য স্পর্শে পাথর আর মাটির দেহ থেকে ঠাকুর যে যাবেন পালিয়ে! আপনারা না থাকলে আদর করে কবরের তলায় আমাদের আসন রচনা করবে কে? স্তিমিত অন্ধকারে দেশের মানুষ মিটমিটি চেয়ে আছে। আপনারা সরে দাঁড়ালে ঝলকে ঝলকে আলো এসে প'ড়বে তাদের মুখে, সে নির্ম্মম ঔজ্জ্বল্যে আর চক্ষুষ্মান থাকবে কি কেউ?

বীথি অবাক হইয়া তৃষ্ণার দিকে ফিরিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল: ইনি কে ভাই?

তৃষ্ণা কিছু বলিবার আগেই তিমির ঠিক্‌রাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, কহিল: আমি এক ঘৃণিত মুচির সন্তান, আমি জারজ সন্তান। যাদের আড়াল করেছে মানুষ, অস্বীকার করেছে সমাজ। যাদের জন্যে ঝড় সঞ্চিত আছে আকাশে, বিদ্যুৎ সঞ্চিত আছে মেঘে, যারা নিষ্ঠুরতম অভিশাপের পাত্র; যাদের ছেঁটে ফেলার জন্যে সৃষ্টি হ'য়েছে আইন, যাদের ঘৃণা করবার জন্য সৃষ্টি হয়েছে নিয়ম; যাদের পায়ের শব্দে দেবতা ওঠেন কেঁপে, উৎসবের ফুল যায় শুকিয়ে; যারা তোমাদের মতন বড় লোকের নির্য্যাতন সহ্য করবার জন্য তৈরী হ'য়ে এসেছে পৃথিবীতে; যারা তোমাদের কাছে অনন্ত বিদ্রূপের। আমি তাদেরই একজন, আমার জন্য কোথাও কোন আয়োজন থাকার কথা নয়, সমাদর ও অভ্যর্থনার ঘটা হবার কথা নয়। যদি কিছু থাকে সে হবে অনন্ত কৌতুকের ও অসীম নিষ্ঠুরতার। সর্ব্বত্র আমি আমার প্রাপ্য সম্মান চাই। আমি মুক্ত কণ্ঠে আবার ঘোষণা করছি, আমি এক মুচির সন্তান, আমি জারজ সন্তান। পবিত্র

সমাজের ইঙ্গিতে অপবিত্র আমরা—পদপ্রান্তে আমাদের পৃথিবী দ্বিধা হ'য়ে আছে। পবিত্র তোমরা, তোমাদের এ শুচিস্নিগ্ধ কক্ষে দাঁড়িয়ে তাকে অশুচি ক'রে আমি আজ অনন্ত অপমান বোধ করছি। আমায় ক্ষমা করো। আমি অভদ্র ইতর, তোমাদের সাম্‌নে কথার ভদ্রতাটুকুও রাখ্‌তে পার্‌লাম না—অপরিচিত তোমরা, তোমাদের 'তুমি' বলে সম্বোধন কর্‌লাম। তোমরা আমায় ক্ষমা কোরো : বলিয়া সে হঠাৎ ঘর হইতে বাহির হইয়া ক্ষিপ্রপায়ে একেবারে সিঁড়ির কাছে পৌছাইল।

বিকাশ তাড়াতাড়ি আসিয়া তাহার হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল : দয়া করে দাঁড়ান, আপনার নাম কি তিমিরবাবু?

: আমি এক মনুষ্যাকৃতি বন্য পশু, আমার আর কোন নাম নেই, আমায় ক্ষমা করো : বলিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া তিমির হুড়মুড় করিয়া নীচে নামিয়া গেল।

সমস্ত ঘর স্তব্ধ হইয়া তাহার পথের পানে চাহিয়া রহিল। অনেকক্ষণ কেহ কোন কথা কহিতে পারিল না। খানিক পরে বিকাশ ঘরে আসিয়া বলিল : কোথায় ছিল আমার এ ঐশ্বর্য্য, কোথায় ছিল এ বাড়ী! সে আজ দশ বৎসর আগের কথা, অনন্ত দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে ক'রে একদিন ভিক্ষে পেলাম পাঁচশ' টাকা। সে 'পাঁচশ' টাকার মূলধন আজ যুদ্ধের বাজারে দাঁড়ালো লক্ষ টাকায়। কিন্তু দাতাকে আজ চিন্‌তে আমার কষ্ট হচ্ছিলো! একী পরিবর্ত্তন!

তৃষ্ণা আস্তে আস্তে বাহিরের বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল।

রাস্তায় নামিয়া তিমির কোথাও দাঁড়াইল না। পিছন ফিরিয়া তাকাইলও না। সোজা সম্মুখে হাঁটিয়া চলিল। বিকাল হইয়া গিয়াছে। ভিড় বাড়িয়াছে পথের। গাড়ী ঘোড়া ও মানুষের মিছিল কাটাইয়া কাটাইয়া সে অনিনীত লক্ষ্যহীন পথে আগাইয়া চলিল। চলিতে চলিতে তাহার মনের ভিতর কেবল অনন্ত প্রশ্নের ভিড় ঠেলিয়া জমিয়া উঠিতে লাগিল। জীবন ভরিয়া সে বহু

জিনিষ দেখিয়াছে, বহু মানুষ দেখিয়াছে। আবার যেদিন সে পথে নামিয়া আসিল সেদিন হইতে তীক্ষ্ণতর হইয়াছে তার দৃষ্টি, চোখের সাম্‌নে খুলিয়া গিয়াছে দেশের ও দশের নবতর দিক। সে দেখিয়াছে সুশাসনের নামে কুশাসন, সুনিয়মের নামে কুনিয়ম ও অনিয়ম। সে দেখিয়াছে আইন ও শৃঙ্খলার নামে বে-আইন ও বিশৃঙ্খলা, সুব্যবস্থার নামে কুব্যবস্থা ও অব্যবস্থা, কুবিধি ও অবিধি। সে দেখিয়াছে রক্ষার নামে উৎপীড়ন, অনাচার, নির্য্যাতন; অহঙ্কার গর্ব্ব ও দর্প। সে দেখিয়াছে তোষামোদ ও স্বার্থসিদ্ধি, ন্যায়ের নামে অন্যায়, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম, পুণ্যের নামে পাপ; সে দেখিয়াছে ঘৃণা, অবহেলা ও নিষ্ঠুরতা, নরক, বড়লোক ও সমাজ।

সমাজ। বাংলাদেশের এ জিনিষটীকে সে কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিল না। সুষ্ঠুভাবে বাঁচিবার পক্ষে এ জিনিষের প্রয়োজন অপরিহার্য। ইহা অবাঞ্ছিত নয় যদি ইহা মানুষকে কল্যাণের পথে নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু আজিকার বাংলার এজিনিষটাকে স্মরণ করিয়া মনে মনে সে ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। মরিবার আগে সে এই প্রশ্নই পৃথিবীর কাছে রাখিয়া যাইবে, কেন হইবে তাহারা অস্পৃশ্য? কেন হইবে তাহারা অশুচি? কেন হইবে তাহারা ঘৃণার পাত্র? শত সহস্র হাড়ি মুচি বাগ্‌দী মেথর, জীবনে তাহাদের কী শুচিতা দাবী করিবার অধিকার নাই? কী সে বস্তু যাহা হইবে শুচিতা ও অশুচিতা, পবিত্রতা ও অপবিত্রতা মাপিবার মানদণ্ড? আজ কতকগুলি দলবদ্ধ স্বার্থান্বেষী মানুষের মস্তিষ্ক-গড়া উত্তুঙ্গ প্রাচীরের ওপারে বসিয়া শত সহস্র দুর্ভাগা জীবন রুদ্ধনিঃশ্বাসে ধুঁকিয়া ধুঁকিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। তাদের অবহেলিত অন্তর্দেবতার দীর্ঘনিঃশ্বাসে ভারী হইয়া উঠিতেছে দেশের বাতাস। একই স্রষ্টার একই সৃষ্টিতে আসিয়া তাহাদের ভদ্র হইয়া বাঁচিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার অধিকার কাহারো কী আছে পৃথিবীতে? সমাজকে যাহারা হাতের তালুতে বসাইয়া দোল খাওয়াইতেছে, ন্যায় ও পুণ্যের মুখোস পরিয়া অত্যাচারে মানুষের মুখ পাণ্ডুর করিয়া তুলিয়াছে, তাদের

যত ঘৃণ্য ও অপবিত্র বুঝি দুনিয়ায় কেহ নাই। তাদের কলঙ্কের কালি ওজন করিবার কী কেহ নাই ?

অপরাধী কে ? জারজ সন্তান ? তার ভূমিষ্ঠ হওয়াটা কী অবৈধ ছিল ? না অবৈধ ছিল জন্মদান করাটা ? যখন সে জন্মিয়াছিল, কোনো ফুলের চেয়ে সে কম পবিত্র ছিল না। কোনো স্বীকৃত শিশুর চেয়ে সে কম নির্ম্মল ছিল না। তারপর তাহাকে ঘৃণ্য বলিয়া প্রচার করিল কে ? মানুষ মানুষের অবৈধ মিলনকে ঠেকাইতে না পারিয়া তাহাদের সাজা দিতে না পারিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিল নিরপরাধ শিশুর উপর—তাহাকে নির্ব্বাসন দিয়া। কেন ? কেন তাহাকে সরাইয়া দেওয়া মানুষের সীমা হইতে ? কেন তাহাকে ভদ্র সন্তানের অধিকার দেওয়া হইবে না ? কেন এই কন্যারা লইবে শুধু নটীবৃত্তি, কেন এই পুত্রেরা হইবে উপেক্ষিত ? কার অপরাধে ?

আর ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মই মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রভেদ ঘটাইয়াছে আমাদের দেশে। ভগবানের নাম নিয়াই মানুষ মানুষকে ঘৃণা করিয়াছে, শিশুকে নির্ব্বাসন দিয়াছে ; নারীকে হত্যা করিয়াছে, বলিদান দিয়াছে পশুদের, নিতান্ত অকারণে বিধবাকে দগ্ধ করিয়াছে তুষায়, বিসর্জ্জন দিয়াছে সতী নারীদের। এই ধর্ম্মের নামেই মানুষ পথের পাশে অপরিচিত মুমূর্ষুর পানে ফিরিয়া তাকায় না, সৎকার করে না পরিচয়হীন দুর্ভাগার মৃতদেহকে—পাছে জাত যায়—মানুষের স্পর্শকে বীভৎস জন্তুর চেয়ে বেশী ঘৃণা করিতে শিখিয়াছে মানুষ। ধর্ম্মকে বহু দূরে নামাইয়া দিয়াছে মানুষ আজ মানুষের চেয়ে। এই বিকৃত ধর্ম্ম, এই নিরর্থকতা মানুষের মস্তিষ্ক আশ্রয় করিয়া তাদের শুভ ও কল্যাণ বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া মূঢ় পঙ্গু করিয়া তুলিয়াছে তাহাদের। যে ধর্ম্ম মানুষকে মানুষ করিয়া তোলে তাহাকে নীচে নামাইয়া ফাঁকির ফানুস করিয়া তুলিয়াছে অমানুষের দল। সমাজ চলিয়াছে এই প্রেতযোনিদের কাঁধেই ভর করিয়া। এ জগতে মানুষই মানুষের উপর অত্যাচার করিয়াছে বেশী, মানুষকে মানুষের মর্য্যাদা

হইতে বঞ্চিত করিয়াছে মানুষই। সমাজ—ইহা মানুষের কল্যাণময় শুভবুদ্ধি নয়, অমানুষের গ্লানি-গড়া নির্ভীক খামখেয়াল।

অগণিত জটিল প্রশ্নের ভিড় ঠেলিয়া চলিতে চলিতে সন্ধ্যা গড়াইয়া গেল। তারপর তাহার মনে পড়িল তৃষ্ণার কথা। হ্যাঁ, তৃষ্ণা। ঐ এক মেয়ে। বিদ্রোহিণী। তাহার বর হইবার মত ছেলে সে বাংলা দেশে খুঁজিয়া পাইল না। একটী সুমহান মানবের কল্পনা মনে মনে সৃজন করিয়া স্বপ্নে স্বপ্নে সে বুঝি জীবনটা কাটাইয়া দিবে। একটী সুমহান সমাজ। সুন্দর আদর্শ। ভাল। কিন্তু তাহার যৌবন থাকিতে থাকিতে সে কী জয়ী হইতে পারিবে? তা নাই পারুক, দেশের আর-আর বোনেরা সে স্বর্গ-সমাজের অধিবাসিনী হইতে পারিলেও বুঝি সে সুখী হইবে। ক্ষ্যাপা মেয়ে। দুরন্ত। দুটা দিন তাহার সঙ্গে সে কাটাইয়াছে, স্বপ্নের মত কাটিয়াছে সে দুটাদিন। কক্ষচ্যুত হইবার পর এমন করিয়া কোনদিনই তাহার কাটে নাই। দিনে রাতে সে দুরন্ত মেয়ে এতটুকু বিশ্রাম দেয় নাই তাহাকে। আজো পাশে থাকিলে সে নিশ্চয়ই তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিত। যাক্। তাহার মুখর স্রোতের টানে পড়িয়া তাহার জীবনের হাল বাঁকিয়া গিয়াছিল। আজ সে পাশে নাই। নাই থাক্। তাহার জন্য দুঃখ কী? তাহার দিনযাত্রার পঞ্জিকা আবার সে আগের মত করিয়া গাঁথিয়া তুলিবার অবসর পাইবে।

ভালই হইল। ঈশ্বরের কৃপা। বিত্তবঞ্চিত ভাসমান মেয়ে। উপস্থিত একটা ডাঙ্গার স্পর্শ পাইয়া গেল। না হইলে তাহাকে জড়াইয়া জড়াইয়া সে কোথায় চলিত? যে দুদিন সে তাহার সহিত কাটাইয়াছিল মনে মনে ভাবিয়াছিল তাহার জীবনের সহিত এ মেয়েটির জীবনে কোথায় যেন অত্যন্ত মিল আছে। কিন্তু আজ সে দেখিল, তাহা মিথ্যা, যেটুকু মিল ছিল তাহা ক্ষণিকের মাত্র। ইচ্ছা করিলে আজই তো সে এক কোটিপতিকে বরণ করিয়া অসীম বিত্তের অধিকারিণী হইয়া যাইতে পারে। তাহার সহিত সে-নারীর পার্থ্যক্যের অন্ত নাই। যাক্, সে চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে বাঁচাইয়া গিয়াছে। ভালই

হইয়াছে। ঘাড় হইতে ভূতের বোঝা নামিয়া গিয়াছে। কিন্তু তবুও সে ইহা কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারিবে না যে, দুদিন তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া এই মেয়েটী তাহার চলার চঞ্চল ঘূর্ণীপাকে তাহার দিনরাত্রিকে মথিত করিয়া গিয়াছে। কোথায় যেন কেমন করিয়া তাহার শিরে শান্তির শ্রাবণ ঝরাইয়া দিয়া গিয়াছে, অবিরাম অবিশ্রামের মাঝে তাহাকে বিশ্রামের স্পর্শ দিয়া গিয়াছে। যাক্, যায়গা আছে যাদের তারা যায়ই। তার জন্ম দুঃখ কী? তৃষ্ণা তাহার কাছে বুদ্‌বুদ্ মাত্র—জীবনের স্রোতে ফুটিয়া আবার ফাটিয়া গিয়াছে। সে যে চিরদিনকার পথিক, এমন কত পথিককে নমস্কার করিয়া পাশ কাটাইয়া সে চলিয়া গিয়াছে।

হঠাৎ চড়্‌বড়্ করিয়া বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামিয়া আসিল। বিস্মিত হইয়া সে উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল, আকাশ কখন গোপনে গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়া বসিয়া আছে। মুখ ঢাকিয়াছে অনন্ত-যৌবনা তারকিনী রাত্রি। বসন্তের বাতাসে জীবনের লেশমাত্র নাই। উপরের অন্তহীন অন্ধকার এখনি বুঝি রুদ্ধনিঃশ্বাসে ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিবে। বৃষ্টি আরো জোরে পড়িতে লাগিল। পথের জনতা ছুটিয়াছে যে যাহার আশ্রয়ে। তিমিরও ছুটিয়া চলিল। কতক্ষণ ছুটিবার পর আর সে অগ্রসর হইতে পারিল না। রাস্তার ধারে একটা সেডের নীচে দাঁড়াইয়া পড়িল। তখন খরধারে বর্ষণ নামিয়া আসিয়াছে।

শুধু বর্ষণ নয়, বিদ্যুৎ আর গর্জ্জন। ক্ষ্যাপা বাতাস—বাতাস নয়—ঝড়, মহানন্দে আসিয়া যোগ দিয়াছে মহোৎসবে। হ্যাঁ, মহোৎসব—মরণ মহোৎসব। সে বুঝিল এ উৎসব কেবল তাহাদের জন্যই। দিক দিক হইতে আহ্বান আসিয়াছে নিমন্ত্রণের। কাহাদের? আলো হাতে দাঁড়াইয়া আছে বিদ্যুৎ, বাঁশী বাজাইতেছে বজ্র, ঝরিয়া পড়িল করকার ফুল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এবিপুল সমারোহ দেখিতে দেখিতে দুদিকের দুটী চিত্র তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। একদিকে লক্ষপতির কক্ষ, বর ও বধূর ফুলবিলাস, প্রেমিক ও

প্রেমিকার প্রেম-কুটীর—অন্যদিকে অসীম পাথারে যাহারা নৌকা ভাসাইয়াছে, পথের পাশে যাহারা চুল্লী ধরাইয়াছে, যাহারা কুলী, মজুর, ভাগ্যবিড়ম্বিত অভিশপ্ত কাঙাল, মাথার উপর আচ্ছাদন নাই যাহাদের, যাহারা ঘৃণিত অপবিত্র লাঞ্ছিত, নিঃশ্বাস ফুরাইয়া গেলেও যাহাদের দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিবার জন্য কেহ বসিয়া নাই, তাহারা। দুটী চিত্র! এপিঠ ওপিঠ—অদ্ভুত!

সেটা ঠিক দাঁড়াইবার জায়গা নয়। একটু-একটু করিয়া তিমিরের গায়ে বৃষ্টির ছাট আসিয়া পড়িতে লাগিল। আরো খানিকটা আগাইয়া গেলে একটা গাড়ীবারান্দা মিলিতে পারিত, কিন্তু এখন আগাইতে গেলেই তাহাকে পুরোপুরি ভিজিয়াই মরিতে হইবে। সুতরাং সে নিরুপায় হইয়া পাশের একটা রোয়াকের উপর উঠিয়া বসিল। বহুক্ষণ কাটিয়া গেল। কিন্তু বৃষ্টি কমিবার নাম নাই। রাত্রিও বাড়িয়া চলিয়াছে। চারিপাশের দোকানদানী সমস্ত বন্ধ হইয়া গিয়াছে। দু'একটী মন্থরগামী ছত্রধর পথিক ছাড়া পথ জনশূন্য। সে ভাবিল আজিকার রাত্রিটা না হয় সে এইখানে বসিয়াই কাটাইয়া দিবে। এমন কত ক্রুদ্ধ রাতের দুর্গম নদী সে পার হইয়া আসিয়াছে। তাছাড়া ঘরে বাহিরে তাহার তফাৎই বা কী? দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়া বসিয়া আধ-শোওয়া হইয়া সে আস্তে-আস্তে চোখ বুজিল।

কতক্ষণ এইভাবে কাটিবার পর তাহার মাথার উপর যেন কাহার কোমল হস্তের স্পর্শ পাইয়া সে চোখ মেলিয়া তাকাইল। ও কী! ওখানে দাঁড়াইয়া ও কে! মানুষ?…হ্যাঁ মানুষই,—নারী! সুবেশা ভূষিতা সুন্দরী। সে অবাক হইয়া নির্ণিমেষে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

নারী কহিল: এখানে কেমন করে রাত কাটাবেন আপনি? চলুন, আজ আমাদের অতিথি নেই।

তিমির উঠিয়া বসিল, কহিল: ও তোমরা! কিন্তু আমায় অভ্যর্থনা ক'রে নিরাশ হ'তে হবে যে, আমি কপর্দকহীন।

নারী কহিল: জানি, তা জেনেও অভ্যর্থনা করছি।

ঃ তবে কী আনন্দ আমি দোবো তোমাদের ?

নারী কহিল ঃ আনন্দে আপনার মনে যে-আনন্দ আস্‌বে।

তিমির কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তারপর একসময়ে দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল ঃ চলো।

পথ দেখাইয়া সুন্দরী তাহাকে উপরে উঠাইয়া আনিল। একটী সুসজ্জিত কক্ষে আসিয়া খাটে-ছড়ানো শয্যা দেখাইয়া কহিল ঃ বসুন।

তিমির বসিল। খানিক পরে আরো দুতিনটী মেয়ে ঘরে আসিয়া ঢুকিল। এই শূন্য বিফল রজনীতে একটী অতিথির শুভাগমন ঘটিয়াছে জানিয়া তাহারা উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তিমিরের মুখের দিকে চাহিয়া এই প্রগল্‌ভা নারীর দল বেশী কিছু কথা কহিতে পারিল না।

কতক্ষণ নিঃশব্দে থাকিবার পর তিমির হঠাৎ কহিল ঃ আচ্ছা, তোমাদের বাবার নাম কী বল্‌তে পারো ?

একসঙ্গে সব কয়টী মেয়ে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। একজন একটী তীক্ষ্ণ কটাক্ষ হানিয়া কহিল ঃ আহা, ন্যাকা, জানেন না, আমাদের আবার বুঝি বাবা থাকে ?

তিমির হাসিল না, শুধু কহিল ঃ ও, থাকে না বটে।

আগের মেয়েটী আগাইয়া আসিয়া কহিল ঃ- রাত হয়েছে, আপনার এখনো কিছু খাওয়া হয়নি নিশ্চয়, আমাদের এখানে খেতে কিছু বাধা আছে কী ?

হঠাৎ তিমির সশব্দে হাসিয়া উঠিল, কহিল ঃ নিজের বাড়ীতে ছাড়া আর কোথাও খেতে আমার বাধা নেই।

মেয়েটী খাবার আনিয়া দিল, দিয়া কহিল ঃ সাবান দিয়ে হাত পা ভাল ক'রে ধুয়ে খাবার এনেছি, পরিষ্কার ক'রেই রেঁধেছি—অবশ্য যদি বিশ্বাস করেন। তা নয়তো যদি বলেন আপনাকে সাম্‌নে বসিয়ে ভাল ক'রে রেঁধে দিতে পারি।

কথা না বলিয়া তিমির পাঁচমিনিটের মধ্যে খাওয়া শেষ করিল। হাত সাফ করিতে করিতে কহিল: তোমাদের বুঝি বিয়ে হ'য়েছে? তোমাদের মাথায় সিঁদুর দিলে কে?

আর একটা হাসির ঢেউ বহিয়া গেল: আপনি ভয়ানক বোকা। আমাদের সিঁদুর দেবার লোকের আবার অভাব আছে বুঝি, ইচ্ছা করলে আপনিও তো দিতে পারেন।

সত্যই এসব প্রশ্ন করিবার কী প্রয়োজন আছে? অজানা তো তাহার কিছুই নাই। সে নিঃশব্দে তাহাদের মুখের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে চোখ দুটী তাহার একটু একটু করিয়া এই নারীগুলির প্রতি অসীম মমতায় ভরিয়া উঠিল। ইহাদের মুখে ওকী! হাসি! না কান্না! ইহাদের সারা দেহ বহিয়া অহর্নিশি শতধারে অজস্র আনন্দ ঝরিয়া পড়িতেছে। ইহারা হাসে, নাচে, গায়, অতিথিদের রসালাপে তুষ্ট করে, অকাতরে দেহ দান করে, তাহাদের দুর্দ্দমনীয় লালসার ক্ষুধা মিটাইয়া দেয়, বিলাসের মদির আবর্ত্তে তাহাদের স্ফূর্ত্তির পেয়ালা ফেনাইয়া তোলে। কিন্তু সে জানে, এ মিথ্যা মুখাবরণ সরাইলেই দেখা যাইবে এ হর্ষোচ্ছল দেহের পাশে পাশে থাকিয়া একটী চির-অপমানিতা বেদনাহতা নারী অহর্নিশি মাথা কুটিয়া কুটিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; তাহাদের আপন লাঞ্ছিত লজ্জিত মর্ম্মদেবতা অন্তরালে থাকিয়া থাকিয়া অসহ মুক্তির পিয়াসে ফুঁসিয়া-ফুঁসিয়া সকরুণ আর্ত্তনাদ করিয়া ফিরিতেছে। তাহাদের মুখের ঐ প্রতিটী হাসি, উচ্ছলিত প্রতিটী রেখা এক একটী অবর্ণনীয় নিষ্ঠুরতা ও বেদনার ইতিহাসের পৃষ্ঠা। তাহাদের দেহ ভরিয়া ঐ যে স্রোত, উহা হাসির নয়, অশ্রুর। তাহাদের ভালবাসিবার মানুষ রাশি রাশি আছে, কিন্তু এ অশ্রু মুছাইবার কেহ নাই।

: শোনো, তোমরা আমার কাছে এসো।

মেয়েরা কাছে আসিয়া দাঁড়াইলে তিমির তাহাদের হাত ধরিয়া বলিল: হ্যাঁ গো, তোমরা বুঝি কাঁদো? গোপনে গোপনে এমনি অতিথিহীন বর্ষামুখর

রাতে? কিংবা বৈশাখী গ্রীষ্মের নির্জ্জন দুপুরে? কিংবা দূরে যখন কোন বাড়ীতে বর ও বধূর জন্যে শানাই বেজে ওঠে? যখন তোমাদের বিরক্ত করতে থাকে না কেউ, যখন তোমরা গালে হাত দিয়ে ব'সে ভাববার সময় পাও?

অদ্ভুত প্রশ্ন। তাহারা তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তিমির কহিল : সত্যি, আমি তোমাদের খুব ভালবাসি, খূ-উ-ব, তেমন ভালোবাসা কেউ তোমাদের কখনো বাসেনা : তারপর হঠাৎ থামিয়া গিয়া শুধু কহিল : তোমরা এবার যাও, আমাকে ঘুমোতে দাও, যাবার সময় দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যেও। : বলিয়া তাহাদের হাত ছাড়িয়া দিয়া সে বিছানার উপর শুইয়া পড়িল।

তাহারা অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে আগের মেয়েটী আস্তে আস্তে কহিল : আপনার কাছে কী কেউ থাকবে না?

: না প্রয়োজন নেই, তবে তোমাদের আর কোন ঘর যদি না থাকে তোমরা এখানে আস্তে পারো। আমার ঐ মেঝেটায় স্বচ্ছন্দে কেটে যেতে পারবে।

খানিক দাঁড়াইয়া থাকিয়া মেয়েরা বাহির হইয়া যাইবার জন্য উদ্যোগ করিল। তিমির মুখ ফিরাইয়া কহিল : শোনো, তোমরা আমায় ভুল বুঝে যেয়ো না যেনো! মনে কোরো না যেন আমি তোমাদের ঘৃণা করলাম। আমি তোমাদের খুবই ভালোবাসি, তোমাদের উপর আমার প্রেমের তুলনা নেই। তোমাদের ভিতর লুকিয়ে আছে রাশি রাশি লক্ষ্মী, সামর্থ্য থাকলে আমার ঘরের তুলসী তলায় সন্ধ্যা-প্রদীপ জাল্বার জন্যে আমি তোমাদের কাছে প্রাণের নিমন্ত্রণ পাঠাতাম : বলিয়া সে পাশ ফিরিয়া শুইয়া পড়িল।

মেয়েরা আস্তে-আস্তে বাহির হইয়া গেল। এমন অতিথি তাহারা কখনো দেখে নাই।

সকালবেলা দরজা খুলিয়া তিমির দেখিল মেয়েরা ভিড় করিয়া সাম্নের

বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের সাম্‌নে আসিয়া সে কহিল: আচ্ছা চল্‌লাম, নমস্কার। তোমাদের কোন আনন্দই দিতে পার্‌লাম না, কিন্তু তোমাদের কাছ থেকে নিয়ে গেলাম অনেক কিছুই, আর সেই সঙ্গে তোমাদের ঘর থেকে ফুলের এই ঝড়া-পাপড়িটা নিয়ে যাচ্ছি।

সেই আগের মেয়েটী আগাইয়া আসিয়া তাড়াতাড়ি তাহার হাত ধরিল, চোখে তাহার একবিন্দু অশ্রু, কহিল: আপনি আমাদের যা দিয়েছেন আর কোন অতিথি আমাদের তা দেয়নি। স্পর্শ না করেও আপ নি আমাদের স্পর্শ ক'রে গেলেন। আরামের অশ্রু দিয়ে গেলেন আমাদের চোখে। পূজনীয় অতিথি আপ নি, আমরা আপনার পথ চেয়ে থাক্‌বো। আবার কবে আস্‌বেন?

: আবার যেদিন তোমরা কুড়িয়ে আন্‌বে: বলিয়া তিমির আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

আট

ইহার পর একটা মাস কাটিয়া গিয়াছে। সেই আহিরীটোলার বাসা। তিমির আর মাখন। সেই ভস্মমাখা জীবন।

গোধূলি বেলায় তিমির ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। গলিপথ হইতে বাহির হইয়া বড় রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। গন্তব্য কোথাও নাই, সুতরাং ব্যস্ততা নাই। আজ সকাল হইতে পড়িয়া সে লম্বা ঘুম দিয়াছে। আহার অন্বেষণের তাগিদও আজ নাই। কাল রাতে একটা হোটেলের উড়ে ঠাকুরের নিকট হইতে অদ্ভুত কৌশলে সে উদর-পূর্ত্তি করিয়া আসিয়াছিল। সুতরাং আজিকার রাতটা অন্ততঃ উদরের দিক হইতে বিদ্রোহের আশঙ্কা নাই। একটা লাইট-পোষ্টের নীচে দাঁড়াইয়া পকেট হইতে একটা আধপোড়া বিড়ি বাহির করিয়া সে দেশলাই জ্বালিল। টানিতে টানিতে যখন হাতে আগুণ আসিয়া ঠেকিল তখন সেটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সে একদিকে মন্থর পায়ে চলিতে আরম্ভ করিল।

চলিতে চলিতে সমস্ত নগরীটা আজ তাহার চোখে যেন নূতন বলিয়া ঠেকিল। রাজপথে নূতন রঙ. দিকে দিকে নূতন মাধুরী, নূতন জ্যোতি। অফুরন্ত যৌবন ইহার যেন নবরূপে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। পথের জনতা দ্বিগুণ বাড়িয়াছে। রুদ্ধ ঘরে আজ আর যেন কেহ বসিয়া নাই—ছেলে-মেয়ে প্রৌঢ়-বৃদ্ধ যুবক-যুবতী মুখর স্রোতের টানে যেন পথে নামিয়া আসিয়াছে। অপূর্ব্ব বেশভূষা তাহাদের—অদ্ভুত চাকচিক্যময়। ঠোঁটে হাসি, মুখে প্রলাপ, দেহে দেহে অলিঙ্গন। হাতে হাত দিয়া পা মিলাইয়া কোথায় যেন উধাও হইয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। কাহারো মনে দীনতা নাই, মলিনতা নাই, নিখিলের আনন্দ-ধারায় সব যেন ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। সমস্ত মানুষ আজ যেন সহজ সরল সুন্দর হইয়া নূতন হইয়া গিয়াছে। বিপণির দ্বারে দ্বারে ফুলের

মালা আর আমপাতার সারি, কোনে-কোনে মঙ্গলঘট আর কদলী-বৃক্ষ। থোকায় থোকায় আলোর সারি—যাহারা মুহূর্ত পরেই আত্মদান করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে—দেখিয়া মনে হয় বিশ্বে আজ অন্ধকারের স্থান নাই। কোথা হইতে আবার শানাই বাজিয়া উঠিল। তাহারই সুরে সুরে নিখিল বাতাস আর অনন্ত আকাশ প্রথম প্রেমের মত কাঁপিয়া-কাঁপিয়া উঠিতেছে। চারিদিকে উল্লাস আর উতরোল, কলরব আর কল্লোল, নিবিড় আনন্দে যেন চারিদিক আচ্ছন্ন হইয়া গেছে। দেখিতে দেখিতে তিমিরের মনে পড়িল, আজ নববর্ষ।

আজ নববর্ষ। শুভ বৈশাখের প্রথম দিন। পুরাতনের বহু দুর্গম পথ পার হইয়া আজ এই দিনটীতে নূতন বৎসর শুভ পদার্পণ করিল। সৃষ্টির মানুষ সমারোহ করিয়া এদিনটীকে সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছে। তাই এ গান, তাই এ বাঁশী, তাই এ উৎসব। নব বৎসরের অজানিত দিন-সমুদ্রের ভিতর দিয়া আবার তাহাদের তরণী বাহিয়া যাইতে হইবে। কে জানে সম্মুখে কত দুঃখ কত নিরাশা তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। কিন্তু তাহারা যে চায় অবিক্ষুব্ধ নিস্তরঙ্গ যাত্রাপথ, শিশিরের মত শান্ত স্বচ্ছ দিনগুলি। তাই এত মাধুর্য্য এত সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া নব বৎসরের এই মঙ্গলাহ্বান। গোপনে-গোপনে তাহাদের এই কামনাই মনে-মনে ফিরিতেছে, আগত দিনগুলি আমাদের শান্ত হোক সুন্দর হোক, ঝঞ্চা যেন মস্তকে আসিয়া না পড়ে। হে বিশ্ব! আমাদের দুঃখ দিও না, হে সৃষ্টি! আমাদের কাঁদিও না। তাই আজ মানুষ সরলতায় ও মধুরতায় অন্তর ভরিয়া তুলিয়াছে, আকাশের নীচে দাঁড়াইয়া হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। মনে-মনে বিশ্বাস, এ দিনটিকে মধুর করিয়া তুলিতে পারিলে আর ভয় নাই। তাই দিকে-দিকে এত প্রেমোপহার, রাশি-রাশি প্রীতির ডালি, বুকভরা আলিঙ্গনরাশি। তাই প্রবীণের জিহ্বা হইতে খসিয়া পড়িল আশীষ, নবীনের ললাট হইতে ঝরিয়া পড়িল প্রণাম, প্রেয়সীর মুখে ফুটিয়া উঠিল রঙীন চুম্বন।

তিমিরের পা মন্থরতর হইয়া আসিল। সে দেখিল সেও আজ বাদ পড়ে নাই। তাহারও দ্বারে নববর্ষ অর্ঘ্য লইয়া আসিয়াছে—নবরূপে নবছন্দে। সে অর্ঘ্য কাহারও সহিত মিলে নাই। সে দেখিল পুরাতনের জীর্ণ-ক্লান্ত দিন কাটিয়া গিয়াছে। তপ্ত বৈশাখী-থালি হাতে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে সর্ব্বনাশা পাগল—রৌদ্রস্নাত রক্তমুখ রুদ্র। তাহারই নৃত্যের ঘূর্ণীপাকে মিলিবার জন্য দিক দিক হইতে তাহার কাছে আহ্বান আসিয়াছে। তাহারই ভৈরব গানের নিঃশব্দ রাগিণী দুইকান মুখর করিয়া তুলিয়াছে। তাহারই লাগিয়া দূরান্তের অফুরন্ত পথ পথহারা বৈরাগীর একতারার মত শীর্ণ তীব্র দীর্ঘতান সুরে বাজিয়া উঠিতেছে। কোথা মানুষেরা? কই গো জনক-জননী? কোথা বন্ধু? কোথা প্রেয়সী? কোথা আশীর্ব্বাদ? কোথা উপহার? কইগো প্রেমচক্ষু? প্রসারিত ধূসর পথের ধূলা—সেই তো জননী। নিন্দা ঘৃণা অপমান—সেই তো বন্ধু ও সখা। কালবৈশাখী আর শ্রাবণ-রাতের বজ্রনাদ তাহার মঙ্গল-শঙ্খ ও আশীর্ব্বাদ। ক্ষয়-ক্ষতি প্রীতি-উপহার। লজ্জা ও গ্লানি তাহার প্রেয়সীর অক্লান্ত দুটী প্রেমচক্ষু।

হে নূতন! হে কল্যাণময়! সুস্বাগতম্!

কী ভাবিয়া তিমির আবার বাড়ীর দিকে ফিরিল।

ঘরে ঢুকিয়া সে বাক্সটা খুলিল। অর্থাৎ একদিকের দেওয়ালের গা হইতে চূণ-সুরকী-ঝরা একটী স্খলিত ইট টানিয়া লইল। তারপর গর্ত্তের মধ্যে হাত ঢুকাইয়া সেখান হইতে একটী কাগজে-মোড়া প্যাকেট টানিয়া বাহির করিল। তারপর তাহার ভিতর হইতে তৃষ্ণার দেওয়া পরিষ্কার জামাটা বাহির করিয়া গায়ে গলাইল এবং চিরুণী দিয়া আর একবার মাথাটা আঁচড়াইয়া লইয়া পুনরায় সে ঘরের বাহির হইয়া আসিল। তখন চারিদিকে আলো জ্বলিয়াছে।

বাহিরে আসিয়া সে একটানা দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া আসিল। পথ চলিতে তাহার চিরদিনই আনন্দ। আজ পদপ্রান্ত দুটী তাহার যেন মুখরতর হইয়া উঠিয়াছে। তৃষ্ণার দেওয়া জামাখানা গায়ে দিয়া আজ তাহাকে তাহার

বারবার মনে পড়িতে লাগিল। জামাখানা যেন নিশীথপ্রিয়ার মত তাহার সারা অঙ্গ জড়াইয়া আছে। কেবলমাত্র আজই যে তাহাকে মনে পড়িয়াছে, আর যে কোনদিন পড়ে নাই তাহা নয়, বরং অতীত তিরিশ দিনে তাহাকে বারবার অত্যন্ত বেশী করিয়াই মনে পড়িয়াছে, অপ্রয়োজনে অকারণে। সে স্মরণের কোন হেতু নাই। ইহাতে সে কোনদিনই আনন্দিত হয় নাই বরং বিরক্তই হইয়াছে। ইহাকে সে দুঃখহীনের ভাববিলাস বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছে, তাহার মনের পাষাণ-ফলকে সে-স্মৃতিকে সে প্রতিমুহূর্ত্তে আছড়াইয়া আছড়াইয়া মারিয়াছে। আজও সে তাহাই করিতে যাইতেছিল। কিন্তু থাক্, আজ আর মানুষে মানুষে বিবাদ নাই। তৃষ্ণার সহিত আজ আর সে বিবাদ করিবে না। সে আজ তাহার মন ভরিয়া ছাঁকিয়া আসুক। রাস্তার ধার হইতে কত লোক ফুলের মালা কিনিতেছে, সুগন্ধে নাসাপথ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। কত হাসি কত গান কত বাঁশি শুনিতে-শুনিতে সে কত পথ অতিক্রম করিয়া আসিল। আর কেবলি তাহার মনে হইতে লাগিল তাহার চারিদিকে যেন আজ রাতের স্বপন নামিয়া আসিয়াছে, আর সেই স্বপনের সূক্ষ্ম পথ বাহিয়া চলিয়াছে সে তাহার পাগলের উদ্দেশ্যে।

সহসা একটী অপূর্ব্ব মধুর সঙ্গীতে সে পথের উপর দাঁড়াইয়া পড়িল। মুখ তুলিয়া দেখিল পাশের একটী বিরাট অট্টালিকার দ্বার-পথ রঙীন কাপড় আর ফুলের মালায় সাজানো হইয়াছে। চারিদিকে আলো আর আলো—আকাশের যত তারা নামিয়া আসিয়া যেন বাড়ীখানার দেহে ফুটিয়া আছে! দ্বার-পথ খোলা। নিমন্ত্রিতেরা দলে দলে ভিতরে প্রবেশ করিতেছে। তিমির কিছুক্ষণ নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া সে-সঙ্গীত শুনিল। তারপর মুখ ফিরাইয়া ক্ষিপ্রপদে চলিয়া গেল।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে সে বহু পথ হাঁটিয়া ফেলিল। কত পথ চলিয়া কত মোড় ঘুরিয়া সে যেন কতদূরে চলিয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই অবাক হইয়া দেখিল আবার সে সেই-বাড়ীরই সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তখনো সে

সুর থামে নাই, শ্রাবণ-ধারার রাগিণীর মত একটানা রিম্‌ঝিম্‌ করিয়া তাহার কাণে আসিয়া বাজিতেছে। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শুনিতে-শুনিতে সে বিহ্বল হইয়া উঠিল। মুক্তদ্বার পথে দুচারজন লোক তখনো ভিতরে গিয়া ঢুকিতেছে। মন্ত্রমুগ্ধের মত সেও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে ঢুকিয়া আসিল। শত শত শ্রোতা, শুব্ধ নিবিড় হল। মানুষ যেন মরিয়া গিয়া শুনিতেছে। অপূর্ব্ব! অদ্ভুত! যেন কোন্ অমরদেবীর চম্পকাঙ্গুলিঘাতে সে সুর খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে।

. কী গভীর আকর্ষণে যন্ত্রচালিতের মত এক-পা এক-পা করিয়া তিমির গিয়া বসিল—একেবারে বেদীর উপর—যেখানে বসিয়া শিল্পী একমনে তাহার বীণায় অমর ঝঙ্কার সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। নতমুখ তুলিয়া শিল্পী নূতন অতিথির পানে চাহিয়া শুধু একবার মৃদু হাসিল। তখন সুর গভীরতর হইয়া উঠিয়াছে।

কতক্ষণ কাটিবার পর পর্দ্দার আড়ালে একটা মৃদু গোলমাল উঠিল; পরক্ষণেই ভিতর হইতে একটা লোক টলিতে-টলিতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিয়া উঠিল: বাঃ বাঃ, চমৎকার…এঙ্কো'র এঙ্কো'র: তারপর তিমিরের দিকে ফিরিয়াই হঠাৎ চেঁচাইয়া উঠিল: আরে, এব্যাটা মুচি আবার এলো কোত্থেকে! একটা বাড়ী মাৎ ক'রে আবার এসেছো আমার শ্বশুর বাড়ী! আমার শালীর বন্ধু তোমায় খাতিরও করে দেখছি। মশাইরা জিজ্ঞেস করুন তো, ও ওর বাবার নাম জানে কিনা।

অকস্মাৎ বজ্রাঘাতে তিমির ঠিক্‌রাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। আকুঞ্চিত হইয়া উঠিল তাহার শরীরের সমস্ত পেশী। দুই হাতে বজ্রমুষ্টি ধরিয়া একবার সে চেঁচাইয়া উঠিল: শত্রুঘ্ন! : কিন্তু পরক্ষণেই সংযত হইয়া সে তাহার বজ্রমুষ্টি শিথিল করিয়া নতশিরে কাঁপিতে-কাঁপিতে বেদী হইতে নামিয়া বাহির হইয়া যাইবার জন্য দরজার দিকে ধীরে ধীরে আগাইয়া চলিল।

ঝণাৎ করিয়া ছিঁড়িয়া গেল যন্ত্রের তার। কোল হইতে খসিয়া পড়িল

বীণা। এক মহীয়সী মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বেদী হইতে নামিয়া আসিয়া তৃষ্ণা একেবারে তিমিরের হাত ধরিল।

রসভঙ্গে শ্রোতারা হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল। তৃষ্ণা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিল : এ অপবিত্র স্থানের জন্যে আমার গান নয়, তাই যদি হবে তবে তা থেমে যাবে কেন ?

উদ্যোগীরা অনুনয়-বিনয় করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল। তৃষ্ণা তখন তিমিরের হাত ধরিয়া একেবারে রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছে, কহিল : আমার গান অমানুষের সভার জন্যে নয়, মানুষের সভার জন্যে, আপনারা আমায় ক্ষমা ক'রে ফিরে যান।

সাম্‌নে একটা ট্যাক্সি পাইয়া তৃষ্ণা তিমিরকে লইয়া তাহাতে চড়িয়া বসিল।

হু হু করিয়া গাড়ী ছুটিতেছে। ভিতরে তাহারা নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। কেবল মাঝে মাঝে তৃষ্ণা পাঞ্জাবী ড্রাইভারটাকে পথ বলিয়া দিতেছিল। রাস্তার মাঝখানে কেবলমাত্র একটীবার গাড়ী থামাইয়া একটী দোকান হইতে একরাত্রির জন্য সে একটী সেতার ভাড়া করিয়া লইয়াছে।

গঙ্গার ধারে আসিয়া তাহারা গাড়ী হইতে নামিল। ড্রাইভারকে বিদায় দিয়া দুইজনে পায়ে হাঁটিয়া চলিল। কতক্ষণ চলিবার পর সাম্‌নে একটী নির্জ্জন জেটি দেখিতে পাইয়া তাহারা তাহার ভিতর ঢুকিয়া আসিল।

নির্জ্জন জেটি। তীর হইতে বহুদূর অবধি বিস্তৃত হইয়া গঙ্গা-বক্ষে ভাসিতেছে। চারিদিক ফাঁকা। কোথাও কোন পোত নাই। শুধু তীরের কোলে কতকগুলি নৌকা নোঙর করিয়া আছে। এই জনহীন প্রান্তে আসিয়া তাহারা পাশাপাশি চুপটী করিয়া বসিয়া রহিল।

তৃষ্ণাই প্রথমে কথা কহিল : তুমি আর চুপ ক'রে থেকো না, কথা কও।

তিমির ধীরে-ধীরে কহিল : না তৃষা, আমি চুপ ক'রে নেই, আমার মন কথা কইছে।

তৃষ্ণা কহিল : আচ্ছা বলতো, তুমি কেন ওখানে গিয়েছিলে ? ভুল তে তুমি কখনো করোনি ?

তিমির কহিল : না তৃষা, কখনো করিনি। কিন্তু কী জানি কে গিয়েছিলাম! কে যেন আমায় টেনে নিয়ে গিয়েছিল! আমি আত্মবিস্ম হ'য়েছিলাম, মরে গিয়েছিলাম।

তৃষ্ণা কহিল : যারা দুর্গম পথের যাত্রী তাদের জন্যেই সেরা অমৃত সঞ্চি হ'য়ে থাকে।

: সে অমৃতটী কী তৃষা ?

তৃষ্ণা আর কথা কহিল না। আস্তে-আস্তে সেতারখানি হাতে তুলি লইল। অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে বসিয়া উন্মুখ তারে ঝঙ্কার তুলিয়া চলিল। পা চাঁদের আলোয় তাহার সে বসিবার ভঙ্গিটুকু যেন বিশ্বের চিরন্তন শিল্পী ধ্যান-স্তিমিত চোখের চিরআনন্দ মূর্ত্তি নিয়া নামিয়া আসিয়াছে। আর স্থরটুকু যেন তাহারই স্বপ্ন—যাহা দুঃখ-জর্জ্জর কঠিন রাতে বিশ্বের অশ্রুসি নরনারী যুগে যুগে একান্ত মনে কামনা করিয়া আসিয়াছে। কেহ শুনি না, মানুষ নাই, সভা নাই, কোন রসজ্ঞ শ্রোতা নাই, শুধু শুনিল নির্ব্ব আচ্ছন্নময়ী রাত্রি, আর একটী তাপিত বিক্ষুব্ধ প্রাণ, যে আজ এই নারী হৃদয়ের স্নিগ্ধ ছায়ান্ধকারে ক্ষণিকের পথিকের মত বসিয়া একটু বিশ্রাম করি লইতেছে।

স্থর থামিয়া গেল। কেহ কথা বলিল না। তিমির শুইয়াছিল, মাথা পৌঁছিয়াছিল তৃষ্ণার কোলের কাছে। সেতারখানি আস্তে-আস্তে পা রাখিয়া দিয়া তৃষ্ণা পরম যতনে তাহার মাথাটী কোলের উপর তুলিয়া লইল।

তিমির দুইহাত দিয়া তৃষ্ণার ডান হাতখানি বুকের উপর তুলিয়া লই কহিল : তুমি এত সুন্দর বাজাতে পারো তৃষা ?

মধুর হাসিতে তৃষ্ণার মুখখানি ফুলের মত ফুটিয়া উঠিল, কহিল : আ আজ বাহির বিশ্ব জয় করতে চলেছি বলে কি অন্তর-বিশ্বকে ভুলে যাবে

কঠিন হ'য়ে উঠ্‌ছি বলে আমাদের কোমলতা যদি ফুরিয়ে যায় পৃথিবী কী শুকিয়ে উঠবে না?

: কী জানি তৃষা, জানি না। কিন্তু জানি, তুমি যখন আমার কাছে থাকো, আমি মাঝে মাঝে নিজেকে ভুলে যাই, তুমি আমাকে আচ্ছন্ন ক'রে থাকো। তুমি যখনই আমার পাশে আসো, আমি যেন অমৃত হয়ে উঠি, আমার দেহের প্রতিটী তরঙ্গ যেন এক এক খানি মর্ম্মরিত বাঁশী হ'য়ে ওঠে।

তিমিরের মাথার চুলগুলি লইয়া খেলা করিতে করিতে তৃষ্ণা কহিল: গোপন ক'রে রাখলেও তোমার বাঁশীর সে-সুর আমি শুনতে পাই।

: পাও কী তৃষা? না বোধ হয় পাও না। তুমি জানো না, তুমি সাম্‌নে থাকলে আমার পাষাণ-রাত্রির নয়নে স্বপ্ন দোলে, তারা ফোটে, চাঁদ ওঠে। মাঝে মাঝে মনে হয়, আমি মৃত্যুহীন, আমি নিরর্থক নই, আমার অস্তিত্ব অর্থে ভরা। মনে হয় এ পৃথিবী আমারো, এর সূর্য্য এর তারা এর চাঁদ, আমারো। আমারো প্রয়োজন আছে এখানে, কাজ আছে সংসারে। কেন এমন হয়? তুমি যখন আমার কাছে থাকো আমি বিশ্বের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকি, তুমি যখন দূরে চলে যাও, আমি বিশ্ব থেকে দূরে চলে যাই। কেন এমন হয় তৃষা? একে তোমরা কী বলো?

একটু নীরব থাকিয়া তৃষ্ণা আস্তে আস্তে কহিল: ভালোলাগা।

: আঃ, বাঁচলাম তৃষা, তুমি যে একে ভালোবাসা বলনি তাতেই আমি বেঁচে গেলাম। এতদিন তুমি আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে এসেছো, আজ আমায় শক্তি দিলে।

: কেন, তুমি কী জীবনে ভালবাস্‌তে চাও না?

: চাই, খুবই চাই। এমন কী ভালোবাসাটাই ছিলো আমার চিরজীবনের তপস্যা। তুমি জানো, দেশকে ভালবেসেছিলাম, মানুষকে ভালবেসেছিলাম আমি। আর ভালবাসা পেয়েওছিলাম একটী নারীর কাছ থেকে—সে সেই ভালোবাসা যা 'প্রেম' নামে বিশ্বের নরনারীর যৌবন-রাঙা মনে অক্ষয় হ'য়ে

আছে। সে ভালোবাসা ছিল যেমনি গভীর তেম্‌নি অন্তঃসারশূন্য। কত বাধা, কত ক্ষতি, কল্পনার কত দুস্তর পথ সে পাড়ি দিয়ে এলো, কিন্তু আমার দুর্দ্দিনকে সে সহ্য কর্‌তে পার্‌লো না। আজ আমি পথ-বিপথের পান্থ, আমি মরণ যোদ্ধা, কিন্তু মাথায় আজ আমার শিরস্ত্রাণ নেই, সর্ব্বমানবের আঘাতের জন্য আমার শির উন্মুক্ত। ধনীর এঁটো পাতের উদ্বৃত্ত অন্নের মত পথঘাটে ভালোবাসা কী ছড়িয়ে আছে তৃষা? কোথায় কার প্রেম! কী আশায় কোন্ দুঃখে এ গ্লানি-জর্জর অনিশ্চিত জীবনের জন্যে প্রতীক্ষায় ব'সে থাকবে তৃষা?

তৃষ্ণা কিছুক্ষণ নত হইয়া নিঃশব্দে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর কহিল: কিন্তু তুমি কী চিরকালই তোমার জীবনটাকে নিয়ে এম্‌নি খেলা ক'রে যাবে?

: আমার কাজ ফুরিয়েছে তৃষা, কাজের শেষেই খেলা। যেদিন থেকে আমার জ্ঞান হ'য়েছিলো, যেদিন থেকে আমি ভাব্‌তে শিখেছিলাম, সেদিন চেয়ে দেখ্‌লাম, দেশের অর্দ্ধেক লোক মরণের পথে বেরিয়ে পড়েছে। তারা যে লাঞ্ছিত মায়ের নামে জয়ধ্বনি কর্‌বে, সে সাড়াটুকুও তাদের গলা দিয়ে ফুটছে না। অথচ এত লোক—যাদের প্রাণের স্বচ্ছন্দ নিঃশ্বাসপ্রবাহটুকুই মার অঙ্গের বেদনা ঘুচাতে যথেষ্ট—এরা কী অকালে মুছে যাবার জন্যে এসেছিলো পৃথিবীতে? আমার স্বপ্ন ছিলো, এই মৃত্যুপথযাত্রীদের কবে ফিরিয়ে আন্‌বো—পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর্‌বো তাদের। সেদিন আমি ছিলাম ঐশ্বর্য্যবান, আমার কুলে ছিলো আভিজাত্য, শীলে ছিলো শালীনতা। সে স্বপ্ন আমার খান্ খান্ হ'য়ে গেছে। আমার কাজ ফুরিয়ে গেছে সবার সঙ্গে, কাজের শেষে এবার খেলা ছাড়া আর কী তৃষা?

একটু নীরব থাকিয়া তৃষ্ণা কহিল: একদিন তুমি এসেছিলে এ পৃথিবীতে, ভালোবেসেছিলে একে, তোমার অনুপরমাণুতে তোমার চেতনায় মিশে একাকার হ'য়েছিলো এর আলো অন্ধকার, কিন্তু আজ সহসা অকারণে তুমি

বিদায় পেয়ে গেছ এও তো মিথ্যা নয়। তাই আমি কী ভাবি জানো? এই যে অভিনয়—প্রবেশ ও প্রস্থান, আসা ও যাওয়া, এর মাঝখানে নিশ্চয়ই কোথায় যেন একটী পরিপূর্ণ মিল আছে। না হ'লে এ বিষম ফাঁকিতে সৃষ্টি এতদিন ফতুর হ'য়ে যেতো। কী জানি, আমরা মেয়েমানুষ, কোন নিদারুণ নিষ্ফলতার কথা ভাব্‌তে আমাদের কষ্ট হয় ব'লেই হয়ত একথা আমার মনে এলো।

ঃ আচ্ছা তৃষা, তুমি সভা ছেড়ে আমার সঙ্গে চলে এলে কেন বলতো?

ঃ ভাল লাগ্‌লো না ব'লে। এমন নয় যে তোমার জন্যে তৃষিত হ'য়েছিলো আমার অন্তর, তাই তোমার দেখা পেয়েই উঠে চ'লে এলাম। দেখলাম, তোমার চেয়ে ও-জায়গাটা ঢের বেশী নোংরা। জানি, এর পরেই তোমার মন জান্‌তে চাইছে, এবার আমি কী কর্‌বো। সে কথা এখন আমি নিজেই জানি না। যেদিন জান্‌বো তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না, ঠিক করেছি সেদিনই একথা ভাবতে বস্‌বো।

এই দুই জন কেহ কাহারো কাছে রহস্যময় বা রহস্যময়ী নয়। তাহারা উভয়ে উভয়ের কাছে স্পষ্ট প্রকাশমান। চাতুরী বা ছলনার অন্তরালে কেহ বসিয়া নাই। আজ তাহারা এত কাছাকাছি বসিয়া আছে—এ উহাকে স্পর্শ করিয়া আছে, একজনের নিঃশ্বাস আর একজনের অঙ্গে আসিয়া লাগিতেছে, মিলন রাতের প্রিয় ও প্রিয়ার মত একজন আর একজনের কোলে মাথা রাখিয়া ক্ষণে ক্ষণে কাঁপিয়া উঠিতেছে, তাই বলিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে আসিয়া পরম সুযোগে প্রাণ ভরিয়া এ দুটী নরনারী পরস্পরের কাছে তাহাদের অন্তরের প্রেম নিবেদন করিতেছে এ কথা বলিলে কোথায় যেন একটা বিরাট মিথ্যা রহিয়া যাইবে। তবু এ মুহূর্ত্তটুকু কেমন করিয়া যেন তাহাদের জীবনে ভুলিবার নয়।

হঠাৎ এক ঝলক তীব্র আলো সমস্ত জেটিটা আলোকিত করিয়া দিয়া পরক্ষণেই মিলাইয়া গেল। বোধ হয় দূরাগত কোন জাহাজের সন্ধানী আলো।

তৃষ্ণা তাড়াতাড়ি তিমিরের মাথাটা নীচে নামাইয়া দিয়া নিজেকে লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িল। কাপড়-চোপড় সংযত করিয়া ঝরিয়া পড়া খোঁপাটা ফিরাইতে ফিরাইতে কহিল : চিরকাল তোমাদেরই জন্যে আমাদের নির্লজ্জ হ'তে হয়েছে। আসলে কিন্তু আমরা এত বেহায়া নই। ছিঃ, জাহাজের লোকগুলো দেখে কী ভাব্‌লো বলতো! আরো কত লোকে হয়ত কত জায়গা থেকে দেখেছে, তারাই বা কী ভাববে?

তিমির উঠিয়া বসিয়া কহিল ঃ আমরাই বা কী ভাবলাম্?

তৃষ্ণা হাসিল, কহিল ঃ সেই নিয়ে তোমার কোলে মাথা রেখে আর একবার ভাব্‌তে লেগে যাওয়া যাক্, কী বলো? তোমাদের চরিত্রের একটা মহৎ দোষ, দুঃখে তোমরা যদিও ঠিক থাকো, সুখে তোমরা ঠিক থাক্‌তে পারো না। কিন্তু কী ক'রে হাঁট্‌বো বলতো, নূতন জুতোটা প'রে পায়ের আঙুলে ফোস্কা হ'য়ে গেছে।

তিমির হাত দিয়া পরীক্ষা করিতে যাইতেই তৃষ্ণা পা-খানি টানিয়া লইয়া হাসিয়া কহিল ঃ পাশে এটা যমুনা নয়, গঙ্গা। শেষে আমার পা-খানাই পছন্দ হোলো তোমার? এতরাতে কখন আর তোমায় প্রণাম কর্‌বো বাপু? একটু সুতো পেলে বরং রুমালটা আঙুলে জড়িয়ে নিতাম।

তিমির একবার এদিক-ওদিক চাহিল। তারপর কী মনে হইল, গায়ের জামাখানার ভিতর হইতে যজ্ঞোপবীতটী টানিয়া বাহির করিয়া এক ঝট্‌কায় তাহা ছিঁড়িয়া লইয়া তৃষ্ণার সাম্‌নে ধরিয়া বলিল ঃ তোমার পায়ের জন্যেই বুঝি আজো এটা ছিলো তৃষা।

চাঁদ ডুবিয়া যাইতেছিল। ক্ষয়িষ্ণু জ্যোৎস্নায় স্তব্ধ একটী ছায়ার মত তৃষ্ণা অনেকক্ষণ চুপটী করিয়া বসিয়া রহিল, তারপর আস্তে-আস্তে কহিল ঃ পৃথিবীর আর যেখানে যাই তুমি হও আমার কাছে তুমি ব্রাহ্মণই। উপবীত ছিন্ন ক'রে সে ব্রাহ্মণত্ব কী তুমি ঘোচাতে পার্‌বে? ব্রাহ্মণত্ব উপবীতে নেই, আছে মনুষ্যত্বের বিকাশে। এটা পায়ে স্পর্শ ক'র্‌তে আমার বাধ্‌লো কেন জানো?

উপবীত ব'লে নয়, তোমার গলায় ছিলো বলে : বলিয়া উপবীতটী তিমিরের হাত হইতে লইয়া আস্তে-আস্তে সে গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিল !

রাত হইতেছিল। দুইজনে উঠিয়া তাহারা জেটি হইতে বাহির হইয়া আসিল। এবার একটা আশ্রয়ে পৌছিতে হইবে। আর একটু রাত হইলেই তাহাদের মত লোকের আশ্রয় মিলিবার সুবিধা হইবে। তৃষ্ণা কহিল : চল, ঐ ফাঁকা জায়গাটার ওদিক দিয়ে ঘুরে ওদিকের রাস্তায় গিয়ে প'ড়্বো, তাড়াতাড়ি কী ? : চলিতে চলিতে বুঝি তাহাদের একমাস আগেকার সেই পুরোণো দিনকয়টির কথা মনে পড়িতেছিল।

একটা প্রকাণ্ড বটগাছ—জটাজুটধারী। কিন্তু বৃদ্ধত্বের এতটুকু লক্ষণ নাই। তার বিস্তারের মাঝে সে এতটুকু আলো আসিতে দেয় নাই। কী অন্ধকার ! সেই অন্ধকারের ভিতর দিয়াই তাহারা চলিতে লাগিল। : ইস্! কী ও! : তৃষ্ণা হঠাৎ যেন হোঁচট্ খাইয়া একটা টাল্ সামলাইল।

ট্যাঁ ট্যা ! পায়ের তলায় কী যেন কোঁকাইয়া উঠিতেছে !

: আলো, আলো—

তিমির খস্ করিয়া দেশলাই জ্বালিল। শিশু ! শিশু ! পায়ের তলায় নগ্ন এতটুকু একটী শিশু !

তৃষ্ণা নির্ব্বাক হইয়া ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিল। তিমিরের মুখের পানে একবার চাহিল। তারপর নত হইয়া শিশুটীকে কুড়াইয়া লইতে গেল।

তিমির খপ্ করিয়া তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া একটা অস্বাভাবিক কণ্ঠে বলিয়া উঠিল : কাকে তুলে নিতে যাচ্ছ ? এত রাতে এ নির্জ্জন নদীতীরে ওর পাশে যখন কেউ নেই, ও কী জান ?

: জানি। আমার কাছে তুমি যেমন সত্য, এও তেমনি সত্য।

: তোমার চারপাশে এখনো এত বড় দেশ, এত মানুষ, তোমার সাম্‌নে এখনো অগণিত দিন, তার মাঝে তোমার সাথীহীন মুকুলিত নারী জীবন !

ঃ তাই তো একে ছেড়ে যেতে পারছি না ঃ কম্পিত হস্তে তৃষ্ণা শিশুটীকে কোলে তুলিয়া লইল।

তারপর গাড়ী করিয়া একেবারে একটা প্রকাণ্ড হোটেলে। দামী হোটেল। একখানা ঘর পাইল তাহারা। দুপাশে দুটো খাট, গদি-বিছানো। চেয়ার, টেবিল, সোফা, সেল্‌ফ্‌, আলমারী, ফুলভরা-ফুলদানী, দেয়ালে ছবি। নীল সাদা আলো। সুসজ্জিত কক্ষ। পাশের একটা দরজা খুলিলেই বাথ্‌রুম্‌। একে একে হাত পা ধুইয়া আসিল তাহারা। তৃষ্ণা তাড়াতাড়ি শিশুটীকে দুধ খাওয়াইয়া দিল। তাহার হুকুম মত 'বয়' ইতিমধ্যে ইহা রাখিয়া গিয়াছিল।

তারপর তাহারা খাওয়া দাওয়া শেষ করিল। হাতমুখ ধুইয়া তৃষ্ণা দরজায় খিল দিয়া যে-খাটে শিশুটী ঘুমাইতেছিল তাহাতে উঠিয়া বসিল। ক্ষণকাল শিশুটীর মুখের দিকে সে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। তারপর মুখ ফিরাইয়া নিঃশব্দে জলন্ত আলোটার পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল। এই কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই তৃষ্ণা যেন নূতন মানুষ বনিয়া গিয়াছে। তিমির পরম আরামে মশলা চিবাইতে চিবাইতে অন্য খাট্‌টার উপর ধুপ্‌ করিয়া গড়াইয়া পড়িল। বহুদিন পরে দামী দামী খাবার পাইয়া সে বুঝি আজ দিশাহারা হইয়া খাইয়াছে।

বহুক্ষণ কাটিয়া গেল, তৃষ্ণা মুখ ফিরাইল না। তিমির কহিল ঃ কী ভাবছো।

তৃষ্ণার ধ্যানভঙ্গ হইল, কহিল ঃ ভাব্‌ছি এর কথা।

ঃ আমি ভাব্‌ছি তোমার কথা।

ঃ একটু ভুল হোলো। আমি ভাব্‌ছি এর কথা আর তোমার কথা।

ঃ আমারো ভুল হ'য়েছে। আমি ভাব্‌ছি তোমার কথা আর ওর কথা।

ঃ আমার কথা কী তুমি আজকাল বেশী ক'রে ভাবছো নাকি?

ঃ না বল্‌লে মিথ্যে বলা হবে। তুমি ফিরে ফিরে কেবলি আমার লালনকর্ত্রী মাকে মনে করিয়ে দিচ্ছ। আমার লালনকর্ত্রী মা ঠিক অম্‌নি ক'রে একদিন আমায় কুড়িয়ে নিয়েছিলেন। তার হৃদয়ের মর্ম্মরিত সুরের

রেশটুকু যেন তুমি। কিন্তু তাঁর থেকে তোমার তফাৎটাই আজ আমার বেশী ক'রে মনে প'ড়ছে। তিনি ছিলেন বিবাহিতা, তুমি কুমারী।

: তিনি কুমারী থাক্‌লে তোমায় ফেলে যেতেন এই কথা তুমি বল্‌তে চাচ্ছো?

: না, তা চাই না। তাঁর কুমারী জীবনের মনের কথা আজ অবুঝের মত অনুমান করতে গিয়ে তাঁর বিগত আত্মাকে আমি পীড়িত কর্‌তে চাইনা। কিন্তু তুমি দেখেছো কী তৃষা, নিবে-যাওয়া প্রদীপের মত মিটি মিটি ঐ এত্তোটুকু প্রাণটির সাথে আজ আরো কত কী তুমি কুড়িয়ে নিলে?

: না, তা দেখ্‌তে গেলে আমার বিধাতা আমাকে নারী নয়, নারীবেশী ক'রে সৃষ্টি করতেন : বলিয়া তৃষ্ণা ঘুমন্ত শিশুটীর মুখের উপর খানিক দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিয়া একসময়ে মুখ তুলিয়া কহিল : আদিমতম সৃষ্টিতে মানুষের আবির্ভাব ছিলো যেমন আকস্মিক, মানুষের জীবনের এক একটা ঘটনাও ঠিক তেম্‌নি। কোথা দিয়ে যেন কী হ'য়ে যায়! কিন্তু এই হোটেলগুলো থেকে লোকের কী সুবিধেই না হ'য়েছে। দামে চড়া বটে, কিন্তু অসুবিধে কিছু থাকে না। এখানে না এলে আজ দুধ কোথায় মিল্‌তো বলতো?

মিলিত না বটে। রাত হইয়াছিল। দোকানদানী সব বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। বহুদিন পূর্ব্বে কাগজে প্রকাশিত একটী সংবাদের কথা তিমিরের মনে পড়িল। ভার্জ্জিনিয়ার একজন মহামান্য জজসাহেব একটী গরুকে পাঁচ গ্যালন দুধ জরিমানা করিয়াছিলেন। গরুটীর অপরাধ, সে রাস্তার উল্টাদিক দিয়া যাইতেছিল। এক ব্যক্তি তাহাকে সাহেবের নিকট ধরিয়া লইয়া গেলে তিনি তাহাকে গরুটীর কাছ হইতে পাঁচ গ্যালন দুধ আদায় করিয়া লইবার আদেশ দিয়াছিলেন। এরকম অপরাধী গরু তিমির কলিকাতার রাস্তাঘাটে প্রচুর ধরিতে পারিত। কিন্তু এমন আইন ও এমন সুবিচারক সে কোথায় পাইত? পাইলেও সে এত রাতে তাঁহার ঘুম ভাঙাইত কী করিয়া? মুখ ফুটিয়া

সে কহিল : সুবিধে হ'য়েছে বৈকি। এ ছাড়া আরো কত দিকে যে কত লোকের সুবিধে হ'য়েছে !

: অর্থাৎ ?

তিমির কহিল : এসব হোটেলে কারা কিসের জন্যে আসে জানো তো ?

এদিকে তৃষ্ণার খেয়ালই ছিল না। হঠাৎ সে কথা মনে পড়িতেই সে লজ্জিত হইয়া উঠিল। সে-লজ্জা আড়াল করিবার জন্য তাড়াতাড়ি বেড সুইচটা অফ্ করিয়া টুপ্ করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িয়া সে কহিল : চুপ করো, খোকা উঠে পড়বে।

সকালবেলা সেতারখানি ঘাড়ে লইয়া তিমির হোটেল হইতে বাহির হইয়া পড়িল। তৃষ্ণার হুকুম, সে-খানি ফেরৎ দিয়া দোকান হইতে অতিরিক্ত জমার টাকাটা ফেরৎ লইয়া আসিতে হইবে এবং ঐ সঙ্গে অন্যত্র একটা ভাড়া বাড়ীরও সন্ধান করিয়া আসিতে হইবে। তৃষ্ণা বলিয়াছে, এখানে যাহারা আসে হোটেলের লোকেরা তাহাকে সে দলেরই সামিল করিয়া ভাবিবে, তাহাদের এই মনে-ভাবার অসম্মানটুকু খোকার জন্য সে না হয় সহ্য করিবে, কিন্তু এখানে থাকিবার জন্য এত টাকা সে পাইবে কোথায় ? সে নিঃসম্বল হইয়া আসিয়াছে, কালই হয়ত তাহাকে দুলটা বিক্রয় করিতে হইবে। তাই দোকানে জমা-দেওয়া টাকাটা দিয়া হোটেলের ঋণ মিটাইয়া সে আজই এখান হইতে বাহির হইয়া পড়িবে। নূতন বাসায় গিয়া সে তিমিরকে একটা চাকরী ধরাইবে। যদি সে অক্ষম হয় তৃষ্ণা নিজেই চাকরী করিতে যাইবে, আর তিমির বাসায় থাকিয়া খোকাকে সামলাইবে ও ভাত রাঁধিবে। টুং টাং করিয়া সেতারের তারে আঘাত করিতে করিতে সে পথ চলিতে লাগিল। তৃষ্ণার কালিকার বাজনার সুরটা তাহার মনে মনে ফিরিতেছিল। কিন্তু বাহির হইবার সময় তৃষ্ণা তাহাকে 'অরসিক আনাড়ী' বলিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছিল, সে কথা মনে পড়িতেই বেশী কালোয়াতি করিবার সাহস আর সে পাইল না।

দোকানে আসিয়া সেতারটী রাখিয়া পকেট হইতে সে রসিদটী টানিয়া বাহির

করিল। এবং সেই সঙ্গে আরো একখানি ভাঁজকরা পুরু কী কাগজ তাহার হাতে বাহির হইয়া আসিল। এত কাজের লোক সে কবে হইতে হইয়া উঠিয়াছে? পকেটে কাগজ পত্র! তৃষ্ণা তাহাকে ইতিমধ্যেই কোনও অফিসের বড়বাবু করিয়া দিয়াছে নাকি? কাগজটা খুলিয়া সে চোখের সাম্‌নে মেলিয়া ধরিল। কালো কালি দিয়া বড় বড় করিয়া অনেকখানি লেখা। পড়িতে পড়িতে তাহার চোখে মুখে অদ্ভুত অস্বাভাবিকতা ফুটিয়া উঠিল। দেশকালের কথা মনেই রহিল না। পড়া শেষ হইলে সেইখানে দাঁড়াইয়া হঠাৎ একটা বিচিত্র শব্দে সে হাসিয়া উঠিল। কিন্তু আর মুহূর্তকাল দেরী করিল না। কাগজটা ভাঁজ করিয়া পুনরায় পকেটে পুরিয়া দোকানীর দেওয়া টাকাগুলি লইয়া সে আর কোন দিকে তাকাইল না, একেবারে সোজা হোটেলের পথ ধরিল।

ঃ কী, এত শীগ্‌গির ফিরে এলে যে?

ঃ তল্পি বাঁধো, বাসা পেয়ে গেছি।

ঃ এতো শীঘ্রি বাসা পেয়ে গেছো, মানে?

ঃ পেয়ে গেছি মানে পেয়ে গেলাম, বাসা নয়, বাড়ী···আমার নিজের।

ঃ ও, সেই নিমগাছ যার সিঁড়ি বুঝি?

বুক ফুলাইয়া খানিকটা আমীরী চালে তিমির কহিলঃ একটু সাবধানে কথা বোলো, দেখতে গেলে আমি এখন রাজা।

ঠোঁট বাঁকাইয়া 'ফু' করিয়া তৃষ্ণা কহিলঃ ভূঁইশূন্য?

ঃ সেটা আমার বাড়ীতে পা দিলেই বুঝ্‌তে পার্‌বে। এখন ওঠো ওঠো, তোমার বাণ্ডিল কাঁধে নাও।

ঃ কিন্তু ব্যাপারটা কী?

ঃ কিছুই নয়, একটা কাগজ মাত্র। আমার জন্মদাতা বৃদ্ধ বয়সে স্নেহরসে সিক্ত হ'য়ে আমার জন্য যা সংগ্রহ ক'রেছিলেন আমার গর্ভধারিণীর কাছ থেকে পেয়ে আমার পালনকর্ত্তা তা আমায় দিয়েছিলেন বিদায়কালে। আমি তা ভুলেই গিয়েছিলাম। বিদায়কালে তোমার দেওয়া এই জামাখানাই পরেছিলাম,

এবং মনেই ছিল না তারই পকেটে এ-রত্ন সঞ্চিত হয়েছিল, আজ কয়লা তুলতে তুলতে হঠাৎ সোনা বেরিয়ে পড়েছে। চল, একদিন তুমি আমার বাড়ীতে আশ্রয় নিতে চেয়েছিলে, আজ তোমার সে-সাধ পূর্ণ ক'রে দিই।

ঃ কই দেখি কাগজ খানা।

ঃ এটা তোমাদের স্বভাব, তোমাদের ঔৎসুক্য এত বেশী যে, বরক'নের ঘরের দরজার ফুটোয় চোখ রেখে দাঁড়িয়ে রাতের পর রাত তোমরা কাটিয়ে দাও। এখন ওঠো তাড়াতাড়ি, সময় নেই, যেতে হবে কোলকাতার বাইরে। বাড়ীতে গিয়ে সন্ধ্যেবেলা চাটা খেয়ে আরাম ক'রে বসে দেখো তখন।

তৃষ্ণা উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল ঃ শেষে অগাধ সমুদ্রে ভাসাবে না তো?

তিমির কহিল ঃ এখন কোন্ ডাঙাই বা ছুঁয়ে আছো? যদি একান্তই ভাসো, সেটা হবে সমুদ্র পরিবর্ত্তন মাত্র।

ঘণ্টা দেড়েকের ভিতর বাহির হইয়া তাহারা হাওড়াতে আসিয়া পৌছিল এবং ই, আই, আর এর একখানা গাড়ীতে চড়িয়া বসিল।

বিকাল নাগাইত তাহারা যে ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিল, সেটা তৃষ্ণার কাছে অপরিচিত নয়। ই, আই, আর এর ব্রাঞ্চ লাইনের একটা অখ্যাতনামা ষ্টেশন। আড়ম্বরহীন। কিন্তু সুষমায় ভরা—দেখিতে নেশা লাগে চোখে।

প্লাটফরমে তাহারা নাবিয়া দাঁড়াইল। তৃষ্ণার মনে হঠাৎ যেন আনন্দ ফুরাইয়া গিয়াছে। কোলকাতা ছাড়িয়া এখানে সে কোথায় আসিল! এদিক ওদিক তাকাইয়া কহিল ঃ এবার কোনদিকে যাবে?

ঃ দাঁড়াও, একটা গাড়ী দেখি ঃ বলিয়া তিমির ষ্টেশনের বাহিরে চলিয়া গেল।

তৃষ্ণা এক পা এক পা করিয়া সমস্ত প্লাটফরমটা একবার ঘুরিয়া আসিল। দেখিবার কিছুই নাই তবুও দেখিতে ইচ্ছা করে। এর কাঁটালিচাঁপার কুঞ্জ, এর বকুলতলা, ঐ বেড়ায় ওঠা বনলতার ফুল, ঐ দূর দূরান্তের আকাশ ছোঁওয়া

মাঠ তৃষ্ণা জাগায় চোখে। তৃষ্ণা উদাস দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকাইয়া রহিল। কাঁধের উপর শিশুটী ঘুমাইতেছে।

একটা ঘোড়ার গাড়ী।

: এসো এসো, দেরী কোরো না। গিয়ে হয়তো আমাদেরই সব ঠিক্‌ঠাক্‌ ক'রে নিতে হবে।

: কোথায়? কতদূরে?

: তা, তুমি তো জানই না, আমিও না—অথচ ওটা আমারই বাড়ী: তিমির হাসিয়া উঠিল।

তৃষ্ণা হাসিল না, কথাও কহিল না, নিঃশব্দে শিশুটিকে লইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

ঘোড়ার পিঠে চাবুক পড়িল। কোচোয়ানকে আর কিছুই বলিয়া দিতে হইবে না। তিমির তাহাকে যে ঠিকানা বলিয়াছিল তাহাতেই সে চিনিয়াছে।

গাড়ী চলিয়াছে। একটা অনতিপরিসর রাস্তার উপর দিয়া। ধূসর পথ, দুপাশে কৃষ্ণচূড়ার সারি। সাম্‌নে চাহিলে শেষ নাই। দীর্ঘ—দীর্ঘতর। সে পথের ধূলিকণার পানে তৃষ্ণা একদৃষ্টে তাকাইয়া আছে।

বাজার পার হইল। কাজল জলের দীঘি। বাঁধা ঘাট। পাশ দিয়া একটা মেঠো রাস্তা। বনঝাউএর সারি। বিকালের পড়ন্ত বেলার তের্‌ছা আলো—সোনার আলো অদূর আমবাগানের শিরে।

দেখিতে দেখিতে তিমির উল্লসিত হইয়া কহিল: বাঃ সুন্দর তো।

তৃষ্ণা নির্নিমিষে বাহিরের দিকে তাকাইয়া আছে। সে যেন কেমন হইয়া গিয়াছে। তাহার মুখে এতটুকু রক্ত নাই।

: তুমি অমন মুখ গোম্‌রা ক'রে আছো কেন?

শুষ্ক কণ্ঠে তৃষ্ণা কহিল: এমন সুন্দর পথ দিয়ে তুমি আমায় কোথা নিয়ে যাচ্ছ!

তিমির উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল, কহিল : গাঁয়ে আস্‌তে বুঝি ভয় পাচ্ছো ? কেন তুমি তো একদিন ছিলে গাঁয়েরই মেয়ে।

শুধু একটা ঢোক গিলিয়া তৃষ্ণা থামিয়া গেল।

হঠাৎ একটা মোড় ফিরিতেই হাওয়ার তরঙ্গ তাহাদের ভাসাইয়া নিল। নদীর জোয়ারের মত উত্তাল হাওয়া। মাঠের কোনে আসিয়া পথে মোচড় দেওয়া একটা বাঁক। তিনতলা মন্দিরের পাশ দিয়া গাড়ী ঘুরিয়া গেল এবং খানিকটা পরে আরো একটা বাঁক ঘুরিয়া একটা বিরাট সিংহদরজা পার হইয়া গাড়ী একেবারে প্রাচীরের ভিতরে আসিয়া থামিয়া পড়িল।

তিমির লাফ দিয়া নাবিয়া পড়িয়া কহিল : তুমি এসো তৃষা, আমি দেখি কতদূর কী।

সে বিশাল দৈত্যপুরীর পানে চাহিয়া তৃষ্ণা পাষাণ হইয়া আছে। কতক্ষণ এই ভাবে কাটিয়াছিল তাহার খেয়ালই ছিল না। কোচোয়ান আসিয়া জানাইল আর সে দেরী করিতে পারিবে না, এবার তাহাকে গাড়ী লইয়া ফিরিতে হইবে।

তৃষ্ণা নামিয়া দাঁড়াইল। সামনে কেহ নাই। পায়ের নীচে সুরকির লাল-পথ, দুপাশে ফল ও ফুলের বাগান। সব কিছু পিছনে ফেলিয়া সে তাড়াতাড়ি বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া আসিল! সারা বাড়ীখানায় এতটুকু প্রাণস্পন্দন নাই। কেহ নাই বুঝি ভিতরে। নির্ব্বাক নিস্তব্ধ চারিদিক্। চঞ্চল পায়ে সে সমস্ত নীচুতলাটায় একবার অকারণ ঘুরিয়া আসিল। তারপর ক্ষিপ্রপদে সিঁড়ি দিয়া দোতলায় উঠিয়া গেল।

উঠিয়া আসিতেই ব্যাকুল বাহু বাড়াইয়া কী যেন তাহাকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া আসিল। চারপাশের দেয়াল, মাথার উপরকার ছাদ সহসা নামিয়া আসিয়া যেন তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছে। প্রতিটী ইট যেন সহস্র চক্ষু হইয়া তাহার পানে তাকাইয়া আছে। বাঁ পাশে সারি সারি ঘর। ওদিকে প্রকাণ্ড

সজ্জিত হল। কোথায় কে যেন তাহার নাম ধরিয়া অনবরত ডাকিতেছে। কে যেন এদিকে ওদিকে চলিয়া ফিরিতেছে।

তাড়াতাড়ি সে সামনের একটা ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। খাটের উপর শিশুটীকে শোয়াইয়া দিয়া দ্রুতপদে সে সমস্ত ঘরটা একবার ঘুরিয়া ফেলিল। তারপর বাহির হইয়া আসিয়া আবার একটা ঘরে এবং আরো একটা ঘরে। এমনি করিয়া সমস্ত ঘরগুলিতে ছাদে বারাণ্ডায় দালানে প্রতিটী অলিতে গলিতে ও আনাচে কোনাচে সে পাগলের মত অকারণ ছুটিয়া বেড়াইল। তারপর পুনরায় একটী ঘরে ঢুকিয়া দেয়ালে টাঙানো প্রকাণ্ড একটী ছবির নীচে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল, পাংশু মুখখানি কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া খাটের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া সে প্রাণপণে বালিসের ভিতর মুখ চাপিয়া ধরিল।

বহির্ব্বাটীর একটী ঘরে একগাদা কাগজ পত্রের সামনে তিমির একটী মাঝবয়সী লোকের দেখা পাইয়া গেল। তাহার নিকট হইতে খবর লইয়া সে জানিল, সেই বাটীর উপস্থিত রক্ষক, বাটীর মালিক দেশ হইতে তাহাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন তাঁহার নবলব্ধ সম্পত্তি ও শ্মশান জাগিবার জন্য। তাঁহার এক সন্তানের নামেই এ বাড়ী ও সম্পত্তি। সন্তান এখনও বিদেশে। তিনি যতদিন না এবাটীতে ফিরিয়া আসেন ততদিন তাহার ছুটি নাই।

তিমির কাগজ পত্র দেখাইয়া প্রমাণ করিয়াছে যে সে এ বাটীর মালিক। সুতরাং সে লোকটী এখন তাহাকে রাজার মত খাতির করিতেছে। তাহার এখন একমাত্র অনুরোধ নবাগত বাবু তাহার কাগজ পত্র বুঝিয়া লইলে সে এখন ছুটী পাইতে পারে।

তাহার কাছ হইতে বিদায় লইয়া আসিয়া তিমির দেখিল তৃষ্ণা বাহিরে নাই। নিশ্চয়ই সে ভিতরে চলিয়া গিয়াছে। আস্তে আস্তে সে বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া আসিল। এ বাড়ীর সহিত তাহার একটুও পরিচয় নাই। নীচটা

মনে হইল চাকর দারোয়ানের মহল, একটু উঁকি ঝুঁকি দিয়া পাশেই সিঁড়ি দেখিতে পাইয়া সে আস্তে আস্তে উপরে উঠিয়া আসিল। বাইরে তখন গোধূলি নামিয়াছে। ঘরে মৃদু মৃদু অন্ধকার জমিয়াছে। বাড়ীর অঙ্গসজ্জা দেখিতে দেখিতে ও ঐশ্বর্য্যের পরিমাণ অনুমান করিতে করিতে সে এদিকে ওদিকে তৃষ্ণার অন্বেষণ করিতে লাগিল। কত ঘর কত দালান পার হইয়া শেষে একটা ঘরে আসিয়া সে থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া পাড়িল।

ঃ তৃষা!

কী মুস্কিল! বালিশে মুখ গুজিয়া তৃষ্ণা ফোঁপাইতেছে যে!

তিমির আগাইয়া আসিল ঃ তৃষা!

কোন উত্তর নাই। রুদ্ধ অশ্রুবাষ্পে তাহার দেহ ক্ষণে ক্ষণে কাঁপিয়া উঠিতেছে।

তিমির নির্ব্বাক হইয়া কিছুক্ষণ সেই দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর ভাবিল একবার স্পর্শ করিয়া আদর করিয়া ডাকিবে। কিন্তু পরক্ষণেই কী ভাবিয়া আস্তে আস্তে সে ঘর হইতে বাহির আসিল।

সে নাবিয়া আসিল একেবারে নীচের বাগানে। গাছে গাছে ভরা বিস্তৃত বাগান। পাতায় পাতায় মর্ম্মর রব। অবাধ হাওয়া। সন্ধ্যারাতেই চাঁদ উঠিয়াছে আকাশে। প্রথম জোৎস্নাটুকু আসিয়া লাগিয়াছে আধফোটা কুঁড়িটীর মুখে। একটা গোলাকার পাষাণ বেদীর উপর বসিয়া এলোমেলো কত কী ভাবিয়া ভাবিয়া সে বহুক্ষণ কাটাইয়া দিল। সে বেশী বেশী ভাবিল নিজের কথা ও তৃষ্ণার কথা। এবং ভাবিয়া ভাবিয়া ঠিক করিল, সে নিজে যাহাই হোক তৃষ্ণা একেবারে আস্ত একটী মেয়ে। এবং মেয়ে মাত্রই ছিচ্‌কাঁদুনী।

সত্যই তো, অনর্থক এমন করিয়া কাঁদিবার কী আছে?

রাত্রি প্রায় ৯টার সময় সে আবার দোতলায় উঠিয়া আসিল। তৃষ্ণা যে ঘরে শুইয়াছিল সে ঘরে আলো জলিতেছে। আস্তে আস্তে সে ঘরের ভিতর ঢুকিয়া আসিয়া দেখিল একটা জানালার গরাদ ধরিয়া দাঁড়াইয়া তৃষ্ণা শূন্য দৃষ্টিতে

বাহিরের দিকে তাকাইয়া আছে। তাহার ভিতর একটু অস্থিরতা নাই, চঞ্চলতা নাই, তিমিরের আগমনের আভাস পাইয়াও সে একটীবারের জন্য ফিরিয়া তাকাইল না। বাহিরের জোৎস্না-ভরা রাতের পানে তাকাইয়া ছবির মত নিঃশব্দে সে দাঁড়াইয়া রহিল যেন কোন বিয়োগান্ত নাটকের তাপদগ্ধা নায়িকা।

তিমির ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিল, কহিল: সমস্ত নারীচরিত্র রহস্যময় তোমাকে দেখে একথা আমার মিথ্যে বলে মনে হ'য়েছিলো। কিন্তু আজ আমি তোমাকে বুঝতে পার্‌ছি না তৃষা!

তৃষ্ণা একটুও পরিবর্ত্তিত হইল না।

তিমির পুনরায় কহিল: অনেক ভেবেও তোমার এ নূতন রূপের অর্থ আমি খুঁজে পেলাম না। আজ এত বড় একটা আশ্রয় তোমাকে ধরিয়ে দিলাম—তুমি একা নও, তোমার কাঁধে আজ একটী শিশুর বোঝা—তাকে নিয়ে তোমার অনির্দ্দিষ্ট পথের মাঝখানে এ আশাতীত সুদৃঢ় আশ্রয় তোমাকে উল্লসিত না ক'রে অশ্রুকাতর করে তুললো! তুমি কী ভেবেছো আমি তোমাকে ভুলিয়ে একটা বাগান বাড়ীতে এনে ফেলেছি? যদি তাই মনে ভাবো তো এ কাগজ খানা দেখ্‌তে পারো। বলিয়া তিমির উইলটা বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিল।

তৃষ্ণা ফিরিয়া তাকাইল, আগুন-ঝরা দৃষ্টি, সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া কহিল: আমার সাম্‌নে থেকে স'রে যাও, তোমাকে দেখে আমার ঘেন্নায় মরে যেতে ইচ্ছে করছে: বলিয়া সে নিজেই তিমিরের সাম্‌নে হইতে সরিয়া গিয়া দাঁড়াইল।

তৃষ্ণার এ দৃষ্টি ও ভাষার সহিত তিমিরের পরিচয় নাই। তাহার সর্বাঙ্গে যেন চাবুকের আঘাত পড়িল। খানিকটা স্তম্ভিত হইয়া থাকিবার পর সে পুনরায় তৃষ্ণার সাম্‌নে গিয়া দাঁড়াইয়া কহিল: এ জিনিষ আমার কাছে নূতন নয় তৃষা, কিন্তু তুমি আজ আমার কাছে অত্যন্ত নূতন, অত্যন্ত অপরিচিত। তোমার এ হঠাৎ ঘৃণাটা কেন একটু জান্‌তে পারি কি?

তৃষ্ণা আর সামলাইতে পারিল না। বিদ্যুতের মত ঝল্‌সিয়া উঠিল, রাগে দিশাহারা হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল ঃ পারো, খুব পারো। খুব ভালো ক'রেই পারো। তুমি অভদ্র ইতর ছোটলোক ব'লে, তুমি নীচ জাতের ছোট জাতের ব'লে, তুমি অশুদ্ধ জারজ সন্তান ব'লে। তোমার সঙ্গে দুদিন মিশেছিলাম বলেই কী তুমি নিজেকে ভদ্রসন্তান মনে করেছো নাকী? তোমার মজ্জাগত নীচত্ব ও ইতরামি তুমি এড়াবে কেমন করে? তোমার রক্তে রক্তে যে অবৈধ জন্মের গ্লানি মিশে আছে তার প্রভাব কাটিয়ে তুমি ভদ্র হবে কেমন করে? তুমি কুশ্রী—বিশ্রী, নোংরা জন্ম তোমার, তুমি কূটবুদ্ধি জুয়াচোর প্রতারক শয়তান। তোমার মত ইতর অধমের ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে মেশার এত সখ কেনো? এত স্পর্দ্ধা তোমার হোলো কোথেকে? তুমি কী ভেবেছো তুমি আমাকে নিয়ে সংসার পাত্‌বে?

অকস্মাৎ বজ্রাঘাতে তিমিরের রক্ত মাংস যেন পাথর হইয়া গেল। মুখ দিয়া তাহার কথা ফুটিল না। শুধু আস্তে আস্তে কহিল ঃ তুমি কী সেই তৃষ্ণা!

তৃষ্ণার উদ্ধত চাবুক আবার নিক্ষিপ্ত হইল ঃ কী স্পর্দ্ধায় তুমি আমার নাম ধ'রে ডাকো? জিব কাঁপে না তোমার? কে তুমি? আমি কে? কার বাড়ীতে কাকে তুমি আশ্রয় দিচ্ছ? কে তোমাকে ও-কাগজে লিখে দিয়েছে? শয়তান! যে আমার বাবার পুণ্য জীবনকে প্রতারিত করেছে সে আমার কাছে পশু, যে আমাকে বঞ্চিত করেছে সে অমানুষ। এমন কাজ না কর্‌লে তুমি যে ছোটলোক তা প্রমাণিত হবে কেমন করে? এ কাজ তাদেরই যোগ্য অপবিত্রতা অশুচিতায় যাদের জন্ম, গ্লানি আর কলুষের মাঝে যাদের প্রাণের সঞ্চার। এমন কাজ না ক'র্‌লে তোমাদের নীচত্ব বজায় থাক্‌বে কেমন ক'রে? এমন কাজ থেকে যদি দূরে থাকো, তোমরা যে কুকুরের চেয়ে বড় হ'য়ে যাবে? ছিঃ, আগে যদি জানতাম তুমি আমাদেরই ম্যানেজারের ছেলে—ঃ বলিয়া সে একটী জ্বলিত উল্কার মত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

তিমির বহুক্ষণ হাত পা নাড়িতে পারিল না। পাথরের মূর্ত্তির মত নিশ্চল

হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর একসময়ে নীরবে নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

তাহার অজানা আর কিছুই নাই। ব্যাপারটা স্বচ্ছ হইয়া গিয়াছে।

গভীর রাত। ঝিল্লীরও নয়নে নিদ্রা নামিয়াছে। বাতাস নিঃস্তরঙ্গ। ক্লান্ত পৃথিবী মুদিত নয়নে এলাইয়া আছে। তৃষ্ণা শয্যায় শুইয়া এপাশ-ওপাশ করিতেছে। তাহার চোখে এতটুকু নিদ্রা নাই।

আজ আর খাওয়াই হয় নাই। খাইবার রুচিও ছিল না। কলিকাতা হইতে আসিবার সময় সঙ্গে যে দুধটুকু আনিয়াছিল তাহারই কিছু উদ্বৃত্ত অংশ খাইয়া শিশুটী পাশেই শুইয়া অকাতরে ঘুমাইতেছে। তাহার ছোট ছোট অসহায় নিঃশ্বাসগুলি গায়ে আসিয়া লাগিতেছে।

তৃষ্ণা পাশ ফিরিয়া স্তিমিত আলোয় তাহার মুখের দিকে তাকাইল। ছোট্ট এতটুকু মুখ, অজ্ঞান, নিষ্পাপ, নিষ্কলুষ, ক্ষণে ক্ষণে হাসিয়া উঠিতেছে। কিছু না-জানা হাসি। এর চেয়ে কিছু কী সুন্দর? এ যে জন্মিয়াছে—কার দোষ?

কার দোষ? এতদিন সে যে বঞ্চিত হইয়াছিল তাই বা কার অপরাধে? তিমিরের? ষড়যন্ত্র করিয়াছিল কে? তিমির? প্রতারণার কুটিল মন্ত্রণায় পণ্ড হইয়া উঠিয়াছিল কে? ঐ জারজ সন্তান? কার দোষে সে কাহাকে ঘৃণা করিল? ছিঃ, ছিঃ, সে দেখিল সে নিজেই আজ বাংলার চক্ষুহীন ক্লেদ-ক্লিন্ন সমাজের বাস্তব একটী প্রতিচ্ছবি হইয়া উঠিয়াছে। অকারণে সে আজ তাহাকে গালি দিয়াছে, তিরস্কৃত করিয়াছে। জীবনে মুখে যাহা আসে নাই আজ তাই বলিয়া তাহাকে জঘন্যতম অপমানিত করিয়াছে। কিন্তু এ অপমান প্রাপ্য ছিল কার? রাতের এই শান্ত সংযত চিন্তামগ্ন মুহূর্তে তাহার এ শুভ বুদ্ধিকে ফিরিয়া পাইয়া সে লজ্জায় ঘৃণায় মরিয়া যাইতে লাগিল। একটা নিস্ফল দুঃখে ও ক্ষোভে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতে লাগিল। বালিশে মুখ গুজিয়া সে ভাবিল, ক্ষমা, ক্ষমা – এখন শুধু ক্ষমা—ক্ষমা তাহার চাই। চাই-ই।

সে বুঝি চলিয়া গিয়াছে। তাহারই দেওয়া লজ্জা ঘৃণা অপমান তাহাকেই ফিরাইয়া দিয়া পবিত্রতম হইয়া সে বুঝি চলিয়া গিয়াছে।

কতক্ষণ পরে সে শয্যা হইতে উঠিল। উঠিয়া ক্ষীণজ্যোতি লণ্ঠনটা উস্কাইয়া দিয়া কিছুক্ষণ নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর সেটা হাতে লইয়া আস্তে আস্তে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। চাঁদ বুঝি সেই মাত্র ডুবিয়াছে। তারই অপস্রিয়মান জ্যোতিটুকু তখনো আকাশের গায়ে লাগিয়া আছে। একটু পরেই অন্ধকারে দিগ্বিদিক্ ছাইয়া যাইবে। আলো হাতে সে চারিদিকে কী যেন খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল, এবং না-পাইয়া অবশেষে নীচে নামিয়া আসিল।

সাম্‌নের ঘরে ঢুকিয়াই সে দাঁড়াইয়া পড়িল। কঠিন অনাবৃত মেঝের উপর তিমির লম্বা হইয়া শুইয়া আছে। উপুড় হইয়া বাম বাহুর উপর মাথা রাখিয়া মুখখানা কাত করিয়া একটা পরিশ্রান্ত পশুর মত সে অকাতরে ঘুমাইতেছে। তৃষ্ণা অনেকক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু তিমির জাগিল না।

আস্তে আস্তে তাহার নিকটে—অতি নিকটে তৃষ্ণা হাঁটু মুড়িয়া বসিল। ঘুমে নিস্পন্দ মুখখানা—ব্যথাতুর—কী করুণ! কী অসহায়! জীবনের যত দুর্দিনের লাঞ্ছনার ছাপ আর বিশ্বমানবের পদাঘাতের চিহ্ন যেন ও-মুখখানায় লাগিয়া আছে। সন্তর্পনে ডান হাতখানি দিয়া তৃষ্ণা তাহার ললাট [illegible] করিল। করিয়াই চমকিয়া উঠিল। এ কী! উত্তাপে যে তাহার গা পুড়িয়া যাইতেছে!

তিমির চোখ মেলিয়া তাকাইল, তারপর ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। চোখ লাল, মুখ শুক্‌নো, মাথার চুল উস্কোখুস্কো। এখনি যেন সে মড়া পুড়াইয়া আসিয়াছে।

গভীর মমতায় তৃষ্ণার স্বর ভিজিয়া উঠিল, সে তাহার হাত ধরিয়া কহিল: চলো, ওপোরে চলো।

সাম্নে আসিয়া পথ আগ্লাইয়া কহিল : তোমার অভিমানকে আমার স্বীকার না ক'রে উপায় নেই, কিন্তু দুটো কথা বল্বার জন্যে তোমার কাছে এসেছিলাম, তোমাকে আমি যেতে দেবো না।

তিমির হাসিল, কহিল : বন্দী করবার মত তোমার বাঁধনের অভাব নেই তৃষা, তুমি বিজয়িনী সম্রাজ্ঞী। কিন্তু এমন ক'রে তুমি আমার মোহকে খুঁচিয়ে তুলে অপমানিত হ'য়ো না। আমার মনে এতটুকু ক্ষোভ নেই, এতটুকু অভিমান নেই। অভিমানের পাত্রই বা আমার কোথায়? আমার চিরকালের আশ্রয় আমার জন্যে অশ্রুপাত কর্ছে। মাধবীকুঞ্জে ব'সে ফুলের পাপ্ড়ি ছিঁড়ে ছিঁড়ে সময় কাটাবার জন্যে তো আমার জীবন নয়। ভুল ক'রে ফুলবনে ঢুকেছিলাম আমি, আমার বেরোবার আগেই নির্দ্দয় হ'য়ে যেন দরজাটা বন্ধ ক'রে দিও না : বলিয়া সে বাহির হইবার জন্য দরজার একেবারে সাম্নে আগাইয়া আসিল।

তৃষ্ণা তখন নিরুপায় হইয়া চোখ রাঙাইল, শক্ত হইয়া দরজা আগলাইয়া কহিল : আর অগ্রসর হ'য়ো না। আজ যদি তুমি আমায় বিন্দুমাত্র স্পর্শ করো আমি সহ্য ক'র্বো না। সমগ্র পল্লী চীৎকারে আমি মথিত ক'রে তুল্বো, আমি জানাবো আমার বাড়ী চড়াও হ'য়ে তুমি আমার উপর অত্যাচার ক'র্তে এসেছো।

সেই মৃত নিশীথিনীর স্তব্ধ বক্ষে দাঁড়াইয়া তিমির হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল, কহিল : চেঁচাবে? এত রাতে? পাগল! সম্মিলিত জনতার কাছে তাতে প্রমাণিত হবে এই, তুমি অভিসারিকা—নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আমার বাড়ীতে এসে ঢুকেছো মিলনাকাঙ্ক্ষায়। মুখ কালো হবে তোমারই। তো[illegible] চেয়ে আমার কণ্ঠে তীব্রতা আছে বেশী, যদি বলো তো আমিই তোমার হ[illegible] চেঁচিয়ে দিতে পারি : একটু থামিয়া ধীর কণ্ঠে বলিল : শোনো তৃষা, তুমি মহীয়স[illegible] মহিলা, তুমি এ দেশের গৌরবের। তোমার দৃপ্ত ও উদার অন্তর আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। শ্রদ্ধাবনত মস্তকেই তোমার সাম্নে দিয়ে আমায় চ'লে

যেতে দাও। আমায় এমন কিছু করতে দাও যাতে তুমি আমার রক্ষিতা ব'লে প্রমাণিত হ'তে না পারো। তৃষা, আমি ইতর, আমি অপবিত্র। আমি সভ্যতা জানি না, সমাজ জানি না, শ্লীলতা জানি না, মহিলার সম্মান রাখ্‌তে জানি না ; নীচতা, দীনতা, অসাধুতা, বর্ব্বরতা, পশুত্ব, আর আর যা-কিছু মানুষের গভীরতম কলঙ্ক তাই আমার চরিত্রের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তা দিয়ে তোমার নির্ম্মল আত্মাকে অপমান ক'রে যাবো এতে আর বিচিত্র কী! তোমায় যাতে আর স্পর্শ না করতে হয়, তাই করো তৃষা, তুমি স'রে দাঁড়াওঃ তৃষ্ণা ছবির মত দাঁড়াইয়া রহিল, সরিল না। তিমির তখন কহিল ঃ তবে আজ গভীর শ্রদ্ধায় সসম্মানে তোমার অসম্মান ক'রতে বাধ্য হলাম। আর কোনো অসম্মানের ছোঁয়া যাতে তোমায় স্পর্শ না করে তারি জন্যে তোমার বাধা সত্ত্বেও তোমায় শেষ স্পর্শ করে গেলাম। আর বিদায় বেলা শ্রদ্ধাবনত শিরে তোমার হৃদয়ের কাছে রেখে গেলাম একটী নমস্কার। আমার নীচতার ঔদ্ধত্যকে দয়া ক'রে তুমি ক্ষমা কোরো ঃ বলিয়া তিমির ডান হাত দিয়া তৃষ্ণার হাতখানিকে দৃঢ়মুষ্ঠিতে ধরিয়া আস্তে আস্তে সরাইয়া দিল।

ম্লান বিবর্ণ মুখে তৃষ্ণা ধীরে ধীরে সরিয়া দাঁড়াইল।

বাহিরে তখন চাঁদ ডুবিয়া গিয়াছে।

তিমির উঠিল না, তৃষ্ণার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল।

তৃষ্ণা কহিল : তুমি যদি আজ আমার মুখের দিকে অবাক্ হ'য়ে চেয়ে থাকো, আমি আশ্চর্য্য হবো না। তুমি যদি আজ আমাকে একটা অতি সাধারণ নগণ্য অমানুষের সঙ্গে তুলনা ক'রে আমার মনের উপর একটা জোরালো মন্তব্য বসিয়ে দাও আমি চুপ ক'রে থাক্‌বো। আমি কী, সে কথা বার বার ক'রে আমায় শোনাবার তোমার যথেষ্ট অধিকার আছে। চলো, তুমি ওপোরে চলো?

: হ্যাঁ যাবো, এইবার যাবো, কিন্তু তুমি এত রাত্রে অকারণ! ছিঃ: তিমির তাহার হাতখানা তৃষ্ণার স্পর্শ হইতে সরাইয়া লইতে চাহিল।

তৃষ্ণা তাহা ছাড়িল না, কহিল : হ্যাঁ, এত রাতে, কিন্তু ঠিক অকারণ কী? নিশ্চয়ই নয়। আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে, জীবনে ভুল কর্‌লে আমার চল্‌বে না। ভুল যদিও করি সেই ভুলের ভিতর থেকে ফুলটী আবিষ্কার ক'রে নিয়ে আমায় এগিয়ে যেতে হবে। বিস্মৃত ভ্রান্ত নিজেকে চিন্‌তে পেরে আমি আজ সুখী হ'য়েছি। কিন্তু চলো, এখানে আর ব'সে থেকো না।

হাতটা আস্তে আস্তে ছাড়াইয়া লইয়া তিমির উঠিয়া দাঁড়াইল; কহিল: হ্যাঁ, যাবো, ঠিক এইবারই আমার যাবার সময় হ'য়েছে। তোমার সে বিশৃঙ্খল অসংযত অন্ধকার ছবিটীকে চোখের তারায় নিয়ে যেতে আমার আদৌ ইচ্ছা ছিলো না, আমি চেয়েছিলাম না তোমার তিক্ত বেপথু মনের মধ্য দিয়ে [illegible]ার বিদায়-পথ রচিত হোক। তোমাকে শান্তা সমাহিতা সুন্দরীটী দেখে যাবো, আমার পথটুকু সুন্দর ক'রে নিয়ে যাবো, দেখে যাবো তোমার ঐশ্বর্য্যবান মনের কোলে তুমি আবার ফিরে এসেছো, এই ছিলো আমার আশা। সে সুসময় এসেছে এবার। বহু তপস্যার, বহু আশার এ মুহূর্ত্তটির জন্যই অপেক্ষা ক'রে ক'রে আমি ঘুমিয়ে প'ড়েছিলাম। ধন্যবাদ, তুমি পরম মুহূর্ত্তেই আমায় জাগিয়ে দিয়েছ: বলিয়া তিমির ঘরের যে-পথ পথের দিকে গিয়াছে সেই দিকে পা বাড়াইল।

ঃ ও কী। ওদিকে যাচ্ছো কোথায় !

তিমির দাঁড়াইয়া পড়িল, একটা বিচিত্র মলিন হাসি মুখে আনিয়া কহিল ঃ বিদায়ের দিনে আমার লালনকর্ত্তৃ ঠিক এই কথাটাই আমায় জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন। কিন্তু তুমি তো জানো আমার পথের সঙ্গীত, কত দূর থেকে যে আমার ডাক এসেছে, তাগিদ এসেছে বাঁধন ছেঁড়ার, চুপ করে থাকবো কেমন ক'রে? তাকে কী অপমান ক'রে ফিরিয়ে দিতে পারি? জানি, আমার কাজ যাওয়া, চলে যাওয়া। সাম্‌নে বিছানো পথ—দীর্ঘ দীর্ঘতর হয়ে চোখের সাম্‌নে মিলিয়ে গেছে, তারপরে কত দূর দিয়ে কোথায় কেমন ক'রে বেঁকে গেছে আর তোমায় কেমন ক'রে বলবো? তোমায় ধন্যবাদ, তুমি সুন্দর হ'য়ে আমার সাম্‌নের অন্ধকার রাতটুকুকে সুন্দর ক'রে দিয়েছো, আমায় চলার প্রেরণা দিয়েছো। তুমি ঠিক সাধারণ নও, আমি জান্‌তাম, তোমার পিতা তোমার বুদ্ধিকে বেশীক্ষণ আচ্ছন্ন ক'রে রাখ্‌তে পারবেন না ঃ বলিয়া তিমির আবার পা বাড়াইল

ঃ সত্যিই কি তুমি চলে যাবে?

তিমির ফিরিল। কহিল ঃ তাতে বিস্মিত হবার কিছু আছে কী? তুমি কী ভাব্‌তে পারো না সে কথা? তুমি কী ভেবেছিলে আমি এখানে এসে স্থির হ'য়ে যাবো? এ স্বর্গপুরীর সিংহাসনে ব'সে আমি যদি দেবতা হ'য়ে যাই তুমি কী আশ্চর্য্য হবে না? তুমি কী বিস্মিত হও নি আমি এখনো দাঁড়িয়ে তোমার সঙ্গে কথা কইছি?

তৃষ্ণা একটা কথারও জবাব দিতে পারিল না, কহিল ঃ কিন্তু তোমার যে জ্বর!

ঃ দুঃখের নদী পার হ'য়ে আসা এ জীবন ক্লান্তি জানে না। এটা সামান্য একটা ঢেউ মাত্র। নৌকা আমার ভেসেই যাবে ঃ বলিয়া তিমির দরজার দিকে আগাইয়া গেল।

তৃষ্ণা কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর তাড়াতাড়ি দরজার

নয়

ভোর রাতে সে গাড়ীতে উঠিয়াছিল জানে। কিন্তু কখন হাওড়ায় পৌঁছিয়াছিল এবং কে তাহাকে হাঁসপাতালে লইয়া গিয়াছিল, তাহা সে জানে না। জ্বরে তাহার চেতনা লুপ্ত হইয়াছিল।

আর কিছু নয়, শুধু প্রবল জ্বর। দশদিন পরে সে হাঁসপাতাল হইতে বাহির হইল।

দাতব্য চিকিৎসালয়। কিন্তু পয়সারই খেলা। ঢোকানো হয় সকলকেই, কিন্তু গোপনে গোপনে বাছাই চলে ফতুর ও কাপ্তেন। তাই খাতিরও চাঁদীর ওজন মাফিক। সুতরাং তিমির আরোগ্যলাভ করিল সেবায় ও ভেষজে নয়—স্বভাব হইতে।

কিন্তু জ্বর ভাল হইয়া তাহার আরাম নষ্ট হইয়া গেল। কলিকাতার এমন একটা ইটের বাড়ী ও লোহার খাট হইতে তাহাকে নামাইয়া দিল।

গেটের বাহিরে আসিয়া রাজপথে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ সে ঢেউ গুনিল। বিকাল গড়াইয়া বেলা অনেকখানি নামিয়া গিয়াছে। অকারণে কতক্ষণ আর এমন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকা যায়। আস্তে আস্তে একদিকে সে পা চালাইল।

মানুষের স্রোতে মিশিয়া অনেকক্ষণ সে এদিক ওদিক ভাসিয়া বেড়াইল। কত জায়গায় দাঁড়াইল, কত জায়গায় বসিল। শেষে একজায়গায় আসিয়া দেখিল রাস্তার দুপাশে অসম্ভব ভিড় জমিয়াছে। কোন রাজকর্ম্মচারী কিংবা কোন দেশ নেতার আসিবার কথা আছে নিশ্চয়ই। সহসা জনতা মহা উল্লাসে হৈ হৈ রবে মাতিয়া উঠিল। উৎসুক নয়নে তিমির রাস্তার উপর উঁকি দিয়া দেখিল আর কিছু নয় ষাঁড়ের লড়াই চলিতেছে। তারপর সে এখানে ওখানে দেখিল বাঁদরনাচ, টুক্‌রো ম্যাজিক, বাবা শম্ভুনাথের বাহনের বাজার লুট—শুনিল, ক্যানভাসারের বক্তৃতা, পসারীর ক্রেতা জপানো, প্রেমিক-প্রেমিকার পথ চলার

আওয়াজ, দুঃখহীনের হাসির ঝল্‌কানি। অবশেষে একটা পার্কের মধ্যে ঢুকিয়া এক বড়লোক শিশুর প্যারামবুলেটার লইয়া ঠেলিতে লাগিল।

আনন্দ পাইবার জন্য সে এত করিল, কিন্তু আজ এতটুকু আনন্দ সে পাইল না। তার অনাড়ম্বর অর্থহীন জীবনটার মধ্যে সে আবার ডুবিয়া যাইতে চাহিল—কিন্তু তাহাও যেন তাহার কাছ হইতে আজ দূরে সরিয়া গেছে। সে ভাবিয়াছিল তৃষ্ণার কাছ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহার চিরদিনকার জীবনে সে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহার নির্জন নির্লিপ্ত অপমানিত দিনগুলিতে আবার আসন করিয়া লইবে, কিন্তু তাহাও যেন অজ্ঞাতে অলক্ষ্যে আজ কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে। কে যেন সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার নির্লজ্জ ছন্নছাড়া জীবনের আবিল স্রোতটুকুকেও রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। তাহার নিরর্থক সারশূন্য বিবর্ণ জীবনের মাঝেও যে অদ্ভুত একটু রঙ্‌ ছিল তাহাকে নিঃশেষে সমাপ্ত করিয়া দিয়াছে।

এই পুনঃনিক্ষিপ্ত জীবন এবং থেঁতলানো মনটাকে লইয়া আবার সে কী করিবে! মাখনের সাহায্যে সে কী পুনর্জিবিত হইয়া উঠিতে পারিবে? অভিন্ন-হৃদয়, দুর্দ্দিনের বন্ধু মাখন, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়দাতা আশ্রয়হীন মাখন। স্থির করিল, তাহার অতীতকে ফিরিয়া পাইবার জন্য আজ সারা রাত্রি ধরিয়া মাখনের সহিত সে অকারণে গল্প করিবে।

আহিরীটোলার বাসায় আসিয়া তিমির কপাট ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিল। দেখিল মাখন ঘরে নাই। বোধ হয় বাহিরে গিয়াছে। পায়ের নীচে এক টুক্‌রো কাগজ দেখিতে পাইয়া সে সেটা কুড়াইয়া লইল। চিঠি।

লেখা আছে—

'তিমির! আজ আমার অজ্ঞাতবাস শেষ হোলো। আমি প্রকাশিত, তাই চল্‌লাম্‌।'

'তোমার জন্যে অনেক অপেক্ষা করলাম, দেখা ক'রে যাবো বলে। কিন্তু তুমি ফিরলে না। যাবার বেলা তোমার দেখাটা পেয়ে গেলে পরিপূর্ণ

সুখেই এ গৃহ ত্যাগ কর্‌তে পারতাম। মনটা আমার কী রকম যে করছিলো তোমার জন্যে, যাবার সময়।'

'তুমি শুনেছো কোনো কারণে অভিমান ক'রে আমি বাড়ী ছেড়ে চলে এসেছিলাম। বাবা বহু সন্ধান ক'রে আমায় এখানে এসে ধরেছেন। যদি তাঁর কষ্ট বিফল করি, আমি তাঁর কেমন ছেলে? মা অনবরত কাঁদছেন। তাছাড়া সুন্দরী প্রেয়সী ঘরে অশ্রুপাত ক'রে ক'রে শেষে কী চোখ দুটী অন্ধ করে ফেল্‌বে? আমি তাকে ভালোবাসি।'

'তোমারো জীবনে নবযুগ এসেছে জানি। তুমি আলোর তীরে পদার্পন কর্‌ছো। শেষকালটা তুমি আমার কাছে ডুমুর ফুল হ'য়েছিলে? যাক্‌, তিনিই তোমার জীবনে জ্যোতি আন্‌বেন, তোমার শুক্‌নো ডালে ডালে ফোটা-বেন কিশলয়, পৃথিবীতে তুমি হবে সত্য। তোমাদের দেখলে মনে হয় তোমরা যেন বহুজীবন একসাথে পথ চল্‌ছো। তোমরা দুইজন দুইজনের কাছে অর্থপূর্ণ। একের অভাবে অন্যজন অকারণ। সে অদৃশ্যা শ্রদ্ধেয়াকে আমার প্রণাম জানিয়ো। তোমরা দু'জনেই আমার মত অসচ্চরিত্রকে ভুলে যেও।'

'কতদিন পরে ফির্‌ছি দেশে—আমার মোহ-বিজড়িত ঘরে। আমার মা বাবা আর প্রিয়ার কাছে। কত নদীর জলে ঢেউয়ে ঢেউয়ে নৌকা বেয়ে। তারপর আঁকাবাঁকা গাঁয়ের পথে—দীর্ঘ মাটীর গরুর গ্যাড়ীর পথে। আনন্দে আমার চোখে ঘুম আস্‌চে না। সে-আনন্দের একটুক্‌রো কাগজে তোমার কাছে লিখে রেখে গেলাম।' ইতি

'মাথ্‌না।'

শূন্য-দৃষ্টিতে তিমির দাঁড়াইয়া রহিল—শোকার্ত্ত মানুষ শেষ সান্ত্বনাটুকু হারাইলে যেমন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। সে যেন লুপ্ত-প্রাণ স্পন্দনহীন পৃথিবীতে দাঁড়াইয়া-থাকা একাকী মানুষ।

বীণা আজ বেসুরো নয়—তারহীন। সম্মুখে প্রসারিত ধূসর মরুভূমি—এতটুকু আগাছাও নাই।

তারিখ মিলাইয়া তিমির দেখিল, মাখন আজই গিয়াছে। সে তাহার প্রতীক্ষা করিয়াছিল! সকালে আসিতে পারিলে অন্ততঃ তাহার সহিত দেখাটা হইয়া যাইত।

এই ঘরে বহুদিন তাহারা একত্র কাটাইয়াছে। কত ঝগড়া কত রাগারাগি, আবার কত সহানুভূতি কত সমবেদনা। ভস্মমাখা নোংরা দুটী জীবনের আলিঙ্গন এখনো ঘরে যেন পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। আবার একদিন তৃষা আসিয়া সে কী উৎপাত! সে শুইয়াছিল ঠিক এইখানটীতে যেখানটীতে এখন সে দাঁড়াইয়া আছে।

যাক্ যাহারা যাবার তাহারা থাকে না।

সমস্ত ঘরটীতে একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া সে আস্তে আস্তে বাহির হইয়া আসিল। আর ফিরিয়া তাকাইল না।

মাখন! পথের মাঝখান হইতে মাখন তাহাকে হাত ধরিয়া ডাকিয়া লইয়াছিল। কী প্রয়োজন ছিল তাহাকে তাহার! পতিত-চরিত্র কটুভাষী লোকটা— বিপথচারী, লালসা-জর্জর নারীদেহ-গৃধ্নু। কিন্তু মানুষ সম্মুখে পড়িলে সে শ্রদ্ধা করিতে জানে। যাহাকে দেখিয়া সে কামনায় কুটিল হইয়া উঠিয়াছিল তাহারই পায়ে শেষে সে প্রণাম করিয়াছে—নাঃ, পথচ্যুত হওয়াটা তাহার ক্ষণিকের গ্রহমাত্র। এবার মাতা পিতার স্নেহচক্ষুর নীচে ও পরাণ-বঁধুয়ার প্রেম-কবচের স্পর্শে তাহার সে গ্রহ কাটিয়া যাইবে। সমস্তরের না হইলে বন্ধুত্ব হয় না। তাই মাখন চলিয়া গেল। তৃষ্ণাও জীবনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু সে আজও চলিয়াছে। তার চলার বিরাম নাই। পথ চলিতে চলিতে সে মানস চক্ষে দেখিতে পাইল, মাখন চলিয়াছে, বাবার সঙ্গে। বাড়ীতে খবর পৌছিয়া গিয়াছে। মা দুয়ারে দাঁড়াইয়া আছেন। প্রিয়া সজ্জিত হইতেছে। কত দূরের কত নদীর ঢেউ কাটাইয়া কল্‌মিলতার ভিড় সরাইয়া দুলকি চালে মাখনের নৌকা চলিয়াছে। গোধূলি নামিয়াছে। সোনায় সোনায় গাছের

পাতা ভরিয়া গিয়াছে। এদিকে সেই প্রকাণ্ড আয়নাটার সাম্‌নে দাঁড়াইয়া হাতীর দাতের চিরুণী দিয়া তৃষা এতক্ষণ চুল আঁচড়াইতেছে।

হঠাৎ সামনে একটি শোভাযাত্রা। আনন্দমুখর। সাম্‌নে বিচিত্র পোষাক পরা বহু রকমের বাদকদল। ধীরে ধীরে আসিতেছে একটা ফুলের ময়ূর। গাড়ীটাকে ফুলদিয়া ময়ূরের মত সাজানো হইয়াছে। তারপর পিছনে পিছনে আরো কত গাড়ী—গাড়ীর পর গাড়ী। ধীরে ধীরে আসিয়া মিছিল কাছেই একটা সজ্জিত বাটীর সাম্‌নে থামিয়া গেল। ভিতর হইতে শাঁখের উপর শাঁখের শব্দ ভাসিয়া উঠিল। হৈ হৈ রৈ রৈ আওয়াজ। ব্যস্ততা হুড়োহুড়ি উলুধ্বনি। ভিতর হইতে লোকজন ছুটিয়া আসিল অভ্যর্থনার জন্য।

ময়ূরের ভিতর হইতে ধীরে ধীরে বাহির হইল একটী অমর দেব ও একটী অমর দেবী। রাস্তা আলো করিয়া দাঁড়াইল অলঙ্কৃত ও অলঙ্কৃতা। বর ক'নে দেখিবার জন্য পথের জনতা মুহূর্ত্তের জন্য থামিয়া পড়িল। আজ এদুটী নর-নারীকে দেখিবার জন্য মানুষের কী অসীম কৌতুহল, দেখিয়া দেখিয়া যাহাদের চোখ পচিয়াছে, তাহাদেরও। জন্ম মৃত্যু বিবাহ যদি মানুষের তিনটী জন্ম হয়, সকল জন্ম হইতে এই জন্মটাই যুগে যুগে মানুষের দৃষ্টিকে বেশী আকর্ষণ করিয়াছে। তিমিরও দেখিবার জন্য জনতার ভিড়ে একবার মাথা গলাইল। কিন্তু আর তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিতে পারিল না। কন্যার সলাজ-সুন্দর অবনত মুখের উপর তাহার নিষ্পলক দৃষ্টি স্থির হইয়া গেছে।

জ্ঞান হইল তখন, যখন এক ঝলক সুগন্ধি জলের ঝাপটা তাহার গায়ে আসিয়া পড়িল। ছিঃ, আত্মবিস্মৃত হইয়া হাঁ করিয়া এতক্ষণ সে কী দেখিতেছিল। ভাগ্যিস কেহ তাহার মুখের পানে তাকায় নাই। ভিড় ঠেলিয়া তাড়াতাড়ি সে একেবারে বাহিরে আসিয়া পড়িল।

তবে মিনু আরও সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী হইয়াছে। যৌবন তাহার কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে। মাথার ঐ লাল রেখাটুকুর গৌরবে তাহার সারা অঙ্গ ও কী অসীম শ্রীতে ভরিয়া গিয়াছে। হোক্ মিনু সুখী হোক। হেঁট্‌মুখে

জোর পায়ে সে চলিতে লাগিল। মনের পর্দায় ছবি ফুটিয়া উঠিল কত বাঁক পার হইয়া কল্মিলতার ভিড় সরাইয়া ঢেউয়ে ঢেউয়ে ছুলকি চালে মাথনের নৌকা চলিয়াছে এদিকে প্রকাণ্ড আয়নাটার সাম্নে দাঁড়াইয়া রজনীগন্ধার গুচ্ছ দিয়া তৃষ্ণা এলো খোঁপা বাঁধিতেছে।

থানিকটা বাঁহাতি গিয়াই একটা চামড়ার দোকান। জুতা তৈয়ার হয়। ছোট্ট নোংরা একটা কাপড় পরিয়া একটী কারিগর একগাদা চামড়ার ভিতর বসিয়া প্রাণপণে শুকতালা পিটিতেছে।

ঃ কী ভাই ভালো আছো? তিমির একেবারে দোকানের ভিতর উঠিয়া আসে।

কারিগর মুখ তুলিয়া বলে ঃ অনেকদিন পরে যে দাদাঠাকুর, থবর কী?

সাম্নের একটা চৌকীর উপর বসিয়া পড়িয়া তিমির বলে ঃ দাদাঠাকুর কী? বলো ভাই। একদিন তোমাকে ব'লে দিয়েছি না?

কারিগর হাসে, বলে, ঃ বলেতো দিয়েছো, কিন্তু জিব থেকে বেরোয় কই, তোমাকে দেখলে মনে হয় না যে তুমি আমাদের জাত।

ঃ মনে নাই হোক, বললেও বিশ্বাস কর্‌বে না? ঃ তারপর চৌকিটা আরো কাছে টেনে নিয়ে এসে বলে ঃ আচ্ছা ভাই তুমি আমাকে কাজ শেখাবে?

কারিগর শুধু হেসে বলে ঃ কেন শেখাবোনা, শিখলেই শেখাবো।

ঃ শিখতে কতদিন লাগবে? কাজ শিখে একটা ছোট্ট দোকান ক'রে পয়সা জমিয়ে-জমিয়ে একটা বড় দোকান ফেঁদে বসা যায় না?

ঃ কেন যাবে না, হিম্মৎ থাকলে সবই হয়।

ঃ আমি থাকবো তোমার কাছে। আমাকে দু'টো করে খেতে দিও, আমি প্রাণপণে তোমার সাহায্য করবো।

কারিগর হাসিতে যায়, কিন্তু তিমিরের মুখের দিকে তাকাইয়া সে আর হাসিতে পারে না।

তিমির সেইখানেই রহিয়া গেল। কারিগরের নির্দেশ-মত চামড়া কাটে

আর শুকতলা পিটে। চটীজুতায় কাঁটা লাগায়। তার বুদ্ধি আর উদ্যম দেখিয়া কারিগর প্রীত হয়। পিছনের দিকে খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করিয়া একটা দড়ির খাটিয়া পাতিয়া সে এই নোংরা ভদ্রটীর শুইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে। তাহার জন্য সে আবার আলাদা করিয়া রান্না করিতে যায়। একটু তফাৎ করিয়া না দেখিয়া সে কিছুতেই থাকিতে পারে না।

তিমির একমনে কাজ শিখিতেছে। ক্লান্ত না হইলে সে থামিতে চায় না এমন জাত-ব্যবসা থাকিতে কিছু না করাটা মহাপাপ। কোথায় সে এতদিন কী করিতেছিল। প্রাণপণে সে হাতুড়ি পিটে আর নিবিড় করিয়া নিজেকে সান্ত্বনা দেয়। তারি মাঝে তার মনে চমক দিয়া উঠে মাখন 'মা' 'মা' করিয়া ডাকিতেছে, বাবাকে খুঁজিয়া ফিরিতেছে এতটুকু একটি শিশুর মত। কার দুখানি আল্‌তা পরা পা আর কাকন-ভরা হাত তাহারি পাশে-পাশে থাকিয়া কর্ম্ম-মুখর হইয়া উঠিতেছে। দুপুরে স্তব্ধবিজন ঘর ভরিয়া উঠিতেছে কুজনে—কপোত-কপোতীর মত কত অর্থহীন প্রলাপে। তুলসী তলায় সন্ধ্যাদীপখানি রাখিয়া প্রণাম করিতেছে বধু, মাখন এমন জায়গায় আসিয়া গোপনে দাঁড়াইয়া আছে যে, বধু উঠিয়া দাঁড়াইলেই দুজনের চোখাচোখি হইয়া যাইবে। অবগুণ্ঠিত অর্দ্ধরাতে পাশাপাশি ঘুমাইয়া আছে তাহারা—একজনের হাত জড়াইয়া আছে আর একজনের হাতে, বক্ষে লুটাইয়া আছে মুখ, তাহাদের ঘুমন্ত মুখের সে হাসিটুকু আর সে কল্পনা করিতে পারে না।

মনের চোখে আরো দেখিতে পায়—শিশুটীকে লইয়া আর হারানো বিত্ত ফিরিয়া পাইয়া তৃষ্ণা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। ভৃত্য পরিবৃত হইয়া অশেষ কর্ম্মে ডুবিয়া গিয়াছে। আভিজাত্যে ও মর্য্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়া সে আর এক মানুষ হইয়া উঠিয়াছে। অবসর সময়ে নির্জনে আয়নাখানির সাম্‌নে দাঁড়াইয়া হয়ত সে আপন রূপের মাধুরীতে আপনি মুগ্ধ হইয়া যায়। সিঁদুর-ঝরা গোধূলিতে অথবা চাঁদ-ঝরা সন্ধ্যায় বাগিচার কুঞ্জে কুঞ্জে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফুলের রেণু ঝরাইয়া ঝরাইয়া মনের খুসীতে হয়ত কতদিন আন্‌মনে হাসিয়া উঠিয়াছে।

এতদিনে সে হয়ত তার কল্পনার মানুষটীকে মনের কাছে খুঁজিয়া পাইয়াছে। জীবনের জয়যাত্রায় মাতিয়া উঠিয়াছে সে।

সে মহিয়সী মহিলা কেন যে তাহার মহার্ঘ সঙ্গদানে দুদিনের জন্য তাহার দৈনন্দিন জীবনকে বিশৃঙ্খল করিয়া দিয়াছিল! কে জানে কী যে খেয়াল!

বাহুর পেশী শক্ত করিয়া তিমির আরো জোরে হাতুড়ি পিটিয়া চলে।

ঃ ওকী এত জোরে পিট্‌ছো কেনো? ঃ কারিগর জিজ্ঞাসা করে।

তিমির বলে ঃ তোমার হাতের রান্না খেয়ে আমি গায়ে বল পেয়েছি!

বিশ্রী দুর্গন্ধ-ভরা ঘরে দড়ির খাটিয়ার উপর চিৎ হইয়া শুইয়া তিমির গভীর রাতে ঘুমের তপস্যা করে। অতীতের মাঝে মন ডুবিয়া যায়। ছবির মত সব কিছু ভাসিয়া উঠে বোজানো চোখের কাছে। কত আশা, কত আকাঙ্খা, কত উৎসাহ, কত উদ্দীপনা; কত কল্পনা, কত কর্ম্মপন্থা, কত আদর্শ, কত প্ল্যান; সে কী ঐশ্বর্য্য, কী বংশমর্য্যাদা, কী আভিজাত্য ও কী গৌরব, কী দেশপ্রেম, কী গভীর অন্তরে জাতির মুক্তি কামনা! দিকে দিকে অজস্র মুঠা ভরিয়া দান! তারপর সেই পবিত্র বাবু আর সাবিত্রী দেবী—অতিমানব দুটী—যাঁহাদিগকে সে বাবা আর মা বলিয়া জানিত—তাঁহাদের অন্তর্জ্যোতি আর গভীর স্নেহ! চোখের সাম্‌নে আসিয়া দ্রুতপদে মিলাইয়া গেল নোতুন মা, অভয়ের মত বন্ধুরা, আরো কত আত্মীয়স্বজন আর স্বপ্ন সঙ্গিনী মিনু। অন্ধকারে একবার তাকাইয়া তিমির আবার চোখ বুজিল। আজ আর সে কিছু চাহে না, শুধু একটু স্নেহ। ধন নয় ঐশ্বর্য্য নয়, শুধু সত্যিকারের স্নেহবস্তু—বাবা আর মা, আর ভীরু অশিক্ষিতা জংলী একটী বালিকা বধূ—যে তাহার মনের কাছটীতে থাকিবে, দূরদূরান্তের বনের মাঝে কুঁড়ে ঘরে তুলসীতলায় প্রদীপ দিবে। সে যখন সোনার ফসলের জন্য মাটী খুড়িবে, সে নিড়াইবে মাটী, নদীর জলে জাল ফেলিয়া সে যখন মাছ ধরিবে, পিছনে পিছনে সে বহিয়া আনিবে ছোট্ট একটী খালুই।

মানস-চক্ষে দেখে—নিদ্রিতা বধূর হাতখানি হাতে লইয়া যখন ঘুমাইয়া

আছে। পালঙ্কে দেহ এলাইয়া আছে রাজকন্যা তৃষা—অঙ্গে রূপার কাঠি ছোঁয়ানো—বুকের কাছে কুড়ানো মানিক।

তিমির লাফাইয়া উঠিয়া কেরোসিনের ডিবা জ্বলিয়া বসে। গায়ের জোরে চামড়ার উপর হাতুড়ি পিটিতে বসিয়া যায় অসময়ে।

কারিগর জিজ্ঞাসা করে: এত রাতে ও আবার কী!

তিমির বলে: কাজ এগিয়ে থাক্‌বে ভাই।

কাটিল মাত্র কয়েকদিন। আবার একদিন ঘর-ছাড়ানো বাঁশী বাজিয়া উঠিল।

রাজাবাবু!.......

একটী কথায় বহুস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। দুপুরের বিশ্রাম টুটিয়া গেল। তিমির মাথা তুলিয়া শুনিতেছে। যাক্, বোধ হয় পাশের বাড়ীতে ভিক্ষার মিনতি চলিতেছে।

রাজাবাবু!

একী! আরো জোরে! আরো গভীর স্বরে! দোকানের সাম্‌নেই নাকী!
: দূর, দূর! দূর হ!

রাজাবাবু এখানে? রাজাবাবু!

আস্তে আস্তে তিমির ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। দোকানের নীচেই ফুটপাতের উপরে দাঁড়াইয়া কয়েকজন! সবগুলি মুখই তিমির চিনিয়াছে: একী! তোরা! আবার তোরা! এখানেও!

ভুলিবার নয়। শুধু নিস্পন্দ কোটরগত চক্ষুগুলি দিয়া তাহারা খানিক তিমিরের মুখের পানে তাকাইয়া রহিল। তারপর পায়ের উপর হুম্‌ড়ি খাইয়া পড়িয়া কহিল: বাবা গো! আমরা কোথায় নেই? এতদিন ধ'রে সারা সহর তোমাকে খুঁজে বেড়িয়েছি। তোমার সে বাড়ীতে গিয়ে একদিন কী

মারই না খেয়েছি। তুমি যে নেই। বাবা গো! আবার তোমাকে ভগবান মিলিয়ে দিয়েছেন।

: তোরা বেঁচে আছিস!

: বেঁচে আছি কম, মরেছি বেশী, যে কটা আছি বোধ হয় বেশীদিন নয়। বাবাগো দিন তিনেক আগে একটু যা ফ্যান খেয়েছিলাম: তাহার মুখের পানে তাকাইয়া একজন ধুঁকিতেছে।

: দাও না বাবা, দুটো পয়সা।

: না হয় দুটী খাবার।

তাহাদের পানে তাকাইয়া-তাকাইয়া তিমিরের ম্লান দুই স্তিমিত চোখে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। বহুদিনকার লুপ্ত ঘুমন্ত মহামানব তাহার ভিতর আবার চোখ মেলিয়া ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিল। কী দিবে—কী দিবে সে আজ! কী বলিয়া তাহাদের থামাইবে! অকারণে দুই পকেটে সে হাত ঢুকাইল। কিন্তু নিতান্তই অকারণ! কী দিবে—সে কী দিবে আজ তাহাদের! আপনাকে? সাম্‌নের ঐ প্রকাণ্ড বাড়ীগুলার পানে চাহিতেই নিস্ফল আক্রোশে শুধু তাহার দুই হাতের মুঠি শক্ত হইয়া উঠিল।

বলিল: আসিস্ দুপুররাতে, সকলে ঘুমুলে—সহর ঘুমুলে।

* * *

গভীর রাতে।

রাজাবাবু!

তিমির কান পাতিয়া ছিল। লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

কারিগর জাগিয়া উঠিল: ওকী! কোথায় যাবে!

কপাট খুলিতে খুলিতে তিমির বলিল: তোমার দরজাটা এবার বন্ধ ক'রে দাও ভাই।

জীবন্ত মড়াগুলির সঙ্গে তিমির বাহিরের অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

দশ

ইহার পর দুই বৎসরের অন্তরাল। অন্ধকার—পাথুরে কয়লার মত জমাট অন্ধকার সীমা সঙ্কেত অবলুপ্ত করিয়া দিয়াছে। কোথায় তিমির, কোথায় কে। চাকার ঘূর্ণীপাকে কে কোনদিকে ছিট্‌কাইয়া পড়িয়াছে।

এবার যে দৃশ্যের যবনিকা উত্তোলন করিলাম সেখানে কেবল ঢেউ—আর ঢেউ—প্রতীক্ষার ঢেউ। অসহ নিঃসঙ্গ মুহূর্ত্তের সাগর।

সেখানে ফুল আছে গন্ধ নাই, পাখী আছে গান নাই, সূর্য্য আর চাঁদ আছে, আলো নাই।

সেখানে দিবা-রাত্রি আলো-অন্ধকারে সমস্ত আকাশ ভরিয়া সে কী আকুলতা! সে কী উদ্যোগ! একা! একা! অসহ পিয়াসে দীর্ণ বক্ষের শ্রান্ত রক্তধারার ব্যাকুল অন্বেষণ! কই! কই! কোথা! কোথা! কত দূরে—এখানে নয়, অন্য কোথাও।

রাত্রি।

কেবল একটী মানুষ একাকী জাগিয়া আছে। তাহাকে দেখিলে মনে হয়, এ দুই বৎসরে সে কথা কহিয়াছে অল্প, হাসিয়াছে কম। ক্লান্তি-মন্থর মুখখানি ধূসর চৈত্র-মাঠের মত নিরলঙ্কার উদাসীন।

ঘরে আলো জ্বলিতেছে। আলোর সাম্‌নে দাঁড়াইয়া তৃষ্ণা বাহিরের অন্ধকারের পানে নিঃশব্দে তাকাইয়া আছে। হাতে একখানি চিঠি।

চিঠিখানি একবার পড়িয়াছে সে। আগাগোড়া পেন্সিলের লেখা চিঠি। আজই ডাকে আসিয়াছে। সে আবার একবার পড়িতে লাগিল—

ইডেন গার্ডেন
২৯শে বৈশাখ কলিকাতা

"মহীয়সী,

তোমায় নমস্কার করি।

অনেকদিন কেটে গেছে। তোমায় চিঠি লিখবার ইচ্ছা হোলো। আমার ধৃষ্টতাকে ক্ষমা কোরো। জেল থেকে বেরিয়েই সবার আগে তোমার কথাই মনে পড়্‌লো। কেন জানি না। বোধ হয় এবার তোমাদের দেশ থেকে চলে যাবো বলে। আমি সকল ভুলে তোমার কাছে চিঠি লিখ্‌ছি। তুমি আমায় ক্ষমা কোরো।

জেলের কথা শুনে অবাক হ'চ্ছো? ওটা কিছু নয়। আমার পক্ষে ওটা অস্বাভাবিক নয়। কলিকাতার পল্লী অঞ্চলের কোনো একটা বিখ্যাত দেবী-মন্দিরে চুরি ক'রেছিলাম—সর্ব্বস্ব অপহরণ। আইনের বিচার নতশিরে মেনে নিয়েছিলাম। দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

ম্লান ক্ষুধাতুর মুখগুলি আবার একদিন হঠাৎ আমার সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো। তাদের থেমে-থেমে-যাওয়া নিঃশ্বাস আর বিবর্ণ ডুবু-ডুবু চোখের ভাষা আমায় মাতিয়ে দিয়ে পথের অন্ধকারে বার করে দিলে। কোথায় বেরিয়েছিলাম জানি না, তবে জান্‌তাম কিছু ওদের দিতেই হবে। রাজপথে গা ঢাকা দিয়ে যেতে যেতে পথপার্শ্বের অভ্রলেহী যক্ষপুরীগুলির দ্বার ভাঙ্‌বার বাসনা জাগলো। কিন্তু পিছিয়ে এলাম। নিষ্ফল আক্রোশে দেওয়ালের গায়ে ঘুসি মেরে শুধু হাতের চামড়াই তুলে ফেল্‌লাম্। তারপর চল্‌তে চল্‌তে এক সময়ে এসে পড়লাম দেবী মন্দিরের ধারে। দাঁড়িয়ে ভাবলাম একটু, তারপর একটা পুকুরে স্নান করে পবিত্র হলাম। অদূর কক্ষে সেবক আর দারোয়ানেরা ঘুমে কাতর। নিঃশব্দে মন্দিরের দ্বারের চাবি ভাঙ্‌লাম। অন্ধকারে সন্তর্পনে দেবী মূর্ত্তির দেহ হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে সমস্ত অলঙ্কারগুলি খুলে নিয়ে বেরিয়ে

এলাম, তুলে দিলাম সর্ব্বহারাদের হাতে। আমি জানি হৃদয় আমার এতটুকু কাঁপেনি সেদিন।

কেননা আমি জানি, এতটুকু অপরাধ আমি করিনি। আমি জানি ও-অলঙ্কারে দেবতার কোনো প্রয়োজন ছিল না। ও-অলঙ্কার উপহার পেয়ে আনন্দ তাঁর এতটুকু বাড়ে নি, বরং দিবারাত্রি পাষাণ ভারের মত তাঁর অঙ্গকে পীড়িত করছিল। ব্যথায় অভিমানে তাঁর অন্তর উঠ ছিলো ভ'রে। আমি জান্‌তাম আমি যদি তাঁকে রিক্ত করি, তিনি আমায় অভিশাপ দেবেন না। যক্ষের মত একটী ধনাগার দেবী কোনদিনই কামনা করেন নি। বুদ্ধিহীন বিমূঢ় মানুষ তাঁকে পুঁজিপতিদের সঙ্গে সমান আসনে বসালো। মন্দিরের দেবতা—মানুষই কল্পনা করলো তাঁর ক্ষুধা, তৃষ্ণা; সেবার ছলে তাঁকে নাওয়ালো, খাওয়ালো, কাপড় পরালো; সামান্য ত্রুটি না হয়, তটস্থ সবাই, পাছে তিনি রাগ করেন। এ যে নিতান্তই ভাব-বিলাসিতা, অবরুদ্ধ অতৃপ্ত অসম্পূর্ণ জীবনের আত্মবিড়ম্বনা। আমি জানি মানুষের মধ্যেই দেবতা ক্ষুধিত তৃষিত রোগার্ত্ত শোকাতুর হ'য়ে মানুষের করুণা ও সেবা ভিক্ষা করে কেঁদে কেঁদে ফিরছেন। এদের বঞ্চিত করলে বঞ্চিত হবেন দেবতাই। উপনিষদ যে মানুষের আত্মার মধ্যেই পরমাত্মার সন্ধান পেয়েছিলেন। বুদ্ধদেব বলে গিয়েছিলেন, জীবের প্রতি অপরিমেয় প্রীতিই ব্রহ্মবিহার। ওদিকে খৃষ্ট বলেছেন, বিবস্ত্রের মাঝখানে থেকেই আমি কাপড় পরি, নিরন্নের মাঝখানে থেকেই আমি ক্ষুধা মেটাই—এই কথাটাই যে ব্রহ্মভাষ্য। আমার ভগবান মানুষ-রূপী। আমার ঠাকুর মন্দিরে নয়, প্রতিমাতে নয়, বৈকুণ্ঠেও নয়—আমার ঠাকুর রক্তমাংসের মানুষের মাঝে—যেখানে ক্ষুধা তৃষ্ণা অভাব অভিযোগ সত্য—যেখানে এতটুকু ফাঁকি নেই। তাঁর পূজোকে যারা তুচ্ছ ক'রে চলে যায় তাদের আমি সইতে পারি না। এই তুচ্ছতায় অবহেলায় পরিব্যাপ্ত হ'য়ে আছে এদেশ। তাই এ দেশে মানুষ এত উপেক্ষিত। এই উপেক্ষিত মানুষের দুঃখে ও দৈন্যে, তাদের সকরুণ দীর্ঘনিঃশ্বাসে ভারাক্রান্ত হ'য়ে সকল

দেশের পিছনে প'ড়ে আছে এ দেশ। আমি পারি না—সইতে পারি না। দেউলের দেবতা যেখানে মানুষ দেবতার প্রতিদ্বন্দ্বী, যেখানে দেবতার নামে মানুষ প্রবঞ্চিত, আমার মন সেখানে ধৈর্য্য মানে না। মাদুরার মন্দিরে গিয়ে অবাক্ হ'য়ে গিয়েছিলাম। ঠাকুর সেখানে এক কোটীপতি মাড়োয়ারীর মত ধন কুবের। সারা গায়ে অজস্র অলঙ্কার। বুভুক্ষু মানবের অন্নের থালি-থেকে-কেড়ে-নেওয়া অন্নের মূল্যে যে এই ঐশ্বর্য্য। আবার তারকেশ্বরের মন্দিরে গিয়ে দেখি, যিনি ভস্মমাখা সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর তিনি কটিতটে চন্দ্রহার ও মাথায় স্বর্ণকিরীট পরে রয়েছেন বসে। দেখে আর হেসে বাঁচি না। প্রতি তীর্থক্ষেত্রে যুগে যুগে সহস্র সহস্র পূজামুগ্ধ মানবের অযাচিত দানে মন্দিরের ভগবান পুরোহিত ও পাণ্ডার মধ্যেই হাস্যাস্পদ ভাবে পরিপুষ্ট হয়ে উঠ্‌চেন। ওদিকে লোকালয়ে তাঁর কোমরে উঠ্‌লো নেংটি, চক্ষু হোলো কোটরগত, বেরিয়ে পড়লো কণ্ঠার হাড়। এ কী খেলা! এ কী নির্ব্বুদ্ধিতা! ধর্ম্মাভিমানী এ দেশ! একী সেই ধর্ম্ম, যাঁকে উপনিষদ বলেছেন 'ক্ষুরধার নিশিত' দুর্গম? মানুষের প্রতি মানুষের এত ঘৃণা এত ঔদাসীন্য আর কোনো দেশে নেই, তাই এ দেশে হতভাগ্য মানুষের সমস্ত প্রাপ্য চেঁছেপুঁছে দেবতা নিচ্ছেন হরণ করে।

তদন্তে যখন সমস্ত সহর তোলপাড় হচ্ছিল, আমি নিজেই গিয়ে ধরা দিয়েছিলাম। আমি চলে যাবো। যাওয়ার আগে এ দেশের সমস্ত দেনা পাওনা চুকিয়ে যেতে চাই। জানি, দেবতা আমায় সাজা দেবেন না, সাজা দেবে মানুষ। দেবতার চেয়ে মানুষকে আমার বেশী ভয় চিরদিনই। যাক্, আমার এ দুষ্কর্ম্মের অর্থ দেবতা আর তুমি ছাড়া আর কেউ জান্‌লো না। আর কারো কাছে জানাতেও চাই না। চোর ডাকাতের সঙ্গে দুটী বছর সমান খাতির পেয়ে এলাম।

শুনেছি সে দেবীর পুনরভিষেক হ'য়ে গেছে। স্পর্শাতুর আর স্পর্শাতুরা দেবদেবীরা এ দেশের। কে তাঁর কলুষিত করে গেছে অঙ্গ, তাঁকে শুচিতায় পুনর্মণ্ডিত না করলে তিনি মানুষের পূজনীয় হবেন কেমন করে! আমি ভেবে

পাই না, যে শুচি তাঁর পবিত্র স্পর্শ দিয়ে অশুচিকে শুচি করে তুল্‌বেন, অশুচির সামান্য স্পর্শে সে শুচি কেমন ক'রে অশুচি হ'য়ে যান! মন্দিরের পবিত্র দেবতা অব্রাহ্মণের স্পর্শে কেন অপমানিত হন! যে গঙ্গাজল ছিটিয়ে অপবিত্রকে পবিত্র করা হয়, অপবিত্রের এতটকু ছোঁয়াচে তা কেমন করে অপবিত্র হয়ে যায়! এ আমার কাছে একটা চিরন্তন রহস্য হ'য়ে রইলো। যুগে যুগে দেশে দেশে যে সব মহাপুরুষ আবির্ভূত হ'য়ে দেবতার পূজা পেয়ে গেলেন তাঁরা কেমন ক'রে এর বিপরীত ধর্ম্ম পালন ক'রে গেলেন! খৃষ্ট কেমন ক'রে পতিতা আর কুষ্ঠ রোগীকে স্পর্শ করলেন! চৈতন্য কেমন ক'রে যবন হরি-দাসকে কোল দিলেন, অথচ খণ্ড খণ্ড হ'য়ে পড়লেন না! এ কী রহস্য! এ কী কৌতুক! দেবতা কোথায়? তাঁকে যে এ দেশের কোথাও দেখ্‌তে পাই না। আমার দেবতা সেইখানে যেখানে কোনো বানানো লোকাচারের প্রাচীর তুলে কোন সম্প্রদায় তাঁকে সঙ্কীর্ণ ভাবে আত্মসাৎ করে নি, যেখানের পথ খোলা আছে সবার তরে, যেখানের ধূলিতে অধিকার আছে সবাকার, নিরর্থক শাস্ত্রের অবুঝ রীতি আঁকেনি কোন অবরুদ্ধ গণ্ডী। সে মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে হাতে হাত মিলিয়ে তাঁর ভালোবাসার স্পর্শ নিচ্ছে সকল দেশের সকল জাত। আমি জানি তাঁকে অবগুণ্ঠিত করার অপরাধেই এ দেশের চলার ছন্দ গেছে থেমে। মুক্তি-বঞ্চিত শীর্ণ-প্রাণ অপমানিত মানুষ পড়ে রয়েছে ঘরের কোণে, উচ্ছল জীবন প্রবাহ ভাটিয়ে ভাটিয়ে এসেছে স্তব্ধ হ'য়ে।

যাক, আমি চললাম, ঢের হয়েছে, আর কেনো? তীব্র অভিজ্ঞতা নিয়ে এ দেশ ছেড়ে চললাম। মনে প্রাণে এ দেশেরই মানুষ হ'তে চেয়েছিলাম। কিন্তু তাও কী হয়? সে যে বিশ্রী অঘটন! অশুচি যে আমি! ভাইকে ভাই-এর পাশ থেকে তাড়িয়ে দিতে না পারলে এ দেশের মোটেই শান্তি নেই। বিদায় পেয়ে গেছি বহুদিন, বেরিয়ে যাওয়ার তোরণ খোলাই আছে, বেজেই আছে আমার পারের বাঁশী। চল্‌লাম।

বিলাসী-বাগানে ব'সে ব'সে চিঠি লিখছি। কত যুবক যুবতী এলো আর গেলো। গোপনে আড়চোখে আমার পানে চেয়ে মুচ্‌কি হেসে গেলো। ভেবে গেলো বুঝি প্রেমের কবিতা লিখছি। মিলন-মদির চোখে তারা আর কী দেখতে পাবে বলো? তখন তাদের মনে থাকে না পৃথিবীতে অনেক রকমের মানুষ আছে। চল্‌লাম। অজানিত ভাবে তোমায় বঞ্চিত করেছিলাম, আবার অজানিত ভাবেই তোমায় জীবনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করে গেলাম। পরের প্রতারণায় অজ্ঞাতে যে বিত্ত আমার হাতে এসে পড়েছিলো—সত্যকারের অধিকারিণী তুমি, তাকে তোমার হাতেই ফিরিয়ে দিয়ে গেলাম। চিঠির সঙ্গে সঙ্গে এ উইলটাও গ্রহণ কোরো। তোমার সে ঐশ্বর্য্য-দিনের পরিচয় আমি ভুলে গিয়েছিলাম। তোমার বাবার নাম, তোমার গাঁয়ের নাম ইত্যাদি যা বহুদিন আগে পুরী থেকে ফের্‌বার পথে গাড়ীতে ব'সে তোমার বাবার মুখেই শুনেছিলাম তা আমার অমসৃণ জীবনে কোথায় মিলিয়ে গেছ্‌লো। সব কিছু মনে পড়্‌লো তখন, যখন অবাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে তোমার তিরস্কার শুন্‌ছি। আমার ঝাপপড়া জীবনের এ বিস্মৃতিকে তুমি ক্ষমা কোরো। সেই সঙ্গে মনে পড়েছিলো তাঁর কথাও যাঁর জন্যে এ অঘটন ঘটেছিলো। অবাক হ'য়ো না, বিশ্বাস করো, ঘৃণায় কুঞ্চিত হ'য়ে তাঁকে বিশ্বের কঠিনতম শাস্তি দেবার জন্যে আমি বিধাতাকে আহ্বান করেছিলাম সেদিন। তিনি আমার জন্মদাতা সেইজন্যেই পূজনীয় নন। তাঁর চেয়ে তুমি আমার কাছে ঢের বেশী শ্রদ্ধার। যাক অজানায় যে-কদিন তোমায় বঞ্চিত করেছিলাম, তার জন্যে আমি ক্ষুব্ধ, লজ্জিত, আমায় ক্ষমা কোরো। আমার যে কী আনন্দ! তুমি জীবনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হ'লে। তোমার অনিশ্চিত জীবনের সমাপ্তি খুঁজে পেলে।

চল্‌লাম। তোমার কল্পনার সৌধে যে মানুষটী বাস কর্‌ছিলেন, এতদিনে তিনি হয়ত তোমার চোখের সাম্‌নে নেমে এসেছেন, তাঁকে খুজে পেয়েছো তুমি। কী জানি, আজ হয়ত তিনি তোমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন! দেবতার কাছে প্রার্থনা করি যে [illegible]। তিনি যেন [illegible] [illegible]

অন্তরকে মুহূর্ত্তকালের জন্যও অসম্মানিত না করেন। তাঁর কাছে তুমি আমার সত্য পরিচয় দিও।

আর আমার ছোট্ট বন্ধুটী? হতভাগ্য সে জানে না তাঁর অনাগত জীবনে কুয়াশা জমে উঠ্ছে! আলোর পাগল, খেলার পাগল ছোট্ট বন্ধু আমার! তুমি যেদিন তাকে গভীর স্নেহে কোলে তুলে নিলে, তুমি জানো না, তোমার আকাশস্পর্শী অন্তরের কাছে আমার অন্তর কী গভীর শ্রদ্ধায় কী মুগ্ধ বিস্ময়ে নত হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলো। তুমি তুলে নিয়েছো ফেলে-দেওয়াকে প্রসন্ন হাসি হেসেছো ঘৃণ্যের পানে চেয়ে, তুমি অন্ধ হয়ে গেছো যেখানে কুসংস্কার। তুমি ঐশ্বর্য্যবতী অপরূপ—ভিতরে ও বাহিরে। কবে এ দেশ যে তোমার মত হবে! যাই—আমি চলে যাই তোমার স্মৃতিটুকুকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাই। আর ছোট্ট হতভাগ্য দুঃখী বন্ধুটিকে আমার সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে যাই।

তোমায় চিঠি লিখ্ছি। আমার সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠ্ছে। এত ভাল লাগ্ছে কেন জানি না। বোধ হয় তোমার কাছে এ আমার প্রথম চিঠি আর এই-ই শেষ ব'লে। চল্লাম্। আমার বিবর্ণ জীবনের পটে পটে মাত্র কয়েকদিন এসে তুমি কী রঙ যে ফুটিয়েছিলে! সে জন্য তোমায় ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আরও ছোট হতে চাই না। জানি, এবার অন্ধকার পথে চল্‌তে চল্‌তে দূর স্বপ্নের মত সে রঙ আমার ঘৃণ্য মনের কোনে কোনে বারে বারে চমক্ দিয়ে উঠবে, ভাবিয়ে তুলবে আমায় আমৃত্যু। চললাম্। কানে কানে আমার দূরের বাঁশী বেজেই আছে। এ দেশ ছেড়ে চললাম। দূর থেকে শুধু তোমার কথা আমার মনে পড়বে বারে বারে। আর সব ভুলে যাবো। চল্লাম্। যে বিরাট হৃদয় দিয়ে তুমি কদিনের জন্যে আমায় মানুষের স্বপ্ন দেখিয়েছিলে, হে অদৃশ্যা শ্রদ্ধেয়া! সে বিরাট হৃদয়ের কাছে রেখে গেলাম একটী নমস্কার। আমার সমস্ত চপলতাকে তুমি ক্ষমা করিও।

'ক্ষণিকের অতিথি।'

কাগজ কলম লইয়া তৃষ্ণা লিখিল:

হে ক্ষণিকের অতিথি!

তুমি আমায় রক্ষা করলে। তোমার চিঠি পেয়ে আমি আনন্দিত দুঃখিত বিস্মিত, না কী হলাম তা বলতে পারছিনা। তবে জানি আমার জীবনে ভারাক্রান্ত মুহূর্তগুলির অবসান হোলো। অসহ্য প্রতীক্ষার বেদনা থেকে তুমি আমায় বাঁচালে।

কতদিন কেটে গেছে, ফুল জমিয়ে রেখে রেখে তার হিসাব করিনি, হিসাব রেখেছি ক্যালেণ্ডারের পাতায়। সুখদুঃখের উপহার নিয়ে প্রতিটি দিন আমার দ্বারে এসে দাঁড়িয়ে গেল, মনের অশ্রুজলে আমি তাদের বিদায় দিলাম। আমি শুধু উদাসীন চোখে বাতায়নে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

তুমি চলে গেলে আমাকে একেলা রেখে। বিক্ষুব্ধ সাগরের মাঝে আমায় ভাসিয়ে দিয়ে, আমার সমস্ত অহঙ্কারকে ধূলায় লুটিয়ে। আমি তোমাকে অপমানিত করেছিলাম? লাঞ্ছিত করেছিলাম? তার জন্যে তোমার কাছে আজ আর ক্ষমা নাইবা চাইলাম। জানি হে মহামানব! সেই রাতেই তুমি আমায় ক্ষমা ক'রে গেছ, জেনে গেছ সে ক্রোধরক্ত মূর্ত্তি আমার মনের ক্ষণিকের বিষাক্ত বিষফোড়া মাত্র। জানি তোমার মহার্ঘ মন দিয়ে তুমি আমায় চিনে গেছ।

তুমি চলে গেলে। এতটুকু সময় দিলে না, আমার যা কিছু বলার সবই পড়ে রইলো মনের মাঝে। তাই ত এ দীর্ঘদিন সুর-হারা বাঁশীর মত বিবশ হ'য়ে রইলো—আমায় জালিয়ে তুললো, পাগল ক'রে তুললো পলে পলে। অপ্রকাশের বেদনায় কুণ্ডলী পাকিয়ে রইলো মন আমার মনেরই মধ্যে। আজ ভাবি কেন তুমি আমায় ক্ষমা ক'রে গেলে। আমার অমনুষ্যত্বের সাম্‌নে মাত্র সেই সময়টুকুর জন্যে কেন তুমি অমানুষ হলে না। কেন আমায় নির্য্যাতন নিপীড়ন ক'রে গেলে না। প্রতিশোধ নিলে ন, আমায় অপমানিত অসম্মানিত ক'রে গেলে না! ক্ষমা-সুন্দর! ধীরে শান্ত-নিঃশব্দে চলে গেলে, অনাঘাতের নিদারুণ আঘাতে আমায় মূর্চ্ছিত ক'রে গেলে।

তুমি চলে গেলে। আমায় প্রতিষ্ঠিত করে গেলে। কিন্তু আমার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ক'রে গেলে না ; জান্‌লে না আমি কেমন রইলাম। আজ আমার মুখখানা দেখ্‌লে তুমি তা বুঝতে পার্‌তে। বাংলাদেশের সাম্‌নে মুখোমুখি আমি আজ দাঁড়িয়েছি। তার সারবত্তা ও মনের ঐশ্বর্য্য এতদিন কেতাবে লোকের মুখে ও অপরের জীবনে প্রকাশিত দেখেছিলাম, আজ আমার জীবনে তা সত্য হ'য়েছে।

তুমি জানো আমি বাংলা দেশের মেয়ে হ'লেও, আমার মন আর চরিত্র ছিল অন্য ধরণের। খাটি বাঙালী মেয়ের মনের সঙ্গে আমার মনের মিল ছিলো না। তাদের অশিক্ষা, তাদের অবগুণ্ঠিত মুখ, লজ্জিত চক্ষু, দুর্ব্বল দেহ আর চিত্ত আমার মনকে পীড়িত করতো। আমি জানি এই অকারণ লজ্জা, জড়ত্ব আর ভীরুতা দেশের ঘৃণিত লম্পটদের পরম সাহস ও সুযোগ দান করেছে, আর সংখ্যাও বাড়িয়েছে তাদের। আমি দেশের দিকে দিকে তাকিয়ে দেখ্‌ছি আজ নারীর উপর অত্যাচারে দিগ্বিদিকে কালি ভ'রে উঠ্‌ছে। লুপ্ত-মহিমা ভগ্ন-গরিমা হত সতীত্বে দেশের কল্যাণলক্ষ্মী আজ অন্ধ অশ্রুতে কেঁদে কেঁদে ফিরছেন। কে তাঁকে বাঁচাবে, কে তাঁকে সান্ত্বনা দেবে ? আমি জানি আজ নারীই নারীর একমাত্র সহায় ও অবলম্বন, নারীই তার নিজের শক্তি। সে নিজে ছাড়া আর কে তাকে বাঁচাবে ? পুরুষ অক্ষম, শাসক-শক্তি উদাসীন, সে আজ নিজে না উঠে দাঁড়ালে কে তার সাম্‌নে গৌরবের আসন রচনা করে দেবে ? তাই স্থির কর্‌লাম মেয়ে হলেও মানুষ হয়ে যখন জন্মেছি তখন মরবার আগে আমাদের এই দুর্ব্বল মেয়ে জাতটার জন্যে কিছু ক'রে যাবো. তাদের দিয়ে যাবো মনে কিছু সাহস, দেহে কিছু শক্তি। বাড়ীর পূর্ব্বপ্রাঙ্গণে বসালাম ছোট্ট একটী ইস্কুল. পশ্চিম প্রাঙ্গণে চল্‌লো লাঠিখেলা, ছোরা খেলা, বর্শা ছোঁড়া। গ্রামের এবং ক্রমে ভিন্নদেশ থেকেও এসে যোগ দিলো মেয়েরা, অবিবাহিতা এবং অনেক বিবাহিতাও। পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর, ক্রমে একশো এবং দেড়শো। বড় বড় ওস্তাদরা এসে শেখাতে লাগলো কসরৎ।

কিছুদিনেই সফলতার অগ্রগতি দেখে বিস্মিত হলাম এবং অদূর ভবিষ্যতের একটা সোনার দিন আমার সাম্‌নে ঝিলিক দিয়ে উঠতে লাগলো। কিন্তু আশ্চর্য্য! দিন কয়েক পরেই দেখলাম মেয়েরা আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। সংখ্যা হোলো একশো, আশি, ষাট, চল্লিশ এবং ক্রমে শেষে শূন্য! হে ক্ষণিকের অতিথি! এযে বাংলা দেশ!

কিছুদিন থেকেই একটা ফিস্‌ফাস্ গুজ্‌গাজ্ শুন্‌তে পাচ্ছিলাম। আশে পাশের বাড়ী থেকে বহু যুবতী ও বর্ষীয়সী মহিলারা এবাড়ীতে বেড়াতে আসতেন। এবং আমার পুনরাবির্ভাবে ও এ ঔপন্যাসিক ঘটনায় আনন্দ প্রকাশ কর্‌তেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই তারা গুম্ হ'য়ে গেলেন এবং তাদের আসাও ক্রমে বন্ধ হ'য়ে গেলো। বক্তব্য, এ শিশু এলো কোথা থেকে? আমি অবিবাহিতা—শ্বেত সীমন্তিনী, আমার স্বামী নেই, আমি একটা বিশেষ ধরণের মেয়ের মত কতদিন বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ালাম এবং—শোনো. তোমার কাছে না বল্‌লে আর কার কাছেই বা বল্‌বো? আমার নির্লজ্জতার জন্যেও আজ আর তোমার কাছে ক্ষমা চাইবো না—আমার কাছে এই যে নিষ্পাপ শিশু, শুয়ে ঘুমুচ্ছে এর জন্য দায়ী নাকি আমি আর তুমি। আর আমি এত বড় ধুম্‌সো মেয়ে বিয়েই বা করিনি কেন? তার কারণ নাকি তাঁরা ভাল রকমেই জানেন। তারা জানেন তোমার রাতে রাতে গোপন আসা যাওয়া, মদ খেয়ে ঘরের ভিতর বিশ্রী কাণ্ড। তাঁরা যে যার ঘর থেকেই তা নাকি একদিন দেখেছেন। মাঝে মাঝে দু'একজন এসে তাঁরা আমায় বোঝান এবং অমূল্য উপদেশ দিয়ে যান এবং বলেন অন্যত্র গেলেই আমি এবার সুখে থাকবো, যেমন কলিকাতার কোন বিশেষ অঞ্চলে। আর এ ভদ্র পাড়ায় থেকে এ পাড়ার গৌরব নষ্ট ক'রে আমার কীই বা লাভ? হে ক্ষণিকের অতিথি! আমি তাঁদের কাছে সত্য যা তা বলেছি, কিন্তু সে কথা মেনে নেবার মত মন তাঁদের মাঝে একটাও নেই।

দুনাম রটলো! এমন যে মেয়ে সে কথনো ভালো কাজ কর্‌তে পারে

না। যেটা কর্‌ছি সেটা ভালো কাজের নামে একটা ব্যাবসা মাত্র। এতগুলো মেয়ের আমি সর্ব্বনাশ সাধন কর্‌ছি এবং তাদের ঘর ছাড়িয়ে নিয়ে যাবার ফিকির কর্‌ছি। একে একে সবাই খসে পড়তে লাগলো। এর উপর থানা থেকে হঠাৎ একদিন একটা সাবধান বাণী এলো। আমি কোলকাতার পথে পথে একটা ডাকাতের সঙ্গে দিনকয়েক ঘুরে বেড়িয়েছিলাম। পুলিশ তা জানে। এবং আজ যেটা আমি কর্‌ছি এটা আর কিছু নয়, একটা মেয়ে ডাকাতের দল মাত্র। সুতরাং সাবধান! এরপর যে কটী মেয়ে সত্যিকারের ভালো আমাকে বাস্‌তো তারাও সরে গেলো, সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাদান ও শক্তিদান একই সঙ্গে উঠলো ডকে।

একগলা দুর্নামের মাঝে তবু বাস ক'রে রইলাম। দূর থেকে তুমি তার কিছুই জান্‌লে না। দিন আর কাটে না। তবুও কাটে শুধু তোমার প্রতীক্ষায়। এরপর হঠাৎ একদিন একটা ঘটনা ঘট্‌লো যাতে আর আমার মাথাটুকুও জেগে রইলো না। হঠাৎ একদিন গভীর রাতে রেইন পাইপ বেয়ে জানালার কাচ ভেঙে আমার ঘরে ঢুক্‌লো দুটী মানুষ। কেন তা তোমাকে না বল্‌লেও চল্‌বে। আমি জেগেই ছিলাম। লাফিয়ে উঠে ভাবলাম চাকর দারোয়ানদের সচকিত করি চীৎকার ক'রে। কিন্তু দেখলাম তার আগেই হয়ত তারা আমায় আয়ত্বের মধ্যে এনে ফেলবে। বলপ্রয়োগ এখানে বাতুলতা। তুমি জানো বিপদে বুদ্ধি হারানো আমার স্বভাব নয়। আমি তৎক্ষণাৎ সমস্ত ভয় ও ক্রোধ পরিত্যাগ ক'রে এমন একটা অন্তরঙ্গ হাসি হাস্‌লাম যাতে তারা আমাকে বশীভূত শিকার মনে করে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে গেল। তখন আমি এগিয়ে এসে বল্‌লাম, আমি তাদের চিনি, এবং তারা যা চায় তাতে আমার অস্বীকৃতি নেই। শুধু তারা একটু বিশ্রাম করুক, আমি প্রস্তুত হ'য়ে নিই। কথায় তাদের বশীভূত কর্‌লাম। শান্ত হ'য়ে তারা মদের ঝোঁকে সোফায় বসে ঝিমুতে লাগলো। আমি সেই ঘরেই ষ্টোভ জেলে তাদের দুজনের জন্যে দু'কাপ চা তৈরী করে দিলাম! গভীর তৃপ্তির সঙ্গে তারা

সে চা পান ক'রে সোফায় শুয়ে আরামে ঘুমুতে লাগলো। তারা আমার হাতের চা খেয়ে যে কী আরামই পেয়েছিলো! সকালেও তাদের সে ঘুম আর ভাঙলো না। ঘুম—ঘুম—দীর্ঘ ছেদহীন বিরামহীন ঘুম! আমি খোকাকে সরিয়ে নিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে ভোরের প্রতীক্ষায় ব'সে ব'সে রাত কাটিয়ে দিলাম। আমার সর্ব্বদেহ কাঁপছিলো, অপরাধের ভয়ে নয়, এত বড় কাজ আর কখনো করিনি ব'লে। আর কেউ নাই জানুক, তুমি জানো আর আমি জানি এতে আমার বিধাতা আমায় সাজা দেবেন না।

এদের একজনকে তুমিও জানো আর আমিও জানি। শত্রুঘ্ন। অপরটী তারি একজন কে মুসলমান বন্ধু! আদর ক'রে তাদের চা খাইয়েছিলাম—সঙ্গে ছিল—পটাসিয়াম্ সায়নাইড্।

সকাল বেলা নিজেই পুলিশে খবর পাঠালাম। এতটুকু কথা গোপন করলাম না। তবু জানি শাস্তি অনিবার্য্য। ইচ্ছা ছিলো পাওনাটুকু মাথা পেতেই নেবো। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দু'হাজার টাকা দিয়ে পুলিশকে বশীভূত ক'রে ছাড় নিয়ে এলাম। কারণ, যদি তোমার চিঠি আসে? তুমি যদি এসে ফিরে যাও?

কলঙ্ক গাঁ ছেড়ে ভিন্ গাঁয়ে ছুটলো।

এই দেশ! এই মানুষ! এই সমাজ! এই বিচারক! তুমি এদেশ ছেড়ে চলে যাবে, আমার আনন্দ হচ্ছে। সত্যি তুমি চলে যাও—এ দেশ ছেড়ে চলে যাও, কিন্তু আমার অনুরোধ আমায় সঙ্গে নিয়ে যাও।

তুমি অপবিত্র? আমার কাছে নও। আমি জানি তুমি গঙ্গা, তুমি সূর্য্যরশ্মি, তুমি শ্মশান। তুমি পথ প্রান্তর ভাসিয়ে নিয়ে যাও, তুমি আবর্জ্জনা জঞ্জাল টেনে নিয়ে যাও, তুমি সর্ব্বভূতের আশ্রয়; তোমার প্রবাহ দেবতার কাছে, আবার লোকালয়ের গ্লানির বক্ষ দিয়ে; তোমার রশ্মি ভোর বেলাকার কুঁড়িটীর মুখে, আবার বিশ্বের আবর্জ্জনার উপরে। তোমার বক্ষে সর্ব্বজীবের আশ্রয়; তাই তুমি পবিত্র। কোন ব্রাহ্মণও তোমার চেয়ে শুচি নয়। দেশ

তোমায় বিদায় দিয়েছে, আমি তোমাকে আমার মনের ঠাকুর ঘরে তুলে রেখেছি। দেশের কাছে তোমার প্রয়োজন শেষ হ'য়েছে, আমার কাছে তোমার প্রয়োজন এই হোলো সুরু। তুমি যাও, কিন্তু আমায় সঙ্গে নিয়ে যাও।

তোমাকে অপমানিত করতে আমার প্রাণে বাজে, তাই এ নোংরা জায়গায় তোমায় আর ডাক্‌বো না। এ নোংরা দেশের মাঝে তোমায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে আমার চোখে অশ্রু আসে। তুমি যে মহামানব। যাও, মুক্তির খোঁজে যাও। আমারো প্রয়োজন শেষ হ'য়েছে এদেশের কাছে। নিন্দা আর গ্লানি গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছে উপহার রূপে। আমিও চল্‌লাম। পথের পরে তোমায় আমায় দেখা হবে।

আজও আছি আমি এ বাড়ীতে। লজ্জায় আর ঘৃণায় আমার সমস্ত অন্তর শিউরে উঠ্‌ছে। তুমি আমায় প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছিলে? সত্যি, ঐশ্বর্য্যের অভাব নেই, চাকর চাকরাণী দাসদাসী দারোয়ান নায়েব গোমস্তা পরিবেষ্টিত হ'য়ে আছি। ব্যাঙ্কে অজস্র টাকা। কিন্তু মনের গোপন গহ্বরে চিতা জ্বলে উঠেছে। কিছু নেই, কিছু নেই, এ সবের মূল্য কিছু নেই। কেন তা কেমন ক'রে তোমায় জানাবো। এ বিত্ত বিলিয়ে দেবো শুনে কত বড় বড় লোক যে ছেঁড়া কাপড় পড়ে এসে দাঁড়িয়েছিল কী বল্‌বো। তাদের কী লোভ, কী নির্লজ্জতা, দেখে আমি হেসে বাঁচিনা। যাক তোমার সম্পত্তি তুমি যা হয় কোরো। চিঠির সঙ্গে যে উইলটা তুমি পাঠিয়েছিলে সেটা আমি ছিঁড়ে ফেলেছি। আগের উইলটা রেখে দিয়েছি। এ বিত্ত তো তোমারই। আমার শেষ হ'য়েছে।

তুমি চলে যাও। আপনার মনে আপনার সুন্দর পথে তুমি চলে যাও। সত্যের পথ যে কঠিন। তাই সংসার প্রতিকূল। সে সংসারকে ধুলায় মাড়িয়ে তুমি চলে যাও। তোমার আত্মাকে তুমি চিনেছো কী? সে যে অনেক

বেশি বড় এই ঘৃণ্য সংসারের চেয়ে। তুমি অদৃশ্য হয়ে আছো। গভীর ধূম্রজাল তোমাকে আচ্ছন্ন ক'রে আছে। কিন্তু তোমার ভিতর যে মৃত্যুহীন শিখাটী ধিকি ধিকি জ্বল্‌ছে তার আলো যে বিশ্বব্যাপী। যাও, আজ তুমি চলে যাও। তোমার পূজা সারা হোলো না, কিন্তু হারিয়েও গেলো না সে। তোমার সে ব্যর্থ পূজার হোমবহ্নি ক্ষীণ রশ্মির মত রয়ে গেলো এখানে মানুষকে ভাবিয়ে তুল্‌তে। তোমার জীবনের ইতিহাস একলা তোমারই ইতিহাস নয়, সমগ্র বিশ্বের কল্যাণের ইতিহাসকে অলক্ষ্যে রচিত করে তুলছে। হে পরাজিত! হে ব্যর্থ! তোমার আজকের বক্ষের বেদনা নিখিল বিশ্বের তপাগ্নি শিখায় ঘৃতাহুতি প্রদান করছে। তুমি অক্ষয়, তুমি যে বিধাতার আপন অন্তরের।

হে ক্ষণিকের অতিথি! তুমি চলে যাও। কিন্তু ক্ষণিক দাঁড়াও, আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাও। তোমার পায়ের বাঁশী বেজেই আছে, সে বাঁশী যে আমারো। সে আমার মন মাতালো, ঘর ছাড়ালো, পরশ করে আমার ঘুম ভাঙালো। একলা ঘরে কেমন ক'রে থাকি আর? চলো, চলো, ফিরে যাই আদিম পৃথিবীতে। যেখানে সমাজ নেই, সভ্যতা নেই, বিচার নেই। নাই থাক, সেও ভালো। সে যুগ এর চেয়ে দুঃখহীন। বন্যপশুরা আছে? থাক্ পশুর চেয়ে মানুষকে আমার বেশী ভয়। চলো, চলো, অনেক দূরে ডাক্ পড়েছে। পথের পরে তোমায় আমায় দেখা হবে।

তুমি আমার কাছে ক্ষণিকের অতিথি? তাই-ই বটে। এ দীর্ঘ জীবনের মাঝে তোমার কাছে কাটিয়েছি মাত্র সাতটা দিন। ক্ষণিক নয়ত কী? কিন্তু তবু কেন মনে হয় তুমি যেন আমার কাছে সাত দিন নয়, সাতটা জনমের। সে কী বিরাট দীর্ঘ সেতু তোমার জীবনে আমার জীবনে বাঁধা। আজ তুমি ছাড়া আমি অকারণ, আমি ছাড়া তুমি অকারণ, আজ তুমি কি তা অস্বীকার করবে? হে অতিথি! তুমি আজ ক্ষণিকের হ'তে চিরকালের হও, ছবি হ'তে মূর্ত্তি নাও, স্বপ্ন হ'তে সত্য হও।

স্বপ্ন! তুমি কী তা জানো? তুমি একদিন বলেছিলে আমার কাছে এলে তুমি আনন্দ পাও। তোমার কাছে গেলে আমি কী পেতাম তাকি তুমি জানো? তুমি কী শুনতে পেয়েছিলে আমার হৃদপিণ্ডের কাকুতি? সে কী উচ্ছলতা, সে কী ব্যাকুলতা আমার মনের উর্ম্মিতে উর্ম্মিতে? সে দৃষ্টি ছিলো না তোমার চোখে, তুমি যে পুরুষ। আমার সমস্ত কঠোরতা সমস্ত অসাধারণত্বের আড়ালে চিরদিন লুকিয়ে ছিল একটী নগন্য সাধারণ কোমলা নারী, যে আর পাঁচটী নারীর মতই বুভুক্ষু তৃষিত, যাকে নির্ব্বাসিত ক'রে আমার নারী নাম ঘোচাতে আমি লজ্জা বোধ করি। আমি তৃষিত। আমার নামই যে তৃষ্ণা। আমি নিবিড় কিন্তু আমার চরিত্রে অকারণ বিহ্বলতা নেই, চক্ষুতে অন্ধত্ব নেই আমার কোনদিন। তোমায় একথা জানাতে আজ আর লজ্জা পাবো কেন? আমার কল্পনার মানুষ কে জানো না? তাকে যে ডাক্ দিয়েছে আকাশ পাতাল, পথের বাঁশীর সুরে সুরে পাদুখানি উঠেছে তার নেচে, তারি পথের পাশেই আমারও পায়ে চলার পথ, তার সে বাঁশী আমারো। ঘর-হারা সে, ঘর-ছাড়া যে আমিও। পথের উপর ফুটে আছে চারটী চোখের ফুল। চলো, আমিও বেরোলাম। ভুল? ভুল আমি জীবনে করিনি। আমার শিক্ষা ছিলো নির্ভুল। আমি জানি, আমি যে পথে চলবো সে পথই আমার সুন্দর। ঐ যে আড়াল থেকে বাবা আমার পথের দিকে তাকিয়ে আনন্দে হাস্‌ছেন।

বেরোলাম। অনেক দুঃখে জন্মভূমির কাছ থেকে বিদায় নিলাম, বহুদুঃখ বহুগ্লানি থেকে মুক্তি পাবো বলে। এর আলো এর বায়ু আমার লেগেছিলো ভালো। কিন্তু মানুষের বিষাক্ত নিঃশ্বাসে আমার শ্বাসকষ্ট হোলো, তাই বিদায় নিলাম। তোমার পথের আনন্দ আমার সারা গায়ে ঝরে পড়ছে, আমার পথের আনন্দ তোমার সারা গায়ে ঝরে পড়ুক। আমারা যাযাবর দুটি। আমাদের ঠিক নেই, ঠিকানা নেই, রাত্রিদিন আলো জল্‌বে আমাদের পথের নীড়ে, মাথার উপর স্বাধীন আকাশ, পাখী ডাক্‌বে নানান্ সুরে, ফুল ফুটবে পথের দুধারে। আর কিছু নয়, আজ আমার সঙ্গে নেবো শুধু একটী সেতার।

সুদূর দুঃখের স্মৃতিতে তুমি যখন ব্যথিত হবে, গাছের ছায়ায় বসে আমি তোমায় গান শোনাবো। তারপর আবার চলা, যতক্ষণ না পৌঁছি একটী বন্য পাহাড়িয়া দেশে, একটী ছোট্ট অনাড়ম্বর কুটীরে যেখানে থাকবে শুধু তোমার আমার সভ্যতা, তোমার আমার সমাজ, আর এই ছোট্ট মানুষটী যে আমায় মা বলে চিনেছে, টিপি টিপি নিঃশ্বাস ফেলে ঘুমুচ্ছে শুয়ে আমার বুকের কাছে।

বিশ্বাস করো। বেরোলাম। তোমার পথের পানে, তোমার উদ্দেশ্যে। চিঠি পেয়ে তুমিও তাকিয়ে দেখো তোমার পথের চারপাশে। আমায় সঙ্গে ডেকে নিও। চিঠি লিখছি। এখন গভীর রাত। দূরে নদীতে বুঝি জোয়ার এসেছে। কল্লোল ভেসে আসছে তার। পাশে দেওদার গাছে ডাকছে একটা পাখী, সে আজ কেন যে ঘুমোয়নি, কাঁদছে সারা রাত, কে বুঝি তার হারিয়ে গেছে। ঝোপে ঝাড়ে ঝিল্লী ডাকছে একটানা—অধীরা অভিসারিকার পায়ের নূপুরের মত। তুমি আমার অন্তরে নিবিড় হ'য়ে এসেছো। তুমি আমার মানস চক্ষের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে আছো একটী রোমাঞ্চিত কবিতার মতো। হে অপবিত্র! হে অশুচি! হে ঘৃণ্য! হে জঘন্য! একটী অন্তরতম ঘনিষ্ঠতম নামে আজ তোমায় ডাক্‌তে ইচ্ছে করছে সঙ্গোপনে। হে ব্যর্থ! হে প্রত্যাখ্যাত! হে নিরানন্দ! হে সাথীহারা! তুমি আমায় সঙ্গে নাও। আমি বেরুলাম তোমারই উদ্দেশ্যে—আলো অন্ধকার কুহেলী কুজ্ঝটিকা ভেদ ক'রে। ভয়? জানি আছে। জানি দিকে দিকে রাশি রাশি শত্রুয় ও তার বন্ধুরা ছড়িয়ে আছে। তার সঙ্গে এও জানি চিরদিনের ঘুমও জড়িয়ে আছে তাদের চোখে। চলো, চলো, আমিও বেরোলাম। পাগল হ'য়ে উঠেছে পারের বাঁশী। সময় নেই। উপহার? আমি নিজেকে আজ ডালায় ভ'রে তোমার সাম্‌নে তুলে ধরলাম। প্রয়োজন হ'লে মনের মতন সাজিয়ে নিও আমার সিঁথীকে! ইতি—

'তৃষা'

চিঠি মুড়িয়া তৃষ্ণা খামে ভরিল। তারপর ঠিকানা লিখিতে যাইয়া সহসা লেখনী স্তব্ধ হইয়া গেল।

নদীর জলে বান ডাকিয়াছে, দূরে। রাত্রি—রাত্রির অন্ধকারে আসিয়াছে জোয়ার। নিদ্রাহারা পাখী এমন করিয়া কেন যে কাঁদে। পরম আদরে ঘুমন্ত শিশুটীকে কোলে তুলিয়া লইয়া একটী একটী করিয়া ধাপ ভাঙ্গিয়া তৃষ্ণা নীচে নামিতে লাগিল।

শেষ